স্বর্ণ-বিপর্যয়-২

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

এক

জাম্বো-জেট জুরিখ এয়ারপোর্টের টারমাকে চাকা নামাল, ছুটল রানওয়ে ধরে। গতি কমে এল দ্রুতই, থেমে দাঁড়াল, তারপর ঘুরে চলে এল টার্মিনালের সামনে। জুরিখে আসবার পথে মাসুদ রানা পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে অনেক ভেবেছে। আলাদা একটা দায়িত্ব চেপে গেছে ঘাড়ে, তবে সেজন্য ওর প্ল্যানে তেমন কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না। এখন ও জানে, কীভাবে এগোবে। স্বাভাবিক মানুষ বলবে লোকটা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু এসব কাজে কিছুটা পাগলামির এলিমেন্ট তো থাকেই।

টোকিয়ো ছেড়ে জুরিখে আসবার দীর্ঘ পথে পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল রানা। সোহেলের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ হয়েছে। কারা জুরিখে ওর সঙ্গে কাজ করবে, মার্ভেল থেকে কী কী ইকুইপমেন্ট নেওয়া হবে, ঠিক করেছে ওরা। এখন তাইপের দিকে ছুটে চলেছে মার্ভেল। রানার দলের সবাই আপাতত ভারতীয় হয়ে যাবে, তাদের পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে। ওরা জুরিখে আসবার জন্য তাইপে এয়ারপোর্ট ব্যবহার করবে। এদিকে দ্য চুহা প্রতি ঘণ্টায় চার নট গতিতে এগিয়ে চলেছে, কাজেই আশা করা যায় মার্ভেল ফিরে গিয়ে ওটাকে সাগরেই পাবে।

কিছুক্ষণ আগে ওর পাশের সিট থেকে মাঝবয়েসি এক লোক উঠে গেছে, সম্ভবত টয়লেটে। সেই খালি সিটে এসে বসল সুন্দরী এক তরুণী। হালকা সেন্টের সুবাস পেয়ে অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে মেয়েটি। চট্ করে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। মতলবটা কী?

'টোকিয়োতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি, মাসুদ ভাই,' নিচু স্বরে আরবিতে বলল মেয়েটি। যেন আপন মনে কথা বলছে। 'আমার নাম মুশতারি।'

আবার একবার চট্ করে মেয়েটিকে দেখে নিল রানা। না, চেনে না ওকে।

'আমাকে চেহারা দেখে চিনতে পারবেন না, মাসুদ ভাই। আমি আপনাকে দেখেছি লেবাননে, আমাদের ক্যাম্পে। আবদুল্লাহ আল্ করিম আমার চাচা। উনি পাঠিয়েছেন আমাকে।'

আবদুল্লাহ আল্ করিম বর্তমানে পিএলও-র সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। তৃতীয়বার তাকিয়ে চেহারার মিল পেল রানা। অবশ্য তা-তে কিছুই প্রমাণ হয় না, মেয়েটির বক্তব্য শুনলে জানা যাবে ওর উদ্দেশ্য। রানার সঙ্গে দেখা করতে এ মেয়ের টোকিয়োতে যাওয়ার মানে ওর গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এরা। কীভাবে সেটা সম্ভব হলো জানা দরকার। চুপচাপ বসে রইল ও।

'আপনার সাহায্য দরকার পিএলও-র।'

'কী রকম?'

'ব্যাপারটা...' আরও নিচু হলো মেয়েটির কণ্ঠ, রানার কানের পাশে চলে এসেছে ওর ঠোঁট, 'রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন ও এক উকিল সংক্রান্ত।'

ভিতর ভিতর চমকে গেল রানা। ও যে টোকিওতে ছিল, কী করতে কোথায় যাচ্ছে... সবই দেখা যাচ্ছে জানে এরা! এতসব খবর লিক-আউট হলো কীভাবে?

চুপচাপ পাথর হয়ে বসে থাকল রানা।

'আপনার বস্ যোগাযোগ করেছিলেন আমার চাচার সঙ্গে।' কথা বলতে বলতে রানার চোখের সামনে একটুকরো কাগজ ধরল মেয়েটি। মুহূর্তে দূর হয়ে গেল রানার সব দুশ্চিন্তা।

মেয়েটি আরবি হরফে লিখে এনেছে বিসিআই-চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের একটা বাংলা সাঙ্কেতিক মেসেজ। এর অর্থ সম্ভব হলে সাহায্য কোরো।

তা হলে এই ব্যাপার! উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, সোহেল রিপোর্ট করেছে হেড অফিসে, জানিয়েছে রানা এখন কোথায় আছে, কী করতে যাচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন এদের।

'ঘটনাটা কী?' এতক্ষণে নিচু কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও।

সব খুলে বলল মুশতারি। ভুরু কুঁচকে ভাবল রানা কিছুক্ষণ, তারপর বলে দিল কী করতে হবে ওদের। ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে গেল মেয়েটি, আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল মাঝবয়েসি ভদ্রলোক—যেন কিছুই জানেন না।

ইন্টারন্যাশনাল কাস্টম্স্-এর কারণে বেশ কিছু ইকুইপমেন্ট আনা যাবে না। তাতে সমস্যা নেই। অনেককিছুই রানা এজেন্সির জুরিখ অফিস থেকে পাবে। ওদের লাগবে কয়েকটা পিস্তল আর কিছু কেমিকেল। বিস্ফোরক ওরা নিজেরাই তৈরি করে নেবে। আর যা কিছু লাগবে, সেসব ভাড়ায় পাওয়া যায়।

রানার দলের সবাই জুরিখে পৌঁছুবে চব্বিশ ঘণ্টা পর। এখন প্রথম কাজ, রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন থেকে ডাউন-টাউনের কোর্ট হাউজের পুরো পথ ভাল মত রেকি করা। পরে একটা সেফ হাউজ ভাড়া করবে ও।

বিশ মিনিট পর কাস্টম্স্ পেরিয়ে টার্মিনাল ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, ভাড়া করা মার্সিডিজ এমএল-৫০০ স্পোর্টস্ ইউটিলিটি ভেহিকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। গাড়িটার অফ-রোড সুবিধেটা লাগবে বলে মনে করে না রানা, কিন্তু বড়লোকদের এই শহরে গাড়িটা বেমানান লাগছে না। জিপিএস ম্যাপিং সিস্টেমটা কাজে লাগতে পারে। বসন্তের সুন্দর এক উজ্জ্বল সকাল। নীল আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, দু'পাশের জানালা খুলে দিল, বাটন টিপে সান-রুফ উধাও করল।

জুরিখ শহরের চেহারা অনেক বদলে গেছে। আধুনিক স্থাপত্য মিশেছে পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে। প্রাচীন শিল্পরীতি ও অতি আধুনিকতা, পাশাপাশি দেখতে খারাপ লাগে না। শহর এড়িয়ে রিং রোডে চলে এল রানা, একটা এক্সিট পার হয়ে রওনা হয়ে গেল রেজেন্সডোর্ফ প্রিযনের উদ্দেশে। ওদের জন্য একটা ভাল জায়গা লাগবে, নইলে মোক্ষম সময়ে কাজে নামা যাবে না।

রেজেন্সডোর্ফের মোড়ে পৌঁছে ফিরতি পথ ধরল রানা, জেলখানার গার্ডদের

গাঁড়িটা দেখতে দেবে না। সম্ভবত এই পথে আরও কয়েকবার আসতে হবে। দলের সবার জন্য কোর্ট হাউজ ও রেসেন্সডোর্ফের রাস্তায় ভাল একটা জায়গা খুঁজতে হবে। শহরে ফিরে কোর্ট হাউজের পাশে চলে এল রানা। এই কোর্টে লিয়ার বেয়ারমান রাজ-সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেয়। মামলাটি তুমুল আলোড়ন তুলেছে। সবাই অপেক্ষা করছে, দেখবে কী ঘটে।

কোর্ট হাউজের সামনের রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। ট্রাফিক পুলিশরা ব্যস্ত। কোর্টের বেশ খানিকটা আগে বামপাশে একটা বহুতলা বাড়ি উঠছে, ওখানে গাড়ি আর মানুষের ভিড় বেশি। ব্যস্ত ট্রাকগুলো সিমেন্ট-বালি-বিম ইত্যাদি নিয়ে সাইটে আসছে, বদলে নিয়ে চলেছে নানান রকম জঞ্জাল। ইন্টারসেকশানে জ্যাম লেগেই আছে। নতুন বিল্ডিং এখনও শুধু স্টিলের কঙ্কাল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে কংক্রিটের স্ল্যাব। ওগুলো দিয়ে মেঝে তৈরি হবে। স্ল্যাবগুলো সাজিয়ে সাত তলা উঁচু বিশাল একটা বাক্স বানানো হয়েছে। প্রয়োজন মত ওখান থেকে নেওয়া হবে। কনস্ট্রাকশান সাইটে মাথা তুলে আছে একটা টাওয়ার ক্রেন। ওটার হরাইযন্টাল বুম প্লাইউড ও চেইন-লিঙ্কের দেয়ালের যে-কোনও দিকে যায়। বুমটা যেন হাত বাড়িয়ে আছে।

লাল বাতি জ্বলে ওঠায় গাড়ি থামাল রানা। ক্রেনের বুম অসংখ্য আই-বিম তুলে নিল। রানার পিছনের গাড়ির চালক চমকে গেছে, আলতো করে হর্ন বাজিয়ে থেমে গেল। বাতি বদলে গেছে আবার, লোকটা হাতের ইশারায় দুঃখিত জানিয়ে চলে গেল।

রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন ও কোর্ট হাউজের মধ্যে ছয়বার এল গেল রানা, ছ'বারই বিভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করল। ও নিজে সিকিউরিটি দলের লিডার হলে একেক দিন একেক রাস্তায় লিয়ার বেয়ারমানকে নিয়ে আসত। কোনও দলের জন্য আর্মার্ড ক্যারাভানে হামলা করা খুব কঠিন হবে। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল করেনি পুলিশ—প্রতিবার একই গন্তব্যে এসে পৌঁছুবে তারা। আর্মার্ড ভ্যান কোর্টের যত কাছে আসবে, ততই নিশ্চিন্তে হামলা করা যাবে।

কোর্ট হাউজ পার হয়ে দু'ব্লক এগিয়ে গাড়ি রাখল রানা, পরবর্তী দু'ঘণ্টা পায়ে হেঁটে চারপাশটা ঘুরে দেখল। একবার থেমে স্টারবাক থেকে কালো কফি নিয়ে গলা ভিজাল। খেয়াল করল, কোর্ট ও কনস্ট্রাকশান সাইটের সামনের রাস্তায় প্রচুর মানুষের আনাগোনা, তবে কনস্ট্রাকশান সাইটের পিছনের রাস্তা প্রায় খালি। মনে মনে বলল ও, *আমরা যদি কাজটা এখানে করি, তা হলে দু'দিন কাউকে রাখতে হবে। আগে জানতে হবে এখানে কী পরিমাণ যানবাহন চলে।* জায়গাটা খারাপ লাগছে না ওর। চাহিদার সব মিলবে না, তবে চলে। ওর মূল পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন আনতে হবে, এই আরকী।

দুপুরের পর একটা চার তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের উপর তলা ভাড়া করল রানা। জায়গাটা কোর্টের ছ'ব্লক দূরে। লিযিং এজেন্টকে জানাল, ওরা কয়েকজন আমেরিকান উকিল। ওরা জুরিখে দু'মাস থাকবে, একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষে আইনী লড়াই করবে। অ্যাপার্টমেন্টটা খারাপ লাগেনি রানার। তিনটে বেডরুম, তিনটে টয়লেট, কিচেন। সঙ্গে একটা মাঝারি অফিস রুম।

আসবাবপত্রগুলো পুরোনো। তাতে অসুবিধে নেই। বাড়ির ভাল কিছু দিক আছে, দরকার পড়লে ছাদে উঠতে পারবে ওরা, একটা ফায়ার এস্কেপ নেমেছে পিছনের গলিতে। লিযিং এজেন্ট বাঘা লোক, রানার কাছে তিন মাসের অ্যাডভান্স চাইল।

রানার কাজ আট দিনে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আপত্তি করল না ও, রাজি হয়ে গেল। পৌনে তিনমাস ওটা হবে বিসিআই-এর সেফ হাউস। দু'জন ওখানে থাকবে, প্রয়োজন পড়লে জানাবে ওরা আমেরিকান উকিল। বিসিআই-এর এক্সপার্টরা ওদের জন্য সরকারী কাগজ তৈরি করে দেবে।

রানা জানে, অপরাধী বেশিরভাগ সময় প্রতিবেশীর কাছে নিজেকে ভাল লোক দেখাতে চায়। যে-ব্যাঙ্কে ডাকাতি করবে, সেটার অতি কাছাকাছি থাকে, তারপর অপরাধ শেষে দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যায়। পুলিশ জানে, বেশিরভাগ ক্রিমিনাল এমনই করে। সেজন্যই পুলিশ আগে খুঁজে বের করে কে কে ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এর ফলে নিরেট সূত্র পাওয়া যায়। বিসিআই-এর কয়েকজন এজেন্ট রানার ভাড়া করা বাড়িতে উঠবে, নির্দিষ্ট সময় শেষে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যাবে।

রানা অ্যাপার্টমেন্ট বুঝে নিয়ে এজেন্টকে নগদ টাকা দিয়ে বিদায় করল। ফোন করল রানা এজেন্সির শাখা চিফকে, জানিয়ে দিল একটা ওয়ালথার, তিনটে গ্লক, তিনটে এমপি-ফাইভ পিস্তল ও কিছু কেমিকেল লাগবে। ঠিক হলো, আগামীকাল আগ্নেয়াস্ত্র ও কেমিকেলগুলো পৌঁছে যাবে। রানার আর কোনও কাজ থাকল না। কাছের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে নিল। তারপর আবার বসল ওর পরিকল্পনা নিয়ে, নানা ভাবে খুঁত বের করবার চেষ্টা করল। ওর চিন্তা অনুযায়ী কাজ হবে, নাকি যারা ওর উপরে নির্ভর করবে, তারা ডুববে! কী ঘটতে চলেছে? গুন গুন করে গাইল হিন্দি গানের সুর : কোঈ না জানে কিয়া হোগা কাল, ক্যায়সে হোঙ্গে আনেওয়ালে প্যল...

পরদিন সবার শেষে এলো ডাক্তার ফারা রাইনার। রানা ওকে সেফ হাউজে না রেখে জুরিখের বিখ্যাত ব্যাঙ্কিং ডিস্ট্রিক্টের ব্যাহনহোফস্ট্রাসের একটা হোটেলে উঠতে বলেছে। এই অপারেশনে ফারার বদলে উর্বশীকে কাজে লাগাতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু যে উচ্চতা রানার দরকার, সেটা উর্বশীর নেই। প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গেছে ফারা। তবে রানা আগেই বলে রেখেছে, অতি প্রয়োজন না পড়লে ফারাকে কাজে লাগানো হবে না।

আতাসি ফারাকে সঙ্গে নিয়ে সেফ হাউজে এসেছে। অচেনা এই নারীকে দেখে একমুহূর্ত বোকা হয়ে গিয়েছিল রানা। কপাল ঢেকে আছে তার বিরাট সানগ্লাসে। চুলগুলো সব ধূসর। যেন কোনও ঝোপ। ফারার দুর্দান্ত ফিগার আর নেই, বদলে মোটা মেরে গেছে। পরনে প্রিযন মেট্রনের কোঁচকানো পোশাক। মুখে-কপালে অসংখ্য বলি রেখা। নাকের দু'পাশের হাসি-রেখা দেখলে মনে হয় ওগুলো গভীর নালা।

কে বলবে ফারা সুন্দরী, ও এখন সত্যিই জটিল উকিলের কুটিল স্ত্রী ফ্রাউ বেয়ারমান হয়ে গেছে।

'সর্বনাশ,' ফারাকে দেখে মৃদু হেসে ফেলল রানা। 'তুমি সত্যিই ফারা তো?'

'পছন্দ হয় না আমাকে?' ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল ফারা। গাল বাড়িয়ে দিল। 'মোফিজ বিল্লাহ্ জাদু দেখাতে পারে। এসো বাপ্, আমার গালে একটা চুমু দাও।'

ফারার চারপাশে এক পাক ঘুরল রানা, সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখল। 'পরে আবার এরকম মেকআপ নিতে পারবে তো?'

'বিল্লাহ শিখিয়েছে,' বলল ফারা। 'কাপড় আমি নিজেই পরে নিতে পারতাম, কিন্তু আসল জিনিস মুখের যত্ন—বিল্লাহ আমাকে পাঁচ ঘণ্টার কোর্স করিয়েছে। চেহারা কী করে বদলে দিতে হয়... বিশ্বাস করা যায় না। আমি এখন আগলি পার্লার খুলতে পারব। কাপড়-চোপড় যে পরিমাণ দিয়েছে, তাতে ছ'মাস চলবে।'

'এখন কস্টিউম নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না,' বলল রানা। 'আমরা কাজে নামলে অভিনয়ের সুযোগ পাবে। তার আগে চাই না লোকজন দেখুক শহরে বেয়ারমানের স্ত্রীর ক্লোন আছে।'

'বেশ।'

লিভিংরুমে চলে এল দলের বাকি দু'জন। ফারাকে দেখে হেসে ফেলল ওরা। রানা সহ ওরা পাঁচজন এসেছে জুরিখে। ছোট্ট একটা দল, কিন্তু সব ঠিকমত চললে কাজ উদ্ধার করা যাবে। ফারার প্রথম দায়িত্ব শেষ হলে অন্যরা আরেকটা কাজে নামবে। তখন ফারা দলের ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে।

'আমি কাজ চলার মত একটা জায়গা বাছাই করেছি,' বলল রানা। 'দু'দিন ওখানে চোখ রাখতে হবে। একটা কথা এখানে বলে রাখি, কারও যদি মনে হয় ওই জায়গায় ঝুঁকি অনেক বেশি, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে তোমরা। পরে আমরা একসঙ্গে গিয়ে জায়গাটা ঘুরে দেখব। আজই বিস্ফোরক তৈরি করব। এরপর শুরু হবে আমাদের প্রথম কাজ। আমরা আসল ফ্রাউ বেয়ারমানকে তারই বাসায় কিডন্যাপ করব।'

'তার কোনও প্রহরী আছে?' জিজ্ঞেস করল আতাসি।

'এখনও জানি না। জানতে হবে। ওর উপর চোখ রাখলেই বোঝা যাবে।'

'আমরা নিজেদের কী পরিচয় দেব?' জিজ্ঞেস করল ফারা।

'রাশান। লিয়ার বেয়ারমান দ্য চুহা কিনতে একগাদা ডামি কোম্পানি করেছে, আমরা সেসব কোম্পানির কোনও একটার বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স। আসলে রাশান মাফিয়ার লোক। আমাদের কাজ বেয়ারমানকে জেল থেকে উদ্ধার করা।'

'মাসুদ ভাই, লোকটা জেল ভেঙে পালাতে চাইবে?' জানতে চাইল বাংলাদেশ আর্মির এক কমাণ্ডো। 'সোহেল ভাই ব্রিফ করার সময় বলেছেন, এই বুড়ো-শেয়াল নাকি প্রসিকিউটারের সঙ্গে ভাল চুক্তি করেছে।'

'বেয়ারমানকে খেলিয়ে তুলতে হবে,' বলল রানা। 'লোকটা পিএলওর টাকা হাতিয়েছে। এখন জানবে পিএলওর আততায়ী তাকে খুঁজছে।'

'সত্যিই পিএলওর টাকা মেরেছে এ, বস?' জিজ্ঞেস করল আতাসি।

'মেরেছে। এরা ইয়াসির আরাফাতের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সরিয়ে ফেলেছে। এখন আমাদের কাজ এই বেয়ারমানকে বোঝানো, পিএলও তাকে

হাতে পেলে খুন করবে। তার বাঁচার একটাই পথ—ইচ্ছে করলে সে আমাদের সঙ্গে সরে পড়তে পারে। নইলে নিশ্চিত মৃত্যু।'

'ধরে নিই পেলাম তাকে,' বলল ফারা। 'তারপর কী করব?'

'আমরা ওকে মরণের ভয় দেখাব,' কড়া শোনাল রানার কণ্ঠ, 'এমন ব্যবস্থা নেয়া হবে যে প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে। ...ফু-চুং এখন কোথায় আছে আমরা জানি না। মানুষ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে জানতে গেছে ও। আর এই বেয়ারমান এসবের সঙ্গে আগাপাশতলা জড়িত। কাজেই তাকে খাতির করব না আমরা।'

'বস্, মিস্টার ফু-চুং গেছেন ফউজোউ-এ,' বলল আতাসি। 'আর কোনও খবর নেই। মার্ভেলের সবাই উদ্বিগ্ন।'

'এখানে কাজ শেষে মার্ভেলে ফিরব আমরা,' বলল রানা। 'আশা করি ও সাগরগামী কোনও ট্রলারে থাকবে। পাচার হয়ে যাওয়ার আগেই ওকে উদ্ধার করতে হবে। আমরা জানি লিয়ার বেয়ারমান দ্য চুহা আর জলদস্যুতার সঙ্গে জড়িত। ওর কাছ থেকে হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে এত মানুষ কোথায় যায়।'

'লোকটা যদি মুখ না খোলে?' জিজ্ঞেস করল ফারা। 'এমন যদি হয় এই লোক শুধু ডামি কোম্পানি গড়েছে, কিন্তু আর কিছুই জানে না—তখন?'

এরকম সম্ভাবনা আছে, রানা জানে। মন মানতে চায় না, কিন্তু... উত্তর ওকে দিতেই হবে, কাজেই বলল, 'তা হলে ধরে নিতে হবে ফু-চুং মারা গেছে। যেখানে ছিলাম, সেখানেই আটকে গেছি। সেক্ষেত্রে আবার নতুন করে জলদস্যুদের পিছু নেব।'

সবাইকে নিয়ে অফিস-রুমে বসল রানা। পরবর্তী আধ ঘণ্টায় ওর খসড়া পরিকল্পনা খুলে বলল। তারপর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলাপ হলো ওদের, যার যা মতামত জানাল নির্ভয়ে। ওরা জানে কঠিন কাজ হাতে নিয়েছে, এতে প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে, কাজেই পরিকল্পনায় গভীর মনোযোগ দিয়েছে সবাই, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় বিচার করেছে নিরপেক্ষ ভাবে। মিশনে কিছু পরিবর্তন এল।

আড়াই ঘণ্টা পর সন্তুষ্ট হলো রানা।

ওরা এখন জানে, এর বেশি কিছু করতে পারবে না চাইলেও। এই পরিস্থিতিতে সেরা প্ল্যানটাই কাজে লাগাবে ওরা। রানা সবাইকে আগামী তিন দিনের কাজ ভাগ করে দিল।

একজন যাবে কোর্ট ও কনস্ট্রাকশান সাইটে, রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার বাড়া-কমা চার্ট করবে। অন্যরা দরকারি জিনিসপত্র যোগাড় করবে, ইকুইপমেন্টে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাবে।

অতি জরুরি দশ চাকাওয়ালা একটা ট্রাক, ওটার সঙ্গে থাকবে ট্রেইলার—ওটা নিয়ে আসবে রানা। শহরের বাইরের একটা ওয়্যারহাউজ ভাড়া করবে ও।

এদিকে দ্বিতীয় কমাণ্ডো ও আতাসির কাজ বেয়ারমানের বাড়ির উপর নজর রাখা। ওই বাড়ির সিকিউরিটি কেমন জানতে হবে। এক বা একাধিক গার্ড থাকতে পারে। রানা পরে গিয়ে ও-বাড়ির উপর চোখ রাখবে। সুযোগ পেলেই ওরা মহিলাকে তুলে আনবে।

আজ মঙ্গলবার। সব ঠিক মত চললে আগামী সোমবার লিয়ার বেয়ারমান

আবারও কোর্টে দাঁড়াবে। সেইদিন আসল কাজে নামবে ওরা। তার মানে, বৃহস্পতিবার রাতে বেয়ারমানের স্ত্রীকে তুলে আনতে হবে। রেজেন্সডোর্ফ প্রিযনে শুক্রবার সকালে ভিজিটিং আওয়ার শুরু হয়। ফারা ওই মহিলার বদলে ওখানে যাবে। কথাটা ভেবে অস্বস্তি বোধ করছে রানা। বড় দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে। লিয়ার বেয়ারমানকে এরপর আবার কবে কোর্টে তোলা হবে, সে-আশায় বসে থাকা যায় না। এদিকে ফু-চুঙের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এখানে বসে আঙুল চুষলে চলবে না। জানতে হবে দ্য চুহা কোথায় যায়!

'কমিউনিকেশন চেক করো,' বলল রানা। ওর ভয়েস্-অ্যাক্টিভেটেড থ্রোট মাইকে অদ্ভুত লাগল কথাগুলো।

লেফটেন্যান্ট আবু কাশেম ও আতাসির সিগনাল পেল ও।

'বস্, আপনার কাছ থেকে পাওয়া ট্রেনিং কাজে লাগুক,' বলল আতাসি। 'দোয়া করবেন।'

'সময় হয়ে গেছে, দু'মিনিট পর রওনা হবে তোমরা,' বলল রানা। পাশে ফারা। ওকে অন্তত ষোলো ঘণ্টা জেগে থাকতে হবে। আজ রাতে ওর জন্য ঘুম নেই।

রাতের আকাশে চাঁদ ঢাকা পড়েছে মেঘে। সামনেই তিনতলা বাড়িটা। সামনে ঘাস ছাওয়া লন। ঘাসের মাথায় বিন্দু বিন্দু শিশির জমেছে। একটু আগে এক প্রৌঢ় তাঁর কুকুর নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তখন আধঘণ্টা মনে হয়েছে ডাশাণ্ডটার টয়লেট আটকে গেছে। তারপর ভদ্রলোক কুকুর নিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। অনেকক্ষণ হলো এলাকা নীরব হয়ে গেছে। প্রতিবেশীদের কারও কোনও সাড়া নেই।

তিনদিন ফ্রাউ বেয়ারমানকে লক্ষ করে রানার ধারণা হয়েছে, মহিলা এই বাড়িতে একাই থাকেন। সকালে এক কাজের বুয়া আসে, বিকেলে চলে যায়। ওরা এখন জানে, এ-বাড়িতে একটা অ্যালার্ম সিস্টেম আছে। প্রতিটি দরজা-জানালা ওয়্যারড্। উঁকি দিয়ে দেখেছে রানা, সকালে কাজের বুয়া এসে অ্যালার্ম বন্ধ করে। ধারণা করেছে, মহিলার স্বামী গ্রেফতার হওয়ার পর বাড়িতে অ্যালার্ম বসানো হয়েছে। মাটিতে কোনও তার পাওয়া যায়নি, মোশন ডিটেক্টর বা আইআর ক্যামেরা নেই। কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া যায় না, মহিলা ভয় পেয়ে অ্যালার্মের বাটন টিপে দিলে দোজখ হয়ে যাবে গোটা এলাকা। পুলিশের স্টেশন কাছেই। তারা আসতে বড়জোর সাত মিনিট লাগাবে।

ঘড়ি দেখল রানা। 'ঠিক আছে, আতাসি, যাও। কাশেম দরজা খুললে অ্যালার্ম ডিঅ্যাকটিভেট করতে ষাট সেকেণ্ড পাবে তুমি।' রানা জানে এর বেশি সময় দেয়া উচিত না।

ফ্রাউ-এর বয়স ষাটের বেশি, অর্থাৎ পুরোপুরি বুড়ি হয়নি, ঠিকই ইলেকট্রোনিক্স ব্যবহার করতে পারে। যে-লোক এ বাড়ির অ্যালার্ম ইন্সটল করেছে, সে নিশ্চয়ই বয়স্কা ক্লায়েন্টের জন্য এমন ব্যবস্থা রেখেছে, যাতে ভুলে অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করলেও পরে থামাতে পারে। সাধারণত অন্তত এক মিনিটের সুযোগ

দেয়া হয়। এরপর পুলিশ-স্টেশনে অ্যালার্ম পৌঁছে যায়, দেরি না করে ফোর্স চলে আসে।

শীঘ্রি কাশেম ও কমিউনিকেশন্স স্পেশালিস্ট আতাসির কাজ শেষ হয়ে যাবে, ওরা ফিরে যাবে মার্সিডিজে। এরপর রানার কাজ শুরু। ও কেমিকেল মেখে ভূতের মত ফরসা হয়ে গেছে। এখন ও রাশান মাফিয়ার একজন। খবর পেয়ে মহিলার স্বামীকে উদ্ধার করতে এসেছে। বলবে, পিএলওর আততায়ীরা তার স্বামীকে খুন করতে আসছে। ও এসেছে বেয়ারমানকে সরিয়ে নিতে।

ওদের পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে প্রাণ খুলে হেসেছিল আতাসি। 'বস্, একেই বলে বহুকিছু করব, এমন ভাব দেখিয়ে, কিছুই না করা!'

কাঁটা ঝোপের বেড়া দিয়ে বাড়ির সীমানা তৈরি হয়েছে। কাশেম ও আতাসি সেদিক লক্ষ করে ছুটল। কালো পোশাক পরে আছে ওরা। আতাসির হাতে ছোট একটা ডাফ্‌ল্ ব্যাগ, ওটার ভিতর ওর যন্ত্রপাতি। কাশেমের হাতে চিকন লকপিক, প্যান্টের পকেটে পাতলা বিলফোল্ড।

ওক কাঠের ভারী দরজার সামনে চলে গেল ওরা। পাশের দেয়ালে একটা সুন্দর ফিক্সচারে বাতি জ্বলছে, এ ছাড়া বাড়িতে আর কোনও আলো নেই। সব ঘুটঘুটে অন্ধকার। তিন ঘণ্টা আগে ফসেট বেয়ারমানের বেডরুমের আলো নিভে গেছে। তার মানে এখনও সে ঘুমের গভীর আরইএম-এ পৌঁছোয়নি, তবে এখন আর টয়লেটে চাপবে না।

কাশেমের ডান পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল আতাসি। লকপিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল কাশেম। এই দরজায় যে তালা আছে সেটার মত আরেকটা তালা কিনেছে সে শহরের আরেকপ্রান্ত থেকে। ওটার উপরে হাত মকশো করেছে। এখন তালার টেনশন পিক নিয়ে কাজ করছে, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে কোনও দক্ষ সার্জন, রোগীর হৃৎপিণ্ডে অপারেশন করছে। তালার পিনগুলো নিয়ে ব্যস্ত। ওর হাতে ছোট একটা যন্ত্র। ডেড-বোল্ট খুলতে আট সেকেণ্ড লাগাল কাশেম, মেইন হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে নিল পনেরো সেকেণ্ড।

শ্বাস ফেলে আতাসির দিকে তাকাল সে। ব্যাগ হাতড়ে একটা হেডব্যাণ্ড বের করল আতাসি। ওটার সঙ্গে ঝুলে আছে খুদে একটা বাল্‌ব্। ব্যাণ্ডটা কপালে পরে নিল, আস্তে করে মাথা দোলাল। কাশেম দরজাটা নিঃশব্দে খুলে দিল। ঘরে একটা মৃদু ইলেকট্রনিক আওয়াজ শুরু হলো। পাঁচ সেকেণ্ড পরপর বেশ কয়েকবার সুযোগ দেবে ওটা, তারপরও যদি অ্যালার্ম সিস্টেম বন্ধ না করা হয়—বেজে উঠবে কান ফাটিয়ে!

ঘরের মেঝে কাঠ দিয়ে তৈরি, চকচকে পলিশ করা। সামনে চওড়া সিঁড়ির ধাপ দামি ইরানি কার্পেট দিয়ে মোড়া। প্রথম তলায় ডানে-বামে আরও কয়েকটা ঘর আছে। এছাড়াও আছে বিরাট লিভিং ও ডাইনিং রুম—ওখানে অন্তত বিশজনকে বসতে দেয়া যায়। আতাসি তিন সেকেণ্ডে ওগুলো দেখে নিল। অ্যালার্ম প্যানেলটা দরজার ডানপাশে। ওখানে ছোট্ট একটা লাল বাতি বারবার জ্বলছে-নিভছে।

স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে প্যানেলের ঢাকনি খুলে ফেলল সে। ভিতরে অসংখ্য চিকন

তারের জট্। ওগুলোর দিকে মনোযোগ দিল না ও, জানে, ইতিমধ্যে অ্যালার্মের সার্কিট বন্ধ হয়ে গেছে। ওর এখন নিউম্যারিকাল কী-টা দরকার, নইলে সিস্টেম ডিঅ্যাকটিভেট করতে পারবে না। খেয়াল করল ছোট একটা মাদারবোর্ডের বুকে বসে আছে দুটো কম্পিউটার চিপ্স্। ও দুটো এক টানে ছিঁড়ে নিল আতাসি, ওগুলোর জায়গায় সরু একটা তার দিয়ে বাইপাস করল। বাতি বা টিনটিন শব্দ বন্ধ হলো না। ওদিকে সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কাশেম, কান পাতল। ফ্রাউ ফসেটের ঘুম ভাঙেনি এখনও।

এ-ধরনের অ্যালার্ম সিস্টেম মালিককে তিনবার সঠিক কোড জানানোর সুযোগ দেয়, এরপরও যদি কোড জানাতে না পারে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। প্যানেল থেকে লজিক সার্কিট সরিয়ে ফেলেছে আতাসি, সিকিউরিটি সিস্টেম এখন আর জানবে না অ্যালার্ম বন্ধ করতে কতবার চেষ্টা করা হয়েছে।

অ্যালার্মের টাচ-প্যাডে ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাউডার ছড়াল আতাসি, ওগুলো আসলে সূক্ষ্মভাবে গুঁড়ো করা পেন্সিলের সীসা। তুলি বুলাতেই টাচ-প্যাডে চারটে আঙুলের ছাপ ফুটে উঠল। দেখে বিরাট একটা শ্বাস ছাড়ল আতাসি। ফিঙ্গার-প্রিন্টগুলো জাবড়ে আছে, কিন্তু সেটা মূল বিষয় নয়। চারটে আঙুলের খেলায় অ্যালার্ম রিসেট করা হতো, তার মানে মোটমাট ছত্রিশটা কম্বিনেশন পাওয়া গেল। কিন্তু ওই ছত্রিশটা কম্বিনেশন নিয়ে কাজ করবার সময় পাবে না ওরা। এমন যদি হতো ফসেট বেয়ারমান যে চারটে কী ব্যবহার করেছে, ওগুলো এক-দুই-তিন-চার, তা হলে ভাল হতো। বেশিরভাগ মানুষ ওই এক-দুই-তিন-চারকে দুনিয়ার সেরা অ্যালার্ম কোড মনে করে। বাড়ির মালিক থেকে শুরু করে চোর পর্যন্ত সবাই ওই কোড ব্যবহার করে। টাচ-প্যাডে ওই সিকিউয়েন্স অনুযায়ী আঙুল চালাল আতাসি। লাল বাতি এখনও টিপটিপ করছে। ইলেক্ট্রনিক্সের মৃদু আওয়াজ বলে দিল আরও পাঁচ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেছে।

আতাসি সংখ্যাগুলো উল্টো ভাবে লিখল। না, অ্যালার্ম এখনও অ্যাক্টিভ। লাল বাতি জ্বলছে।

মাইক্রোফোনে ফিসফিস করল আতাসি, 'কয় সেকেণ্ড গেল, বস্?'

'তেইশ সেকেণ্ড,' বাড়ির বাইরে থেকে জানাল রানা।

এখন এক এক করে কম্বিনেশন নিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল আতাসি—১২৪৩ এণ্টার, ১৩২৪ এণ্টার, ১৩৪২ এণ্টার, ১৪২৩ এণ্টার, ১৪৩২ এণ্টার।

'কী করছ, আতাসি?' জানতে চাইল রানা।

'র‍্যাণ্ডম সংখ্যা নিয়ে কাজ করছি, বস্। আসল নাম্বার এখনও পাইনি।'

'তুমি আর দশ সেকেণ্ড পাবে।'

২১৩৪ এণ্টার, ২১৪৩ এণ্টার, ২৩১৪ এণ্টার, ২৩৪১ এণ্টার।

'আতাসি,' ফিসফিস করল কাশেম, 'তিন-এক-চার-দুই দিয়ে দেখো।'

'আতাসি, তোমার হাতে আর পাঁচ সেকেণ্ড আছে,' বলল রানা।

আবু কাশেম কেন ওই সংখ্যার কথা বলেছে জানতে চাইল না আতাসি, সংখ্যাগুলো টিপে এণ্টার কী দাবাল।

ইলেক্ট্রনিক্সের মৃদু আওয়াজ আবারও হলো। লাল বাতির টিপটিপ আরও দ্রুত হলো।

'হচ্ছে না কেন!' আতাসি বিরক্ত হয়ে উঠল।

'উল্টোদিক থেকে লেখো,' বলল কাশেম। '৪২৩১ দিয়ে এণ্টার দাও।'

'এক সেকেণ্ড। দাঁড়াও।' কাশেম যে সংখ্যাগুলো বলেছে, ওগুলো উল্টো সংখ্যা নয়, তবুও লিখল আতাসি, পাঞ্চ করল: ৪২৩১ এণ্টার।

লাল বাতি থমকে গেল। অ্যালার্ম ডিসেবল হয়ে গেছে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে কাশেমের দিকে তাকাল আতাসি।

মৃদু হেসে কাশেম বলল, 'তুমি সোহেল ভাইয়ের ব্রিফিঙে পুরোপুরি মন দাওনি। বেয়ারমানের বয়স্ক দুই ছেলেমেয়ে আছে। প্রথমটা জন্মেছে এপ্রিলের দুই তারিখে, দ্বিতীয়টা মার্চের এক তারিখে। তা হলে পেলে ফোর/টু, থ্রী/ওয়ান। এ তো সাধারণ ব্যাপার! এলিমেণ্টারি, মাই ডিয়ার আতাসি, এলিমেণ্টারি!'

আরও কয়েক মিনিট নিল আতাসি অ্যালার্ম প্যানেলের প্যানিক বাটনগুলো ডিসেবল করতে। ধারণা করল, ফসেট বেয়ারমানের বিছানায় যে কণ্ট্রোলটা আছে, সেটা ঠিক এই কণ্ট্রোলের মত।

ফারাকে সঙ্গে নিয়ে ফয়ে-তে পৌঁছে মাইক্রোফোনে বলল রানা, 'এবার তোমরা যাও। বিশ মিনিটে যদি বের না হই, ধরে নিয়ো আমরা ভাল আছি। সেফ হাউসে চলে যেয়ো। ফারা কালকে মিসেস বেয়ারমানের গাড়ি নিয়ে রেজেন্সডোর্ফ প্রিযনে যাবে। ওখান থেকে ফিরে এসে রোববার পর্যন্ত মহিলাকে আটকে রাখবে। গাড়িটা এখানেই থাকুক, আমি ওটা নিয়ে শহরে ফিরব।'

আতাসি ও আবু কাশেম বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল, স্পোর্টস্ ইউটিলিটি ভেহিকেল-এ গিয়ে বসল। বাইরে বেরিয়ে এল রানাও, সেল-ফোন দিয়ে বেয়ারমান রেসিডেন্স-এ ফোন করল। বাড়ির ভিতরে টেলিফোনটা বেজে উঠল, স্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া গেল। তৃতীয়বারের মত রিং করবার পর ঘুম-ভাঙা কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, 'অ্যালো?'

রাশান টানে ইংরেজি বলল রানা, 'ফ্রাউ বেয়ারমান, আমার নাম মিখাইল এস্তোকোভ। আমি আপনার স্বামীর বন্ধু। খুব জরুরি কথা আছে, আজ রাতে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'ওয়াস? নেইন।' এবার মহিলা আপত্তির সুরে বলল, 'এত রাতে কথা বলতে পারব না। মেইন গট, এখন রাত দুটো বাজে!'

'আমি যে-কথা বলতে চাই সেটা একটু শুনুন,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা। 'আপনার স্বামী এখন বিরাট বিপদের মধ্যে আছেন।' একটু সময় দিল রানা। মহিলা জানে তার স্বামীর বন্ধু-বান্ধব আইনের এদিকের লোক নয়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাথা খেলাতে শুরু করেছে মহিলা। 'আমি এখন আপনাদের বাড়ির সামনে। আপনি দয়া করে নীচে আসুন। আমি আপনার অ্যালার্ম সিস্টেম বন্ধ করে দিয়েছি। যদি আপনার ক্ষতি করতে চাইতাম, তা হলে অনেক আগেই করতে পারতাম।'

'কে আপনি?' মহিলার স্বরে ভয় মিশে আছে।

'আমি এমন এক লোক যে আপনাদের সাহায্য করতে চায়। আমি যে সংগঠনে কাজ করি, সেখানে কাজ করেন আপনার স্বামীও। আমরা ওঁকে বিশ্বাস করি। এখন আমরা জানি, তাঁর ওপর ভয়ঙ্কর হামলা হবে। কয়েকজন আততায়ী তাঁকে সোমবার সকালে খুন করবে।'

'খুন?'

'হ্যাঁ, ফ্রাউ বেয়ারমান। ওরা পিএলওর সদস্য।'

'আপনার নাম কী যেন বললেন?'

'মিখাইল এস্তোকোভ। আপনাদের জন্য আমাকে পিতার্সবার্গ থেকে পাঠানো হয়েছে।'

মহিলা ভাল করেই জানে তার স্বামী রাশান মাফিয়ার সঙ্গে জড়িত। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর দেখা করতে রাজি হয়ে গেল। স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা। ইচ্ছে করলেই মহিলাকে বেঁধে-ছেঁদে তারই বিছানায় ফেলে রাখতে পারত, সকালে ফারাকে দিয়ে মেইডকে বিদায় করানো যেত। এতেও নিজের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে পারত ও। কিন্তু মহিলা নিজে তার স্বামীর কীর্তির জন্য শাস্তি পাবে কেন? কাজেই ঠিক করেছে, মহিলাকে যথাসম্ভব কম কষ্ট দেবে।

সিঁড়ির উপরের ল্যাণ্ডিঙে একটা বাতি জ্বলে উঠল। স্যাণ্ডেলের শব্দ শুনতে পেল রানা। বাঁক ঘুরে ল্যাণ্ডিঙে নামল মহিলা। বলতে নেই, মহিলাকে দেখে বিকট এক ডাইনীর মত লাগল রানার। চুলগুলো জট্ পাকিয়ে গেছে। লালচে মুখটা ফুলে আছে, চোখে জড়িয়ে আছে ঘুম। পরনে ভারী রোব।

রানা নিজে কালো জিন্স পরেছে, সঙ্গে কালো শার্ট। ওটার উপরে চাপিয়েছে কালো লেদার জ্যাকেট। আজকাল রাশান মাফিয়োসোরা এই ফ্যাশন নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে করে। মাথার চুলের বারোটা বাজিয়েছে ও, ওগুলো এখন রেড ওয়াইনের মত লালচে। মুখ ভরা পাঁচ দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে ওকে ডাকাতের মত লাগছে।

মহিলা নেমে আসায় রানা বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে খারাপ লাগছে, ফ্রাউ বেয়ারমান।' মহিলা হাত বাড়িয়ে দিল না, কাজেই হ্যাণ্ডশেক করল না ও। 'কিন্তু আর কোনও পথ ছিল না। আমরা আপনার স্বামীকে রেজেন্সডোর্ফ থেকে বের করব। কিন্তু কাজটা করতে হলে আপনার সাহায্য লাগবে। আপনি একমাত্র মানুষ যাঁকে রেজেন্সডোর্ফে ঢুকতে দেয়া হয়। এদিকে যা ঘটছে, সেটা আপনার স্বামীর জানা দরকার।'

'আপনি বলছিলেন কারা যেন আমার লিয়ারকে খুন করতে চায়,' একটা চেয়ারে বসে পড়ল মহিলা। ইতিমধ্যে দু'চোখে পানি জমে গেছে।

'ওরা তা-ই চায়। আপনি বোধহয় জানেন না, কিন্তু পিএলওর সদস্যরা মনে করে আপনার স্বামী তাদের কোটি কোটি ডলার সরিয়েছেন। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার।'

'কিন্তু... ও তো বলেছিল প্যালেস্টাইনের জন্য যা করেছে সব আইন মেনে করেছে।'

মহিলার সামনে চলে গিয়ে একটু ঝুঁকল রানা, তার একটা হাত নিজের হাতে

নিল। মহিলার আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। 'বেয়ারমান হয়তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এসব গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়। এদেরকে কে বোঝাবে আসল ঘটনা কী। এরা সোমবার সকালে বেয়ারমানকে খুন করবে। তার আগেই কিছু করতে হবে আমাদের।'

'আমি জানি না...' থেমে গেল ফসেট বেয়ারমান, তারপর ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমি জানি না কী করব। আপনারা পুলিশকে জানাবেন না?'

'আপনার স্বামী রাজসাক্ষী হওয়ায় অনেক লোকের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বড় ব্যবসায়ী তো আছেই, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও আছে। তারা পিএলওর চেয়েও অনেক শক্তিশালী। ওরা সবাই চায় আপনার স্বামী যেন আর কখনও মুখ খুলতে না পারেন।'

রানা বুঝতে পারছে, মহিলাকে যথেষ্ট ভয় দেখানো হয়েছে। ফ্রাউ বেয়ারমান মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাত্র একবছর আগে তিনি ছিলেন সফল এক উকিলের সুখী স্ত্রী, আর সব সুইস হাউস-ফ্রাউদের মত আনন্দের মাঝে কাটিয়েছেন। কিন্তু এখন একদল রিপোর্টার তাঁকে ধাওয়া করে, ওই লোকগুলো প্রতিদিন তাঁর স্বামীর কুকীর্তি নিয়ে লেখে। কাজেই এবার মহিলার কাছে মূল কথা পাড়া যায়।

'আমি আসলে যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, আপনার স্বামীর উপরে কোনও হামলা হলে পুলিশ সেটা ঠেকাবে না।'

'কিন্তু সেটা তো নিয়ম না!' রাগে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মহিলা। 'আমরা ট্যাক্স দিই।'

ফসেট বেয়ারমান নিজেদের দিকটা ঠিকই দেখতে পাচ্ছে। আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'আসলে ফ্রাউ, আপনার স্বামী ভিমরুলের চাকে খোঁচা মেরে বসেছেন। আমার কাজ তাঁকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া।'

মহিলা রোবের পকেটে হাত ভরে টিশ্যু বের করল, ওটা দিয়ে চোখ মুছল। কাঁধ টানটান করে বসতে চাইল, নিচু স্বরে বলল, 'আমি জানি না কী করা উচিত। রেজেন্সডোর্ফে গিয়ে লিয়ারকে কী জানাব? আপনার প্ল্যান কী?'

'আপনার কিছু করতে হবে না, ফ্রাউ বেয়ারমান,' ঘাড় ফিরিয়ে ডাইনিং রুমের দিকে তাকাল রানা, 'ওয়ে, তামারা?'

সিঁড়ির উপরের আলোয় ফারা রাইনারকে দেখা গেল, এইমাত্র ডাইনিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। ফ্রাউ বেয়ারমান যমজ বোন দেখে হাঁ হয়ে গেল, ডানহাতের কড়াগুলো দিয়ে মুখ চেপে ধরল। রানার কয়েক সেকেণ্ড মনে হলো, মহিলা জ্ঞান হারাবে। কিন্তু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, চলে গেল ফারার সামনে, অবাক হয়ে দেখল নকলকে।

'ও আমার সঙ্গে এসেছে, ওর নাম তামারা জুকোভস্কি,' নরম স্বরে বলল রানা। 'কালকে ও আপনার বদলে রেজেন্সডোর্ফে যাবে। মনে কিছু করবেন না, তবে ও ওখানে আপনার বদলে গেলে আমাদের প্ল্যান আপনার স্বামীকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবে। হাতে যদি সময় থাকত, তা হলে আপনি নিজেই ওখানে গিয়ে সব বলতে পারতেন, কিন্তু...' মিলিয়ে গেল রানার কণ্ঠ। মহিলাকে

সুযোগ করে দিল ও, যেন নিজেই গুরুতর অবস্থা বুঝে নিতে পারে। এবার বলল, 'উনি জেলে যাওয়ার পর কখনও কিছু দিয়েছেন ওঁকে আপনি? গার্ডরা কিছু দিতে দেয়?'

ফারার দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা এখনও, রানার দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে হলো।

'না, তা দেয় না,' বলল মহিলা। 'তবে বেশ কয়েকবার ছোট চিঠি পাচার করেছি। গার্ডরা কখনও আমাকে সার্চ করেনি।'

'তা হলে তো ভাল। আপনার স্বামীকে চিঠি লিখবেন। কী লিখতে হবে আমি বলে দেব। লিখবেন, আমরা আপনার কোনও ক্ষতি করিনি, সে যেন তামারার কথা মন দিয়ে শোনে। আমার জন্য আপনার চিঠিটা পাওয়া অতি জরুরি। লিখতে পারবেন না?'

'জা। হ্যাঁ, তা পারব।' মনে হলো মহিলার বাস্তব বুদ্ধি ফিরে এসেছে, বুঝতে পেরেছে সত্যি মিখাইল ও তামারা তাকে সাহায্য করছে। 'তারপর আপনারা কী করবেন?'

'আপনি বোধহয় জানতে চাইছেন আমরা বেয়ারমানকে মুক্ত করলে তখন কী হবে। পরে কী হবে জানি না। আমাকে বলা হয়েছে আপনার স্বামীকে একটা সেফ হাউজে পৌঁছে দিতে হবে। তারপর...' যুদ্ধে নেমে পড়া সৈন্যের মত কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এর পরে কী হবে সেটা ঠিক করবেন আপনার স্বামী আর আমার বস্। এটুকু জানি, আপনাকে সরিয়ে নেয়া হবে। আপনাদের দক্ষিণ ফ্রান্সের কোস্তা দেল সোল-এ পৌঁছে দেয়া হবে, ওখানে অবসর জীবন কাটাবেন।'

ফসেট বেয়ারমান ম্লান হাসল। সে বুঝে গেছে, বাকি জীবন আর নিশ্চিন্তে থাকা হবে না।

পরদিন সকাল ন'টায় রেজেন্সডোর্ফ প্রিযনের উদ্দেশে রওনা হলো ফারা। অধীর অপেক্ষায় থাকল রানা। ও জানে, ঝুঁকি রয়ে গেল, ফসেট বেয়ারমান যে-কোনও সময় মত পাল্টে পুলিশে ফোন করতে পারে। ভোরে আজ মেইডকে বিদায় করেছে সে। এখন ডাইনিং রুমে রানার সামনে বসে আছে। ওদের সামনে কোল্ড কফি।

রাশান গ্যাংস্টারের অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে রানা। কথাবার্তা খুব একটা হচ্ছে না, সেজন্য খুশি। উকিলকে কিডন্যাপ করতে আর মাত্র তিনদিন বাকি। অনুভব করছে, একটা একটা করে ঘণ্টা শেষ হচ্ছে, আর আসল সময় এগিয়ে আসছে। এখনও ট্রাকের উপর কারিগরি ফলানো শেষ হয়নি আতাসিদের। রবিবারের মধ্যে কনস্ট্রাকশান সাইটের কাজগুলো শেষ করতে হবে। কপাল ভাল, যে-কোম্পানি ওই বাড়ি তৈরি করছে, রাতের জন্য পাহারাদার রাখেনি তারা।

ওর দলের সবাই দ্রুত কাজ সারছে। আজ রাতে অন্তত দশ টন সিমেন্ট জায়গামত রাখা হবে।

সকাল এগারোটায় পঞ্চমবারের মত ঘড়ি দেখল রানা। ইতিমধ্যে একবার সেল-ফোনে আতাসির সঙ্গে কথা বলেছে। আতাসি-কাশেম-জলিল ওয়্যারহাউজের

কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এখন ট্রাকে পঞ্চাশ পাউণ্ডের সিমেন্টের বস্তা তুলছে।

কোথায় যেন একটা অটোম্যাটিক গ্যারাজের দরজা খুলে গেল। চেয়ার ছেড়ে সদর দরজার কাছে চলে গেল রানা। ঠিকই ধারণা করেছে, এইমাত্র বেয়ারমানের ৭৪০-বিএমডাব্লিউটা ফিরেছে। কলিং-বেল বাজাল না কেউ। দশ সেকেণ্ড পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ফারা।

'কী অবস্থা?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'সহজ কাজ,' অনাবিল হাসল ফারা। 'লোকটা পাক্কা দুই মিনিট পর বুঝতে পারে আমি নকল। গার্ডরা দ্বিতীয়বার দেখেনি।'

'গুড। সে তৈরি থাকবে?'

'পারলে এখনই চলে আসতে চায়। পিএলওর আততায়ীরা তাকে খুন করতে চায় বলতেই সব কথায় রাজি হয়ে গেল।'

'আমরা কী ভাবে কী করব শুনিয়েছ?'

'হ্যাঁ। সোমবার ভোরে রেজেন্সডোর্ফের ডিআইজির সঙ্গে কথা বলবে, জানাবে তক্ষুনি তার অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলতে চায়। তাকে বলেছি, লেবাররা ওই সাইটে নটার সময় কাজ শুরু করে। আর্মার্ড কনভয় তার অনেক আগেই আসতে হবে।'

'কোনও তথ্য ছেড়েছে?'

'দ্য চুহার ব্যাপারে? না। কোনও চাপ দিইনি আমি। তবে যখন শুনেছে রাশানরা আমাকে পাঠিয়েছে, তখন জিজ্ঞেস করেছে আমি ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনের কাজ করি কি না। কোনও কথা বলিনি, শুধু মাথা দুলিয়েছি। মনে হয়েছে বেয়ারমান স্বস্তি পেয়েছে। সরোকিন সম্ভবত তার আসল কণ্ট্যাক্ট।'

'ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন,' বিড়বিড় করে বলল রানা। না, নামটা পরিচিত নয়। 'চিনলাম না ঐ কে। অনিল নামটা কম্পিউটারে সার্চ করলে কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।' ফারার কটা চোখে তাকাল ও। ফারা কণ্ট্যাক্ট লেন্স খুলছে। এক চোখ বেগুনী হয়ে যাওয়ায় রানা বলল, 'মহিলাকে পাহারা দিতে পারবে তো?'

'জিনিসপত্র সঙ্গে এনেছি, কাজেই কোনও সমস্যা নেই।' কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে আলতো চাপড় দিল ফারা। ওটার ভিতরে একটা সিরিঞ্জ আছে। ফ্রাউ বেয়ারমান রবিবার রাতে শুয়ে পড়বার পর তাকে ইঞ্জেকশন দেবে ও। মহিলা চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠবে। তার অনেক আগেই রানা নিজের দলবল নিয়ে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে।

দুই

ডক্টর ফারা যতই ধমক দিক, সিগারেট ছাড়তে আপত্তি আছে সোহেলের। কয়েকদিন আগে জেদী মেয়েটা জোর করে ওর কোলেস্টেরল পরীক্ষা করেছে। সবই ঠিক আছে। কিন্তু ওই যে সিগারেট খায়, সেটাই নাকি ওকে শেষ করবে। ও মারাই যাচ্ছিল, মেয়েটা ওকে সুস্থ করতে অনেক খেটেছে, এককথায় স্বীকার

করবে সোহেল, তা-ই বলে...

রানা বলেছে, 'মেয়েটা বোধহয় তোকে ভালবাসে।'

দুঃখ করে বলেছে সোহেল, 'আমার তা মনে হয় না, ও যদি ভালই বাসবে, তা হলে আমাকে না খাইয়ে মেরে ফেলবে কেন? বুড়োর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনে তুই এ কোন্ বুড়ির হাতে ফেলে দিলি!'

ওই ফারা রাইনার জাহাজে উঠবার পর থেকে ওর উপর শ্যেন দৃষ্টি রেখেছে। মেয়েটার ধারণা, ওর উচিত না খেয়ে থেকে ওজন কমানো। স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে এক কেজি বাড়তি হওয়া এতই বড় দোষ? ওর প্রিয় খাবারগুলো গায়েব হয়ে গেছে মেন্যু ছেড়ে।

আর এখন? ওকে ঠেকায় কে? এইমাত্র খাওয়া শেষ করেছে সোহেল, ভালবেসেই তো মস্ত এক টুকরো চকলেট কেক নিল। ওটা শেষ করে ন্যাপকিন সরিয়ে রাখল। স্টুয়ার্ড ছাড়া মেস-হল-এ কেউ নেই। বিরাট ঢেকুরটা ঠেকাল ও। এবার একটা সিগারেট ধরানো যায়। ডেকে অবশ্য যাওয়া যাবে না। গত দেড় ঘণ্টা ধরে জোর বাতাস ছেড়েছে।

সাদা জ্যাকেট পরা স্টুয়ার্ড বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'সার, আপনার খাওয়া শেষ?'

'আপাতত,' চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সোহেল। 'বাবুর্চিকে বোলো আমার কেবিনে পুডিং পাঠিয়ে দিতে হবে।'

কেবিনে ফিরে আয়েশ করে আর্ম-চেয়ারে বসল ও, একটা সিগারেট ধরাল। দু'টান দিতেই ইন্টারকম বেজে উঠল। সিগারেট ছাইদানীতে রেখে ইন্টারকমের রিসিভার তুলল ও।

'বিরক্ত করতে হলো,' বলল উর্বশী। ও আছে অপারেশন্স সেন্টারে।

পেট ভরে খেতে পেয়ে খুশি মনে বলল সোহেল, 'কোনও সমস্যা নেই, বলে ফেলুন।'

'আপনি জানতে চেয়েছেন মিস্টার ফু-চুঙের কোনও খবর আছে কি না। আমরা এখন ধারণা করছি তিনি ফউজোউ ছেড়ে শাংহাইয়ে ফিরেছেন।'

তথ্যটা চুপচাপ হজম করল সোহেল। 'স্নেকহেড ওকে ওখানে নিয়ে যেতে পারে। ওটা তো দুনিয়ার ব্যস্ততম বন্দর। ফউজোউ বন্দরের বদলে ওখান থেকে লোক তোলা সোজা হবে। ওরা একদল লোককে বেআইনী ভাবে ফ্রেইটারে তুলে দিতে পারবে।'

'মিস্টার চ্যাটার্জি একই কথা বলেছেন। আমিও একমত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কী রানাকে ফোন দেব?'

'না, সেটা উচিত হবে না। আরও দুশ্চিন্তা করবে। আমরা আর কোনও তথ্য পেলে তখন জানাব। ...আমাদের খুনি বন্ধুরা এখন কোন্ পজিশনে আছে?'

'গতি বাড়িয়েছে। এখন ছয় নট-এ চলেছে। আমরা পাঁচ ঘণ্টা পর হো-চি-মিন সিটি থেকে একশো মাইল পুবে থাকব।'

ঠোঁটে সিগারেট তুলল সোহেল, টান দিল না। 'ভিয়েতনামের হো-চি-মিন সিটি? দ্য চুহা কোর্স বদলেছে?'

'না। আগের মতই একশো পঁচাশি। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওটা সিঙ্গাপুরে যাবে। কিন্তু আমার ধারণা, আদতে ওখানে যাবে না। ওটা দুনিয়ার অন্যতম দুর্নীতি-মুক্ত বন্দর। আমার ধারণা দ্য চুহা শীঘ্রি দক্ষিণে রওনা হবে, যাবে ফিলিপাইন্‌স্ বা ইন্দোনেশিয়ায়।'

'হতে পারে,' বলল সোহেল। ইন্দোনেশিয়ায় হাজার খানেক দ্বীপ আছে। ইন্দোনেশিয়ান কোস্ট-গার্ড অনেকটা অসহায়। জলদস্যুরা সহজেই তাদের ফাঁকি দিতে পারবে, নীরব কোনও উপকূলে চোরাই জাহাজ খালাস করা খুব কঠিন হবে না। সোহেলও আন্দাজ করছে, জলদস্যুরা ফিলিপাইন্‌স্ বা ইন্দোনেশিয়ায় যাবে। ওরা কোথায় চলেছে বোঝা যাবে শীঘ্রিই।

'ঠিক আছে, উর্বশী, দ্য চুহা বাঁক নিলে জানাবেন। আর এর মধ্যে ফু-চুং বা রানা যোগাযোগ করলে আলাপ করা যাবে।'

'আই-আই, মিস্টার আহমেদ,' ইণ্টারকম রেখে দিল উর্বশী।

ছাইদানীতে পোড়া সিগারেট ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরাল সোহেল। ভাবল, জলদস্যুরা শান্ত সাগরে যে-কোনও জায়গায় জাহাজ সরিয়ে ফেলতে পারত—তা করেনি কেন? জাহাজের নতুন একটা নাম দিয়ে সামান্য বৈশিষ্ট্য বদলে নিতে হতো। চোরাই জাহাজ খোলা সাগরে কে চিনবে। এসব জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকার সাগরে নামালে ধরবে কে? অথচ জাহাজটা ড্রাই-ডকে নিয়ে বুকে আগলে রাখছে। কেন? দ্য চুহার পিছু নিলে জলদস্যুদের আস্তানায় পৌঁছে যাবে ওরা?

এদিকে রানা কী জানতে পারবে কে জানে! আর ফু-চুং—ও কী মানুষ-পাচার সম্পর্কে কিছু জানতে পারল?

লিউ ফু-চুং জানে না এ-মুহূর্তে ওর কথাই ভাবছে সোহেল, আশা করছে, যে-লোক নিরীহ বোকা মানুষগুলোকে সরিয়ে নিয়ে চলেছে, ফু-চুং তাকে ধরতে পারবে।

দুর্ধর্ষ চিনা স্পাইটি এখন অতীত স্মৃতির মাঝে ডুব দিয়েছে। আর্মিতে কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের সময় ইন্সট্রাক্টর ওকে একটা কোড মনে রাখতে দিয়েছিল, বলেছিল ট্রেইণ্ড কমাণ্ডোরা ধরে ফেললে ওর মগজ থেকে কোড বের করতে চাইবে। একদিন ধরা পড়ে গেল ও। তারপর পুরো একমাস ওকে টর্চার করা হলো। নিয়মিত কয়েকবার পেটানো হতো, রোদের মধ্যে লোহার বাক্সে আটকে রাখা হতো। দিনে একবার অতি সামান্য খাবার দিত। ট্রেইণ্ড কমাণ্ডোরা ক্যাডেটদের নানা ভাবে ভেঙে ফেলতে চাইত। শেষদিকে ওকে পরপর ছয়দিন ঘুমাতে দেয়া হয়নি। ফু-চুং তখন দুনিয়ার সমস্ত গালি শুনেছে। শেষে ওকে ন্যাংটা করে লাল পিঁপড়ের ঢিবিতে বেঁধে রাখা হলো। রাতে ওকে কারাগারে নিয়ে জোর করে দুই পাইন্ট কড়া মদ গিলিয়ে দিল। এরপর জ্ঞান হারায় ও। পরেও কিছুতেই কোড বলেনি ও। এক সময় ট্রেইণ্ড কমাণ্ডোদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ওটা ছিল ট্রেইনিং।

কিন্তু এখন কোনও ট্রেইনিং হচ্ছে না। এটা বাস্তব জীবন। ট্রাকের পিছনের

ট্রেইলারে অবৈধ দেশত্যাগীরা গাদা মেরে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাক ক্রমাগত ঝাঁকি খেয়ে, এপাশ-ওপাশ দুলে এগিয়ে চলেছে। যারা পিছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে, তারা প্রায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

স্নেকহেডদের হাতে আটকে থেকে ফু-চুঙের এখন মনে হচ্ছে, কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের সময় যে-ট্রেইণ্ড কমাণ্ডোরা অত্যাচার করত, এদের তুলনায় তারা একেবারে শিশু। ওগুলো ছিল আনন্দের দিন। তখন মনে একটা শান্তি ছিল, শেষ পর্যন্ত বাঁচবে। কিন্তু এখন কী ঘটবে কেউ জানে না।

ট্রাকের পিছনের বাক্সে একশো মানুষ ঠেসে ভরা হয়েছে। পুরো দু'দিন ওদের কোনও খাবার দেয়া হয়নি, সামান্য পানিও না। সবাই এখনও দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ, পড়ে যাওয়ার জায়গা নেই! বাক্সের ভিতরে ঘাম, প্রস্রাব ও পায়খানার দুর্গন্ধে শ্বাস আটকে আসছে। ফু-চুঙের মুখের ভিতরে চড়া পড়েছে, দম নেওয়ার সময় ফুসফুস ছিঁড়ে যেতে চাইছে।

সিয়েন লাউ ওকে ফউজোউয়ে পৌঁছে দেওয়ার পর থেকে এ-ই চলছে। লাউ ওদের তুলে দিয়েছে পরের লিঙ্কে। এরা ট্রায়াড, মাফিয়ার মতই, তবে চৈনিক ভার্শান। এরা ওর ছবি তুলে সরকারী ডকুমেণ্ট তৈরি করেছে। ওকে আরও ষাটজন উদ্বাস্তুর সঙ্গে একটা সিমেণ্ট ফ্যাক্টোরিতে নিয়ে গেছে, আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে একটা কুঠুরিতে আটকে রেখেছে। ওখানে কোনও বাথরুম ছিল না। ওরা দু'দিন ওখানে বন্দি ছিল। প্রতি রাতে গার্ডরা এসে মেয়েদের নিয়ে গেছে। কয়েক ঘণ্টা পর তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে, সবাই রক্তাক্ত—লজ্জায়, ব্যথায় মৃতপ্রায়।

তৃতীয় দিন সকালে একটা দল এল। লোকগুলো দক্ষিণ এশীয়। এরা বিদেশি টানে স্নেকহেডদের সঙ্গে কথা বলেছে। ফু-চুং আন্দাজ করতে পারেনি লোকগুলো কোন্ দেশি। মনে হয়েছে উপ-মহাদেশীয়। খেয়াল করেছে, এরা আসায় পরিস্থিতি বদলে গেছে। শুনেছে, ওদের সাধারণ পথে চিন থেকে সরানো হবে না। লোকগুলোকে জলদস্যু বলেই মনে হয়েছে ফু-চুঙের।

কুঠুরি থেকে একেক দলে দশজন করে বের করা হয়েছে। তাদের সামনে হাঁটানো হয়েছে। এরা সবাইকে উলঙ্গ করে দেখেছে। ভাব দেখে মনে হয়েছে, মুরগি কিনছে। ফু-চুঙের মন বলেছে, ওদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে। লোকগুলো ওর দাঁত পরীক্ষা করেছে, গোপন অঙ্গ দেখে বুঝতে চেয়েছে ওর কোনও ছোঁয়াচে রোগ আছে কি না। শরীরের শক্তির প্রমাণ দিতে হয়েছে ওদের। একটা বাঁশের দু'পাশে ঝোলানো ওজনদার কাঠের টুকরো ছিল, ওগুলো তুলেছে ওরা।

ওই লোকগুলো হাতের ইশারায় ফু-চুং ও আরও চারজনকে সরে দাঁড়াতে বলেছে। এই দলে ওরাই মোটামুটি শক্তিশালী। ওদের দলের অন্য ছ'জনকে কারাগারে ফেরত পাঠিয়েছে।

ষাটজনের মধ্যে দশজনকে বেছে ট্রাকে তোলা হয়েছে। গার্ডরা মোটা লাঠি দিয়ে ফু-চুংদের ঠেলে ট্রাকের ভিতরে ঢুকিয়েছে। এরা আগেই অনেক লোক তুলেছে। ভিতরে ঢুকে মনে হয়েছে, বড় করে শ্বাস ফেলা যাবে না।

ট্রাকের পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার আগে একটা মোটা হোস পাইপ

তাক করা হয়েছে। ওটা ছিল সবাইকে পানি খাওয়ানোর উদ্যোগ! তাড়াতাড়ি করে পানি পেতে গিয়ে কয়েকজন আহত হয়েছে। ফু-চুং তখন এক মুখ পানি পেয়েছে, ট্রাকের ট্রেইলারের দেয়ালে পানি লেগেছে, সেগুলো সাবধানে চেটেছে। এরপর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা সবাই অন্ধকারে বন্দি হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ট্রাক রওনা হয়েছে। কেউ কোনও কথা বলেনি। তখন ফু-চুং অনুভব করেছে, থমথমে নীরবতাও কষ্ট দিতে জানে। কেউ কাঁদেনি, অভিযোগ করেনি, কেউ মুক্তি চায়নি। ও জানে, এদের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, ভবিষ্যতে তারা চমৎকার জীবন পাবে—কিন্তু বোকা মানুষগুলো বাস্তবে কী পাবে? মৃত্যু? শিরি-ফোরের কন্টেইনারে যারা ছিল, তাদের মত মরতে হবে?

ওর মনে হয়েছে, ট্রাক কয়েক দিন ধরে এগিয়ে চলেছে। তবে, সময়টা বিশ ঘণ্টার বেশি হবে না। স্নেকহেডরা হাই-ওয়ে দিয়ে এগোয়নি, গেছে সেকেণ্ডারি রোড ধরে, নইলে এত কষ্ট হতো না। চাপাচাপি করে দাঁড়িয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ট্রেইলারের ভিতরে বমির টকটক গন্ধ প্রস্রাবের গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ আগে মসৃণ পথে পড়েছে ওরা। তারপর হঠাৎ ট্রাক থেমে গেছে।

কেউ এসে দরজা খুলে দেয়নি। ফু-চুঙের মনে হয়েছে দূরে কোনও বিমান গর্জন করছে। জেট ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছে ও। আওয়াজটা অবশ্য বজ্রের শব্দও হতে পারে। ওরা সবাই বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। শুধু দাঁড়িয়ে থাকা।

অন্তত একঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর কে যেন দরজার কাছে এল, তালা খুলে দিল। ট্রাকের দুই পাল্লা মেলে দেয়া হলো। ট্রেইলারের ভিতরে ওদের পুরো একদিন আটকে রাখা হয়েছে। সবার চোখে তীব্র সাদা আলো এসে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেল না ফু-চুং। চোখে পানি চলে এল, তবে শ্বাস নিয়ে মনে হলো, বেঁচে থাকা কী আনন্দের!

চারপাশ দেখল ও। ওরা আছে প্রকাণ্ড একটা আধুনিক ওয়্যারহাউজের ভিতরে। ভেবেছিল পুরোনো কোনও ডকে এসে থেমেছে, স্নেকহেডরা ওদের ট্রলারে তুলে দেবে। খেয়াল করলে বুঝতে পারত, ও যে ওয়্যারহাউজে আছে সেখানে কোনও কলাম-বিম নেই। ধাতব বিল্ডিংটা ধনুকের মত বেঁকে অনেক উপরে উঠেছে।

সবাইকে ট্রাক থেকে নামতে বলা হলো। অনেকে এত দুর্বল যে নীচে নেমে কংক্রিটে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রাইফেলের খোঁচায় এদের সরানো হলো। মানুষগুলো ছেঁচড়ে সরে গেল। তাদের জায়গায় নামল আরও আরও লোক। কপালকে ধন্যবাদ দিল ফু-চুং, ও এখনও দাঁড়াতে পারছে। সরে গেল ও, ট্রাকের একটু দূরে গিয়ে বসে পড়ল।

ওয়্যারহাউজের ভিতরে ছয়জন গার্ড। পরনে পাঞ্জাবি, কোর্তা। পায়ে কম দামি স্যাণ্ডেল। হাতে একে-ফোরটিসেভেন। চেহারাগুলো খেয়াল করল ফু-চুং, পরে এদের দেখলে চিনতে পারবে।

মাথা ঘোরা কমে আসতে একটা ব্যাপার লক্ষ করল ও—এখানে সাগরের ঘ্রাণ নেই, তার বদলে আছে পরিচিত একটা কেমিকেলের গন্ধ। গার্ডদের

মনোযোগ আকর্ষণ না করে ট্রাকের ওপাশে চলে গেল ও। দূরে ছাদ-ছোঁয়া দরজাটা দেখতে পেল। চমকে গেল আরেকটা জিনিস দেখে—ভাবেওনি এ-জিনিস এখানে থাকবে। একটা কমার্শিয়াল এয়ার-লাইনার। ওটার পিছনের লেজে চারটে ইঞ্জিন বলে দিল, ওটা একটা পুরনো রাশান ইলিয়ুশিন Il-62.

ওই কার্গো প্লেনে তুলে চিন থেকে ওদেরকে সরিয়ে নেওয়া হবে? কোথায়? কর্তৃপক্ষকে কলা দেখিয়ে দেশত্যাগীদের নিয়ে এত সহজে সরে পড়বে?

জেট-লাইনারের দরজা খুলে গেল, গার্ডরা এক লাইনে সবাইকে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। হ্যাঙারের দরজা এখনও আটকে রাখা হয়েছে। পালাবার পথ নেই। প্লেনে গুনে গুনে লোক তোলা হচ্ছে।

ফু-চুং সবার পিছনে হাঁটছে।

ট্রাকটা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, ইঞ্জিন বন্ধ। চাবিটা ইগনিশানে আছে? সবাই ইলিয়ুশিনে উঠছে। ট্রাকটা মাত্র দশ গজ দূরে। এই দূরত্ব ও কয়েক সেকেণ্ডে পেরতে পারবে। ট্রাকের কেবিনে উঠবে, ইঞ্জিন চালু করে হ্যাঙার ভেঙে বেরিয়ে যাবে। একবার এয়ারপোর্ট টার্মিনালে ঢুকলেই প্লেন আটকে দেবে ও। ওই গার্ড, পাইলট, স্নেকহেডরা—সবাই মুখ খুলতে বাধ্য হবে। এদের উপরের লোকগুলো টের পাওয়ার আগেই একের পর এক লিঙ্ক ধরবে ও। মারাত্মক কোনও ভুল না হলে শেষপর্যন্ত এদের নেতাও ধরা পড়বে।

ফু-চুং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, প্লেনে না উঠে ঝুঁকি নেবে ও। এক পা এগোল, মনে মনে মানসিক প্রস্তুতি নিল—এবার দৌড়ে গিয়ে ট্রাকে... কিন্তু ড্রাইভার লোকটা এখনও ওটার ক্যাবে! একটু দমে গেল ফু-চুং। তাকে কাবু করতে গিয়ে খানিকটা সময় বেরিয়ে যাবে। কিন্তু একজন গার্ড ওকে থেমে দাঁড়াতে দেখে ধমকে উঠল, 'এগো, ব্যাটা!'

নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফু-চুং, শরীর শিথিল করে দিল। ট্রাকের ক্যাবের দিকে আরেকবার তাকাল, কিন্তু ওর সামনের লোকটা প্লেনে উঠে পড়েছে। এবার ওর পালা। আবারও ধমক দিল গার্ড, রাইফেল হাতে চোখ গরম করে তাকাল।

লোকটা অন্তত দশ ফুট দূরে। ফু-চুং বাধ্য হয়ে কয়েক ধাপ টপকে প্লেনে উঠল, সামনের দিকের একটা সিটে গিয়ে বসল। কেউ কোনও কথা বলছে না। হয়তো যে-যার মত করে ভাবছে বিদেশে গিয়ে তার জীবন কেমন কাটবে।

গার্ডরা বাইরে দাঁড়িয়ে। প্লেনের দরজা বন্ধ করে দিল। পনেরো মিনিট পর ইলিয়ুশিন টো করে হ্যাঙার থেকে বাইরে আনা হলো।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ ইঞ্জিনগুলো চালু হলো। বিমান ট্যাক্সিং করছে। ফু-চুং জানে, ওরা ফউজোউ ছেড়ে এসেছে অনেক আগে। কাছাকাছি বড় শহর, শাংহাই। দূরত্ব মিলে যায়। সম্ভবত এটা শাংহাই এয়ারপোর্টের কাছেই, ছোট কোনও এয়ারপোর্ট। টার্মিনাল বিল্ডিংটা বড় নয়।

পাঁচ মিনিট পর প্লেন আকাশে উড়াল দিল। ফু-চুং ঠিকই ভেবেছে। শাংহাই আড়াআড়ি ভাবে পিছিয়ে গেল। ইলিয়ুশিন উত্তর দিকে চলল।

পাশে বসে থাকা তরুণ ফিসফিস করে বলল, 'ভাই, আপনার কী মনে হয়, আমাদের প্লেন কতক্ষণ পর আমেরিকায় পৌঁছবে?'

ছেলেটাকে দেখে মনে হয়, এ কোনও খামার-বাড়িতে কাজ করত। বেচারা জানেও না কীসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এখনও ভাবছে ইউনাইটেড স্টেট্স্-এ চলেছে। ওর কাছে ওটা সোনার দেশ। ওখানে পরিশ্রম করলে সবই সম্ভব। ফু-চুং জানে না এই প্লেন ওদের কোথায় নিয়ে চলেছে, তবে এটা নিশ্চিত যে ওরা আমেরিকায় যাবে না। ইলিয়ুশিনের এত রেঞ্জ নেই যে ওখানে যায়। চোখ বন্ধ করে শ্বাস ফেলল ফু-চুং, নরম স্বরে বলল, 'প্লেনটা পৌছে গেলেই বুঝতে পারবে কোথায় পৌছুতে কতক্ষণ লাগল।'

উইকেণ্ডের দু'দিনে রানা ওর দল নিয়ে বার বার রিহার্সেল দিয়ে প্রস্তুত হলো। আগামীকাল লিয়ার বেয়ারমানকে কিডন্যাপ করা হবে। ওরা কনস্ট্রাকশান সাইটে প্রতি রাতে ক্লান্তিহীন শ্রম দিয়েছে, সিমেন্টের ব্যাগ টেনেছে। সবাই মিলে শুক্রবার রাত থেকে শনিবারের বিকেল পর্যন্ত বিশ টন সিমেন্ট সরিয়েছে। ওরা জানে উইকেণ্ডে কেউ আসবে না। ফোরম্যান আসেওনি। সাইটে পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের অভাব নেই। রবিবার রাতে ওয়ায়ারিং শেষে বিস্ফোরক বসাল ওরা। মাঝরাতে কাজ শেষ হয়ে গেল। আতাসি আর আবু কাশেম রানার ভাড়া করা গাড়িটা নিয়ে ওয়্যারহাউজে ফিরে গেল। জায়গাটা প্রায় নির্জন, জুরিখ থেকে বিশ মাইল উত্তরে।

রানা ও জলিল খান সাইটে রয়ে গেল, ট্রেইলারটা শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখবে। অন্ধকার রাত। রাস্তায় কোনও পথচারী নেই যে ওদের দেখে অবাক হবে। মডিফায়েড ট্রেইলারে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা, এক কোনায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ততক্ষণে ক্লান্তিতে ঘুম চলে এসেছে ওর। এবার দেখা যাবে কেমন ঝাঁকি লাগে। ছিটকে পড়বে কি না কে জানে! বিরাট ম্যান ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল ও। জলিল ট্রাক নিয়ে রওনা হলো। রানার হাতে একটা ফ্ল্যাশ-লাইট, কিন্তু এই ধাতব কণ্টেইনার এমনই বদ্ধ যে, শ্বাস আটকে আসতে চাইছে। ছাদের সঙ্গে মোটর ও পুলিগুলো পরীক্ষা করে দেখল রানা। ওগুলো খুব সহজ ভাবে বসানো হয়েছে, জলিল ইচ্ছা করলেই ক্যাব থেকে অপারেট করতে পারবে।

পোর্টেবল রেডিয়ো চালু করল রানা, কোনও স্টেশন ধরতে পারল না। কোনও ফ্রিকোয়েন্সি নেই। এবার সেল-ফোন দেখল, কোনও সিগনাল নেই। 'আমি ফোন করতে পারব না,' ভাবল রানা। 'কেউ আমাকে পাবে না। গুড!'

ট্রেইলারের ভিতরে ব্যাফল ও জ্যামার্স বসিয়েছে ওরা। বাইরে থেকে ইলেট্রনিক সিগনাল পাওয়া যাবে না। আতাসি ও কাশেম ওয়্যারহাউজে বসে ইকুইপমেণ্টগুলো পরীক্ষা করেছে, কিন্তু রানা নিশ্চিত হতে চাইছে যে, ওদের তৈরি সিস্টেমটা শহরে চলবে। বড় শহরে সেল-ফোনের কোম্পানি সিগনালের ক্ষমতা বাড়িয়ে রাখে। কিন্তু এই কণ্টেইনারে কোনও সিগনাল ঢুকলে চলবে না।

প্রতি পাঁচ মিনিট পর সেল-ফোন চালু করল রানা, আধঘণ্টা পর নিশ্চিত হলো, ওর ফোন কোনও কাজে আসছে না।

জলিল বিশ মাইলের রাস্তা ষোলো মিনিটে পার হলো। আতাসি ওয়্যারহাউজের দরজা খুলে দেয়ায় দশ চাকাওয়ালা ট্রাক ভিতরে ঢুকল। কাশেম ট্রেইলারের দরজা খুলে দিল।

রানা নেমে আসায় আতাসি জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলেন, বস্?'

'ভেতরে কোনও সাড়া নেই,' বলল রানা। ও এখন জানে, ওর ফোন কাছের সেল টাওয়ার পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। 'এবার আমরা তৈরি। সবাই ঘুমিয়ে পড়তে পারো। লিয়ার বেয়ারমানের ভ্যান সোয়া আটটায় আসবে। আমরা ওখানে সাড়ে সাতটায় হাজির থাকব। ...ফারা ফিরে গেছে?'

জলিল মাথা দোলাল। 'আপনি যখন ট্রেইলারে ছিলেন তখন ফোন করেছেন। বেয়ারমানের স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে। ফারা হোটেলে চলে গেছেন। সাতটায় জেলখানার সামনে থাকবেন। আর্মার্ড ভ্যান রওনা হলে ফোন দেবেন। কোর্ট পর্যন্ত ভ্যানের পিছন পিছন আসবেন।'

'ঠিক আছে। ওই কথাই হয়েছে আমাদের। জলিল, তুমি কনস্ট্রাকশান সাইটের পিছনে অপেক্ষা করছ। ...আতাসি, কাশেম, তোমরা তোমাদের গাড়ি কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট করবে মনে রেখো।'

'মনে থাকবে, মাসুদ ভাই,' বলল কাশেম।

'আমরা তিনবার ট্রাই করে দেখেছি, কেব্‌ল্‌গুলো ঠিকই আছে, বস,' বলল আতাসি। 'আশা করি সমস্যা হবে না।'

'এখানে এসে এখন পর্যন্ত একটা মাত্র বেআইনী কাজ করেছি আমরা,' বলল রানা। 'এক উকিলের স্ত্রীর অভিনয় করা হয়েছে। সেটা খুব বড় দোষ নয়। কিন্তু কাল সকালে আমরা যা করব সেটা মস্ত বড় অপরাধ। আমরা সুইস পেনাল কোডের সব কটা আইন ভাঙব। মনে রেখো, কোনও ভুল হলে উদ্ধার করার কেউ থাকবে না। অন্তত বিশ বছর রেজেন্সডোর্ফে পচতে হবে।'

কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। কোনও কথা বলল না। ওরা বুঝে-শুনেই ঝুঁকি নেবে।

পরদিন ভোর এল ধূসর মেঘ নিয়ে। বেশ শীত পড়েছে। ওরা শহরে ঢুকে যার যার পজিশনে চলে গেল। একটু পর হালকা বৃষ্টি শুরু হলো। রাস্তায় খুব কম মানুষ বেরিয়েছে। বেশিরভাগ ট্রেঞ্চকোট পরেছে, দু'একজনের হাতে ছাতা। আবহাওয়া ভাল না হওয়ায় রানাদের জন্য সেটা আরও সুবিধা হয়েছে। আজ সকালে যানজট কম থাকবে।

কনস্ট্রাকশান সাইটে ঢুকে পড়তে কোনও সমস্যা হলো না রানার। আজকে তৃতীয় বারের মত ওখানে ঢুকেছে ও। ক্রেনের বিরাট ইঞ্জিনের ইগনিশনের তার ছিঁড়ে রেখেছে, ওগুলো একসঙ্গে মুড়িয়ে দিল। মই বেয়ে উঁচু টাওয়ারে উঠবার সময় বৃষ্টিতে ভিজে গেল, তবে কপাল ভাল যে ক্রেনের ক্যাবে হিটার আছে। ইঞ্জিন চালু করল। এখন অপেক্ষার পালা। থারমোস ভরা কফিতে চুমুক দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। গলা থেকে ঝুলছে ইনফ্রারেড গগ্‌ল্‌স্।

ফারা আরেকবার ফোন করল, জানিয়ে দিল লিয়ার বেয়ারমানের আর্মার্ড ভ্যান রওনা হয়েছে—ওটা কোর্টে পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগবে।

অনেক উপর থেকে রাস্তা দেখতে পাচ্ছে রানা। অনেক দূরে দেখা যায়। আর্মার্ড ভ্যানের এগিয়ে আসা অন্তত পাঁচ ব্লক দূর থেকে দেখা যাবে।

জলিল ওর ট্রাক সাইটের পিছনে রেখেছে। জায়গাটা কাদা ভরা। ট্রাকের

ইঞ্জিন চলছে, মাথা উঁচু করা সাইলেন্সার পাইপ হালকা ধোঁয়া ছুঁড়ছে। আতাসি ও কাশেম অ্যাক্সিডেন্ট করবার জন্য অপেক্ষা করছে। ভ্যানটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড, আতাসি ওটা লুসার্নের একটা মুভিং কোম্পানির কাছ থেকে কিনেছে। মাঝারি ভ্যান, কোর্টের পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আতাসি বা কাশেমকে দেখতে পেল না রানা, তবে জানে, ওরা ইনফ্রারেড গগল্‌স্ পরে আছে, মুখে গ্যাসের মুখোশ।

সাইটের চারপাশটা আরেকবার দেখল রানা। বাড়ি বানানোর মেটারিয়াল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। চারটে ট্র্যাশ কন্টেইনার দেখা গেল, ওগুলো একেকটা মাঝারি ট্রাকের সমান। এক্সকেভেটার আর বুলডোজারগুলো থম মেরে পড়ে আছে। কনস্ট্রাকশান ট্রেইলারের কাছে কেউ নেই। ওখানে লোক আসতে দেরি আছে। গত সপ্তাহে রানার দলের সবাই এখানে চোখ রেখেছে। মজুররা আসবে পৌনে ন'টার দিকে। তার অনেক আগেই কিডন্যাপ হয়ে যাবে বেয়ারমান—যদি কপাল ভাল থাকে।

বৃষ্টির গতি বেড়েছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে হাওয়া। আকাশ আরও কালচে হয়ে গেছে। সাততলা বিল্ডিঙের কঙ্কালটা অন্ধকারে থমথম করছে। রানা নীচে তাকাল। এত উপর থেকে বোমার তারগুলো দেখা যাবে না, কিন্তু ঠিক সময়েই ঘটবে বিস্ফোরণ।

ফোন বেজে উঠতেই রিসিভ করল রানা।

'রানা, আমি,' বলল ফারা। 'বেয়ারমানের ভ্যান হঠাৎ থেমে গেছে। সামনের গাড়ি থেকে নেমেছে এক পুলিশ, ভ্যানের ড্রাইভারকে কী যেন বলছে। দাঁড়াও। মনে হয় ঠিকই আছে। লোকটা নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠেছে। ঠিক আছে, আবার রওনা হয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে ওদের দেখতে পাবে।'

অনেক দূরে পুলিশের গাড়ি দেখল রানা। ওটার পিছু নিয়ে আসছে একটা আর্মার্ড ভ্যান। তারপর দ্বিতীয় ক্রুজার। আর্মার্ড ভ্যান বা ক্রুজারগুলোর মাথায় আলো নেই। সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া গেল না। ওগুলো চারপাশের গাড়িগুলোর সঙ্গে মিশে আসছে।

ফোনের এনক্রিপ্টেড ওয়াকি-টকিতে বলল রানা, 'সময় হলো, তৈরি হও তোমরা।' ওটা রেখে ক্রেনের জয়স্টিক কণ্ট্রোলে হাত রাখল। আগে কখনও টাওয়ার ক্রেন ব্যবহার করেনি ও, এ-জিনিসের উচ্চতার জন্য সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু চালাতে পারবে। সাগরে ডেরিক ও ক্রেন আগে বহুবার ব্যবহার করেছে ও। পারা উচিত। আগেই একশো ফুট লম্বা হরাইযণ্টাল বুমটা রাস্তার উপরে নিয়ে এসেছে। ওটা থেকে ঝুলন্ত ট্রলি ও কেব্‌ল্ এখন রয়েছে ঠিক রাস্তার উপরে। পঞ্চাশ ফুট উপরে স্টিলের বিরাট হুকটা তৈরি।

'আমরা ওদের রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছি,' আতাসি অ্যাক্সিডেন্ট করবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্রুজার ওকে পাশ কাটাক, এগিয়ে গিয়ে ওটার পিছনে গুঁতো দেবে ও।

'সবাই গগলস পরে নাও,' নির্দেশ দিল রানা। বৃষ্টির কারণে খুঁটিনাটি সব দেখা যাচ্ছে না। ক্রেনের হুকের উপরে একটা ইনফ্রারেড লণ্ঠন রেখেছে ওরা, সেটা দেখা যাবে। গগলস না থাকলে বোঝা যেত না ওটা ওখানে আছে, তবে

আইআর ল্যাম্প ভাল ভাবেই জ্বলছে। গগলস পরে মনে হলো ওটা একটা জ্বলন্ত ফ্লেয়ার।

বামে দূরে আচমকা একটা নড়াচড়া দেখতে পেল রানা। ফেরারিটা বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এসেছে। অন্তত আশি মাইল গতি তুলে ছুটছে। চালক পাগলের মত টু-ওয়ে রাস্তার উল্টো লেন ধরে আসছে। ইঞ্জিনের আওয়াজ দু'ধারের বাড়িতে ধাক্কা খেল। রানা একশো ফুট উপরে কন্ট্রোল ক্যাবে, তবুও কর্কশ গর্জন কানে এল। হিসব কষল রানা, ওই গাড়ি একটু পরেই পুলিশের ক্রুজার পিছনে ফেলবে। তার মানে আসল সময় ওটা আতাসির সামনে চলে আসবে। আতাসি যদি এখন এগিয়ে যায়, তা হলে ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট হবে। ফেরারির চালক মরবে, আহত হবে আতাসি ও কাশেম। বেয়ারমানের ভ্যান যেখানে আছে, তাতে ওটাকে ঠেকানো যাবে না, পুলিশের কনভয় নিশ্চিন্তে অ্যাম্বুশ পেরিয়ে যাবে।

'বস্? কী করব?' আতাসির কণ্ঠে তাড়া।

'আমি দেখছি,' শান্ত স্বরে বলল রানা। ক্রেনটা অনেক হিসাব কষে তৈরি রেখেছে ও, কিন্তু এখন নড়াতে হবে। জয়স্টিক নিয়ে দ্রুত কাজে নেমে পড়ল রানা, লম্বা বুমের বাহু সরিয়ে নিল। বুড়ো আঙুলে টগলের সেফটি কভার সরিয়ে দিল। বুম এগিয়ে যাচ্ছে, তারপর ঠিক যেখানে ওটাকে দরকার, সেখানে নিয়ে গেল রানা, সুইচ টিপে দিল। বিরাট হুক আকাশ থেকে খসে পড়ল। ওটার ওজন তিন হাজার পাউণ্ড।

ফেরারির চালক প্রথমে বুঝতে পারেনি ওজনটা নেমে আসছে। সরে যেতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পেল সে। গাড়ির বিশ ফুট দূরে স্টিলের হুকটা এসে নামল, রাস্তার গভীরে গেঁথে গেল। দু'ফুট চওড়া একটা গহ্বর তৈরি হলো। ড্রাইভার টের পেল বিরাট ওই হুক তার এফ-ফোরটির নাকের কাছে। ব্রেকের উপরে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, বনবন করে হুইল ঘোরাল। গাড়িটা পুলিশের সামনের ক্রুজারে ধাক্কা মারল। রানা দ্রুত আরেকটা সুইচ টিপল, হুক রাস্তা থেকে তুলে নিল। ওটা থেকে ধুলো খসে পড়ল। হুকের গুঁতোয় মিলিয়ন ডলারের গাড়ির উইণ্ডশিল্ড চুরমার হয়ে গেল, ছাদের বড় একটা অংশ ছিঁড়ে পড়ল—মনে হলো সার্ডিনের ক্যান কাটা হয়েছে। ফেরারির পিছনের এক চাকা হুকের তৈরি গর্তে গিয়ে পড়ল। কাত হয়ে গেল গাড়িটা, আরেকবার পুলিশের ক্রুজারে ধাক্কা খেয়ে কিছুদূর গিয়ে থামল।

আতাসি বোধহয় দৃশ্যটা দেখেছে, কাজ থেকে মন সরায়নি ও। সামনের ক্রুজার ওর ভ্যান পার হলো। এগোল আতাসি, গতি বাড়িয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে এল, ক্রুজারের পাশে ধাক্কা দিল। জোর গুঁতো গাড়িটাকে আধপাক ঘুরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সরু রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

বেয়ারমান যে আর্মার্ড ভ্যানে আছে, সেটা জোরে ব্রেক কষল। আরেকটু হলে সামনের ক্রুজারে ধাক্কা মারত। কনভয়ের ঠিক পিছনে আছে ফারা, নিজের গাড়ি আড়াআড়ি ভাবে পিছনে রাখল—আর্মার্ড ভ্যান আর উল্টোদিকে রওনা হবে না।

এবার ওয়্যারহাউজে বানানো বিস্ফোরকগুলো ফাটাবে রানা।

বাড়িটা অসম্পূর্ণ, ওখানে চার্জগুলো খুব সাবধানে বসিয়েছে ওরা, যেন মানুষের আত্মা কেঁপে যায়। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটবে। সব ক'টা ফ্লোরে

সিমেন্টের ব্যাগ রাখা হয়েছে, নীচতলা থেকে শুরু করে সাততলা পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে বিস্ফোরণ।

প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। সিমেন্টের ব্যাগগুলো উড়ে গেল। ঘন ধূসর পাউডার ছিটকে উঠল। দূর থেকে দেখলে মনে হবে টুইন টাওয়ারের মত কিছু ঘটছে। একের পর এক কানফাটা আওয়াজ হলো। সিমেন্ট ভরা ব্যাগগুলো মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে উড়ে গেল। সিমেন্টের গুঁড়ো ছিটকে গেল দিগ্বিদিকে। চারপাশের দুশো ফুট এলাকা কালো হয়ে গেল। দু'ব্লক জুড়ে অন্ধকার নামল। যে-কেউ হাড়ে-হাড়ে টের পাবে কালো পর্দা কাকে বলে। হাওয়ার গতি আর বাড়েনি, বাতাস এরকম থাকলে সিমেন্টের ঘন কুয়াশা কাটতে কমপক্ষে দশ মিনিট লাগবে। আশপাশে যারা এখন আছে, কনস্ট্রাকশান সাইট বা রাস্তা দেখতে পাবে না।

একদল হতভম্ব পথচারী তারস্বরে চিৎকার করছে। সেদিকে খেয়াল না দিয়ে ভ্যান ছেড়ে নেমে পড়ল আতাসি, হাতে এক জোড়া কেব্‌ল্। ওপাশে নেমে পড়েছে কাশেমও, তার হাতেও একই জিনিস। দু'জন দু'দিকে ছুটল। ওদের মুখে গ্যাসের মাস্ক। ওগুলো সিমেন্টের বেশিরভাগ গুঁড়ো ঠেকাল। শ্বাসের সঙ্গে কিছু গুঁড়ো ঢুকল, জিভে বিশ্রী স্বাদ পেল ওরা। আইআর মাস্ক-এর কারণে ইনফ্রারেড লণ্ঠনসহ হুকটা নেমে আসতে দেখল। চারপাশে কী হচ্ছে, দেখা গেল না। হুক নেমে এলে কেব্‌ল্ পরাবে ওরা।

আর্মার্ড ভ্যানের ড্রাইভার নিশ্চয়ই ট্রেইণ্ড, অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা দেখেই ধরে নিয়েছে, কোনও গোলমাল আছে। লোকটা সামনের গাড়িকে গুঁতো মেরে বেরিয়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু বিস্ফোরণ বাগড়া দিয়েছে। ভয়ঙ্কর আওয়াজে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই, আন্দাজ করছে পাশের ওই নির্মাণরত বাড়ি ধসে পড়ছে।

আতাসি ঝুঁকে আর্মার্ড ভ্যানের সামনের অ্যাক্সেল দেখল, দ্রুত দুই কেবল ঘুরিয়ে নিয়ে দুটো লূপ করল। সরে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল একটা গাড়ির বনেটে, সেখান থেকে আর্মার্ড ভ্যানের ছাদে—হাতে কেবল-এর দু'প্রান্ত। মুখ তুলে দেখল আঁধার আকাশে খুদে একটা নক্ষত্র। নামছে আইআর ল্যাম্প। ওটার নীচে বিরাট হুক।

এদিকে কাশেম আর্মার্ড ভ্যানের পিছনের অ্যাক্সেল-এ কেব্‌ল্ পেঁচিয়ে নিয়েছে, কয়েক লাফে আতাসির কাছে চলে এল সে, কেব্‌ল্ বাড়িয়ে দিল। ওগুলো নিল আতাসি। কাশেমের কাজ শেষ, মুখোশ খুলে ফেলল সে। পথচারীরা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাশেম মুহূর্তে তাদের মধ্যে হারিয়ে গেল। দু'পাশের ফুটপাথে মানুষের ভিড় থেমে গেছে। সবাই ধুলো-সিমেন্টে মাখামাখি, কনস্ট্রাকশান সাইট দেখছে।

টাওয়ারে নিজের সিটে বসে আছে রানা, অনেক নীচে আইআর-এর জ্বলজ্বলে আলো দেখতে পেল। ওখানে আছে আর্মার্ড ভ্যান। ওটার ছাদে আছে কেবলগুলো। আর্মার্ড ভ্যানের ড্রাইভার গাড়ি নড়িয়েছে। ছাদে আতাসি দৃঢ় ভাবে দু'পা রেখেছে।

গ্যাসের মুখোশের কারণে আতাসির কণ্ঠ চাপা শোনাল, 'ঠিক আছে, বস্। আপনি ঠিক আমার ওপরে আছেন। হুক আরও দশ ফুট নীচে নামান।'

'আরও দশ ফুট নামছে,' আরও কেব্‌ল্ ছাড়ল রানা। দুটো ইনফ্রারেড় বাতি একসঙ্গে মিশে গেল। বাতাসে সিমেন্টের গুঁড়ো ভাসছে, আইআর ল্যাম্প না থাকলে ভ্যান খুঁজে পাওয়া যেত না।

'এখানে রাখুন,' বলল আতাসি। হুকের আই হোল-এ একে একে চারটে কেবল ঢোকাল ও, স্ন্যাপ হুক আটকে দিল। 'ঠিক আছে, বস্। আপনাকে দিয়ে দিলাম। পাঁচটা সেকেণ্ড দিন, সরে যাই।'

লাফ দিয়ে ভ্যানের ছাদ থেকে নামল আতাসি, ফুটপাথে উঠে ভিড়ে হারিয়ে যাবে—কিন্তু কনভয়ের প্রথম ক্রুজার ছেড়ে নেমে এসেছে এক লোক। সে ধুলো-মাখা এক পুলিশ। দু'জনের মধ্যে পাঁচ ফুট দূরত্ব। আতাসির মনে হলো লোকটা কয়েক যুগ ধরে ওকে দেখছে। তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল, বুঝতে পেরেছে ওটা আতাসির হাতে গ্যাস মাস্ক। আতাসি ফু-চুঙের মত মার্শাল আর্টে অত দক্ষ নয়—বাধ্য হয়ে দ্রুত এক পা এগোল ও, পুলিশের পেটে প্রচণ্ড একটা লাথি বসিয়ে দিল।

দেরি করল না, ঘুরেই দিল দৌড়। দু'গজ যেতে না যেতেই আরেক পুলিশ দেখল ওকে। কনভয়ের পিছনের ক্রুজারের প্যাসেঞ্জার-সিট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। লোকটা আকস্মিক অ্যাক্সিডেন্টে আর বিস্ফোরণে থতমত খেয়ে গেছে। তবে এর একহাতে ফ্ল্যাশ-লাইট। ডানহাতে বড় একটা পিস্তল্। আতাসিকে পাগলের মত দৌড়াতে দেখেছে সে। ভাবছে, ব্যাটা ধুলোর মধ্যে ওরকম ছুটছে কোথায়! তারপর আতাসির আরব চেহারা দেখে আন্দাজ করে ফেলল, এ নিশ্চয়ই সন্ত্রাসী! জানালা দিয়ে পিস্তল বাড়িয়ে দিল সে, কিন্তু সন্ত্রাসী যে অ্যাঙ্গেলে ছুটছে তাতে তাকে গুলি করা যায় না। আতাসি দড়াম করে ক্রুজারের প্যাসেঞ্জার দরজায় আছড়ে পড়ল। দরজাটা বন্ধ হলো না, তবে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গোড়ালিটা ভেঙে গেল। লোকটা বিকট এক চিৎকার ছাড়ল, কিন্তু পিস্তল ছাড়ল না। সিগ সাওয়ারটা এখনও শক্ত করে ধরে রেখেছে। আতাসি বাম কনুই দিয়ে তার মুখে গুঁতো মারল। পরপর তিনবার। এতে মুঠো-ভরা পিস্তল আলগা হলো। ওটা কেড়ে নিল আতাসি, নিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল। ততক্ষণে পুলিশ ব্যথায় জ্ঞান হারিয়েছে, ধুপ করে রাস্তায় পড়ল।

এদিকে রানা জয়স্টিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, হুক উপরে তুলছে। দু' সেকেণ্ড থামল ও, কেবলের টেনশন দেখে আন্দাজ করে নিল সাত টনি আর্মার্ড ভ্যান কীভাবে নাড়ানো উচিত। গাড়িটা রাস্তা থেকে তিরিশ ফুট উপরে তুলে ফেলল ও। জয়স্টিক নেড়ে ক্রেনটা ঘড়ির উল্টো দিকে ঘোরাল। ঘন ধুলোর মধ্যে বড়সড় একটা আইআর ফ্লেয়ার দেখতে পেল। ক্রেন ঘোরানোর গতি কমাল ও, ভারী আর্মার্ড ভ্যান সাইটের পিছনে চলে এসেছে। নীচে জলিল ওর দশ চাকাওয়ালা ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করছে।

কয়েকদিন ব্যস্ত ছিল আতাসি-কাশেম-জলিল। ওরা ওয়্যারহাউজে কাটিং টর্চ দিয়ে ট্রেইলারের ছাদ লম্বালম্বি ভাবে কেটেছে। টুকরোগুলো জোড়া দিয়েছে লম্বা হিঞ্জ দিয়ে। ট্রেইলারের ছাদ এখন সম্পূর্ণ খোলা যায়। বাক্সের দু'কোণ জুড়ে জ্বলছে আইআর ল্যাম্প। রানা যেখানে বসে আছে সেখানে সিমেন্টের গুঁড়ো নেই,

অনেক নীচে ট্রাকের ক্যাব দেখতে পেল। ওখানে ধুলোর মত সিমেন্ট উড়ছে। আরেকটু পিছনে তাকাল রানা, গগল্‌স্‌ পরে থাকায় লম্বাটে আলো দেখতে পেল। আস্তে আস্তে ভ্যান নামাল ও।

জলিল ট্রাকের ক্যাবের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। আর্মার্ড ভ্যান ট্রাকের পিঠে নেমে গেল। গাড়ির চাকাগুলো ওজন নিতেই জলিল চলে গেল ওটার ছাদে, হুক খুলে দিল। ছাদ থেকে নেমে ক্যাবে উঠে ফোনে জানিয়ে দিল, 'মাল পেয়ে গেছি। মাসুদ ভাই, চোখে অনেক ধুলো দিয়েছেন, আমি চললাম।' দু'সেকেণ্ড পর ফার্স্ট গিয়ার দিল সে, রিমোট কন্ট্রোল তুলে নির্দিষ্ট বাটন টিপল—ছাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ভ্যানের গার্ডরা এখন একাকী হয়ে গেছে। কিডন্যাপ্‌ড্‌ হওয়ার সময়ে কাউকে ফোন দিলেও, ধুলোর কারণে কিছুই দেখতে পায়নি, জানাতে পারেনি কিছুই। স্থানীয় পুলিশ প্রথমে ভাববে এখানে সন্ত্রাসীদের হামলা হয়েছে। অন্তত দু'ঘণ্টা পর বুঝতে পারবে কী ঘটেছে।

ঘড়ি দেখল রানা, কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে সরু মই বেয়ে নামতে শুরু করল। বিস্ফোরণের পর আর্মার্ড ভ্যান সরিয়ে নেওয়া পর্যন্ত একমিনিট সাতচল্লিশ সেকেণ্ড পার হয়েছে। ওর হাতে আরও তিরিশ সেকেণ্ড ছিল। সেরাদের সঙ্গে কাজ করেছে ও। মই থেকে নেমে অন্ধের মত গেটের দিকে এগোল ও। ধূলি-ঝড় এখনও চলছে। চোখে সিমেন্টের গুঁড়ো ঢুকছে, শ্বাস আটকে আসছে। পাঁচ মিনিট লাগল গেট খুঁজে বের করতে। চেইন-লিঙ্ক ফেন্স টপকাল ও, বাইরের ফুটপাথে নামল।

রাস্তা থমথম করছে, যেন কারফিউ চলছে। অন্যদিকে সরে গেছে পথচারীরা। চালকরা তাদের গাড়ি ফেলে সরে পড়েছে। মনে হচ্ছে রাস্তায় আগ্নেয়গিরির ছাই জমেছে। সিমেন্টের ধূসর ধুলো গাড়ি-ঘোড়া ঢেকে দিয়েছে। ধূলি-ঝড়ের মধ্যে রানা হাতের স্পর্শে গাড়িগুলো ধরে দিক ঠিক করে নিল। দু'ব্লক পেরিয়ে যাওয়ার পর একটু ভালভাবে দেখতে পেল, হাঁটবার গতি বাড়াতে পারল। দেখল, পুলিশের গাড়ি আসছে। গাড়িগুলো অন্ধকারে উজ্জ্বল আলো ফেলল। দ্রুত কোর্ট হাউজের দিকে চলে গেল।

এক ইংরেজ একটা ক্যাফের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, রানাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, সার?' তার পরনে পরিষ্কার কোট। রানার একটু হিংসেই হলো।

'মনে হয় ওদিকে কনস্ট্রাকশানের সময় দুর্ঘটনা হয়েছে,' কাশির ফাঁকে বলল রানা।

'ডিয়ার গড। মারা গেছে কেউ?'

একবার পিছনে তাকাল রানা, ধুলো থিতিয়ে আসছে। হাঁটতে শুরু করবার আগে বলল, 'কপাল ভাল যে মরেনি কেউ।'

লিয়ার বেয়ারমান জানে রাশানরা তাকে উদ্ধার করবে, কাজেই অপেক্ষা করছিল সে। তারপর ব্রেকের আওয়াজ শুনল, ধাতব সংঘর্ষের আওয়াজ পেল। কোনও

অ্যাক্সিডেণ্ট করা হয়েছে। তার সঙ্গে গাড়ির ভিতরে যে গার্ড আছে, সে হতভম্ব হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ আর্মার্ড ভ্যান থেমে গেল। দুই সেকেণ্ড পর কোর্ট হাউজের কাছে একটা বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটল। বেয়ারমান ভেবেছিল ওটা সত্যিই ধসে পড়ছে। তখন ভয় পেয়েছে সে।

গার্ড বা সে ছোট্ট জানালা দিয়ে কিছুই দেখতে পায়নি। কী ঘটছে বুঝবার উপায় ছিল না, তারপর গাড়িটা হঠাৎ দুলতে শুরু করল। মনে হলো গাড়ি আকাশে উঠছে। মাথা ঘুরে উঠল। আস্তে আস্তে গাড়ি অন্যদিকে গেল, মনে হলো বাঁক নিল। তারপর দুলুনি থেমে গেল, একটু ঝাঁকি খেল। তখন মাথার উপরে যন্ত্রপাতির তীক্ষ্ণ আওয়াজ পেয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মনে হয়েছে গাড়িটা আবারও গতি পেয়েছে। তখন বেয়ারমানের মনে হয়েছে, ভ্যান আবার রাস্তায় নেমেছে। জানালা দিয়ে দেখেছে তারা, অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায়নি। সব ঘুটঘুটে অন্ধকার। গার্ড ফোনে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছে, কিন্তু কোনও সিগনাল পায়নি। ভ্যানের ক্যাবে আরও দু'জন আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছে। দু'হাতে ক্যাবের পুরু পিঠে ধাক্কা দিয়েছে। সাড়া পাওয়া যায়নি।

পঁয়ত্রিশ মিনিট এগিয়েছে তারা। বেয়ারমান আন্দাজ করেছে, যে জিনিস ওদের নিয়ে যাচ্ছে, সেটা শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। তারপর গতি আরও বাড়ল। নিশ্চয়ই কোনও হাইওয়ে ধরে এগিয়েছে। কিছুক্ষণ পর গতি আবার কমল, বারবার বাঁক নিল। এরপর গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। বেয়ারমানের মনে হলো, রাশানরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। তবে জানবার পথ নেই যে মিখাইল এস্কোকোভ ও তামারা জুকোভস্কি তাদের কোথায় নিয়ে এসেছে।

গার্ড ও সে চুপচাপ বসে আছে, আশা করছে কিছু ঘটবে। মিনিটগুলো ধীরে ধীরে পার হচ্ছে।

আর্মার্ড ভ্যানের ভিতরে আছে বলে বেয়ারমান জানে না, মাসুদ রানা নামের এক লোক তাকে উদ্ধার করবে। দলের সবাই এখন তার জন্য অপেক্ষা করছে। রানা আরও বিশ মিনিট পর ওর মার্সেডিজ ফারার ফোক্সওয়াগেনের পিছনে রাখল। আতাসি ও কাশেম ওয়্যারহাউজের চওড়া দরজা বন্ধ করে দিল। স্কাইলাইট দিয়ে ধূসর আলো আসছে, সে-আলোয় অন্ধকার কাটেনি। বাতিগুলো ছাদ থেকে ঝুলে আছে, জ্বেলে দিল আতাসি। প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউজের ভিতরের থমথমে পরিবেশ।

গাড়ি থেকে নেমে এল রানা, ফারা ওকে একটা ভেজা রুমাল দিল। মুখ মুছে নিল রানা, মৃদু হেসে বলল, 'এখন পর্যন্ত কোনও ঝামেলা হয়নি। আমরা আমাদের কাজ করতে পেরেছি। তোমরা এখানে আসার পথে চোখ রেখেছ? গুড। এবার টিনের বাক্সটা খুলতে হবে।' জলিলের দিকে তাকাল রানা। 'বলতে পারো ভ্যান কোন্ দিকে মুখ দিয়ে আছে? নামানোর সময় বুঝতে পারিনি।'

'ভ্যানের নাক ট্রেইলারের দরজা তাক করে আছে, মাসুদ ভাই।'

রানা ছাড়া দলের আর সবাই কালো স্কি মাস্ক পরে নিল। চোখ আর ঠোঁট ছাড়া সব ঢাকা পড়ল। সবাই গ্লক ও হেকলার-অ্যাণ্ড কচ নিয়ে তৈরি হলো। রানা

দু'হাত আর মুখে পেইন্ট করল। কয়েক সেকেণ্ড পর শ্বেতাঙ্গ হয়ে গেল। এখন আবারও রাশান হয়ে গেছে ও। একটা হেকলার-অ্যাণ্ড-কচ এমপি-ফাইভ মেশিন গান ওয়ার্ক-বেঞ্চে পড়ে আছে, ওটা তুলে নিল রানা, স্ট্র্যাপটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। বামহাতে দুটো গ্রেনেড তুলে নিল। ওগুলো ডামি প্র্যাকটিস গ্রেনেড, তবে দেখলে আসল জিনিস মনে হয়। ওরা বলবে না ওগুলো নকল, কাজেই ভ্যানের গার্ডরা স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পাবে।

সবাই অস্ত্র হাতে ট্রেইলারের দরজার কাছে দাঁড়াল। রানা দরজার ছিটকিনি খুলল, দলের সবাইকে পাঁচ সেকেণ্ড দিল, তারপর এক ঝাঁকিতে দরজা খুলে দিল। প্রায় একইসময় ট্রেইল্যারে উঠল ওরা, ভ্যানের লম্বা নাকে উঠে পড়ল—সবাই বিকট চিৎকার করছে। কোন্ ভাষা নিজেরাও জানে না। ড্রাইভার ও গার্ডের কাছে শটগান আছে, কোমরে সার্ভিস পিস্তল। কিন্তু তারা আছে বুলেট-প্রুফ কাঁচের ওপাশে। দু'দল কয়েক সেকেণ্ড পরস্পরকে দেখল—কেউ গুলি করতে পারবে না। ড্রাইভার যে-কোনও সময় ইঞ্জিন চালু করবে, ট্রেইলার ছেড়ে নেমে পড়বে। তার আগেই রানার ভয়ঙ্কর হাসি দেখতে পেল সে। লোকটার হাতের গ্রেনেড দেখে দমে গেল ড্রাইভার।

এক হাতে দলের সবাইকে দেখাল রানা, গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলল, ভ্যানের দরজার পাশে চলে গেল। গার্ড ও ড্রাইভার বুঝে গেল, তেড়িবেড়ি করলে মরতে হবে।

গার্ড রাগী চোখে রানাকে দেখছে, তবে বুঝতে পারছে, তার আসলে আর কিছু করবার নেই। লোকটা বাধ্য হয়ে অস্ত্রগুলো ড্যাশবোর্ডের উপরে রেখে দিল। হাতের ইশারা করল রানা। লোক দু'জন বাধ্য হয়ে দরজার হ্যাণ্ডেলের দিকে হাত বাড়াল। দরজা আন-লক হতেই কাশেম প্লাস্টিক-টাই হ্যাণ্ডকাফ বের করল, তাদের হাত আটকে দিল। রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে দেয়া হলো। ড্রাইভারের চকচকে বেল্টে ঝুলছে চাবির রিং, ওটা এক টানে কেড়ে নিল আতাসি, রানার হাতে দিল।

ভ্যানের ছাদে উঠল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে চলে গেল, নামল ট্রেইলারের মেঝেতে। তালায় পাঁচ বার চাবি ঢুকাতে হলো, তারপর আসল চাবিটা লাগাতে পারল। তালা খুলবার আগে মাথার ইশারা করল ও, কাশেম চলে এল, নীচে নেমে পিস্তল নিয়ে তৈরি থাকল।

রাশান টানে ইংরেজি বলল রানা, 'হের বেয়ারমানের সঙ্গে ভিতরে যিনি আছেন, মন দিয়ে শুনুন। আপনার দুই সঙ্গী এখন আমাদের হাতে বন্দি। তারা আপনার কোনও সাহায্যে আসবে না। তাদের কোনও ক্ষতি করা হয়নি। আপনারও ক্ষতি করা হবে না। আমি এখন দরজা সামান্য ফাঁক করব, আপনি আপনার অস্ত্র বাইরে ফেলে দেবেন। আমার কথা মত না চললে টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করব। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?'

'শুনেছি,' জবাব দিল গার্ড।

'হের বেয়ারমান, গার্ডের কাছে কয়টা অস্ত্র আছে?'

'একটাই,' জানাল উকিল। 'পিস্তল।'

'বেশ। গার্ড পিস্তলটা হোলস্টার থেকে বের করেছে?'
'হ্যাঁ।'
'বুদ্ধিমান লোক,' বলল রানা। 'হের বেয়ারমান, অস্ত্রটা তার হাত থেকে নিয়ে নিন, দরজার কাছে চলে আসুন। আমি দরজা সামান্য খুলব। পিস্তলটা এপাশে ফেলে দেবেন।'
ভারী দরজাটা সামান্য ফাঁক করল রানা। কালো একটা রিভলভার রিয়ার বাম্পারে ঠন-ঠনাৎ করে পড়ল, সেখান থেকে মেঝেতে। আতাসি ও ফারা পিছনে চলে এসেছে, হাতে পিস্তল। হাতের ইশারায় দরজা দেখাল রানা, তারপর পুরোপুরি খুলে দিল। ভীত গার্ড একপাশের বেঞ্চে বসে আছে। পরিস্থিতি বুঝেছে সে, দু'হাত রেখেছে মাথার উপরে। আতাসি তাকে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিল, চোখ বেঁধে ফেলে মুখে রুমাল গুঁজে দিল। ফারা মোটা উকিলকে নেমে আসতে সাহায্য করল। দলের আর সবাই চলে এসেছে। তারা ড্রাইভার ও গার্ডকে ভ্যানের ভিতরে ঢোকাল। বাইরে থেকে দরজাটা তালা মেরে দিল রানা।

লিয়ার বেয়ারমান পাঁচজন কমাণ্ডো দেখল। তাদের একজন ধুলো ভরা পোশাক পরে আছে। অন্যদের পরনে কালো ইউনিফর্ম। একজনের কোমরের বাঁক দেখে মনে হলো, সে নারী। বেয়ারমান আন্দাজ করে নিল, এই মেয়ে সেই তামারা জুকোভস্কি। জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনাদের মধ্যে মিখাইল আছেন?'
'ডা,' কমাণ্ডোদের একজন বলল। তার পরনের পোশাক ধূসর ধুলোয় ভরা। মাস্কটা খুলে ফেলল সে, মুখে লেগে আছে ধুলোবালি। লালচে চুল ও দাড়ি বলে দিল সে-ই মিখাইল। 'মিস্টার সরোকিন আপনাকে ওঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন,' বলল রানা। ওই নামটা পেয়েছে ও উকিলের কাছ থেকেই। 'উনি এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শীঘ্রি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে আপনার। ওয়্যারহাউজের পেছনে অফিস আছে, তামারা আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর আমরা এখান থেকে চলে যাব।'
ফারা ওর মাস্ক খুলল, এবার বেয়ারমান দেখল সুন্দরী মেয়েটা আসলে তামারা জুকোভস্কি। এখন আর সে মেকআপ দিয়ে নেই।
'অনেক ধন্যবাদ,' বেয়ারমান ফারার ডানহাত নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিল। 'আমার স্ত্রী? ও কোথায়?'
'আমাদের আরেকটা দল তাকে এখানে নিয়ে আসবে,' বলল তামারা।
'অনেক, অনেক ধন্যবাদ,' আবারও বলল উকিল। 'আমাকে বাঁচানোর জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।'
কাশেম ট্রেইলারের দরজায় স্টেপ ল্যাডার রাখল। মোটা উকিল এবার সাবধানে নামতে পারবে।
'আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি তো?' জানতে চাইল তামারা। উকিল নামবার পর ট্রেইলার থেকে নামল সে।
'না। ভাল আছি। একটু ভয় পেয়েছি শুধু। আপনি শুক্রবার সকালে আসবার আগে জানতাম না প্যালেস্টাইনিরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়। আমার প্রাণ

বাঁচানোর জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

মিষ্টি হাসল ফারা। 'আপনি বরং মিস্টার সরোকিনকে ধন্যবাদ দিন। আমরা শুধু চাকর, ওঁর নির্দেশ মত চলি।'

'জানি উনি ক্ষমতাশালী মানুষ, কিন্তু ভাবতেও পারিনি উনি এরকম কিছু ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

'এসে গেছি আমরা,' বলল ফারা।

অফিসটা সুন্দর করে সাজানো নেই। তিনটে ডেস্ক ও কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেট। এক কোনায় ফ্রস্টেড গ্লাসের জানালা, সেটার পাশে একটা পুরোনো কাউচ। মেঝেতে ছড়ানো ভুস্কা-ভুস্কা লিনোলিয়াম। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ার বাসি গন্ধ। একধারে একটা বড় জানালা আছে, সেটা দিয়ে ওয়্যারহাউজ দেখা যায়, তবে এখন পর্দাগুলো টেনে রাখা হয়েছে। বেয়ারমান ধুপ করে কাউচে বসল। তামারা কেবিনেটের উপর থেকে পানির বোতল নামাল, বোতলটা এগিয়ে দিল।

দু'মিনিট পর মিখাইল এস্তোকোভ অফিসে ঢুকল, এখন তার হাতে মেশিন পিস্তলটা নেই। ওয়্যারহাউজে রেখে এসেছে। তবে কোমরে একটা হোলস্টার আছে।

'এবার কী করবেন, হের এস্তোকোভ?' জানতে চাইল বেয়ারমান।

'আমার আরও লোক আসবে, সেজন্য অপেক্ষা করছি, তারপর আমরা সরে যাব। আমার যে-লোক ট্রাক চালিয়েছে, সে বলছে আরেক দল নাকি আমাদের পিছু নিয়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি সরে যেতে হবে। বুঝতে পারছি না ফিলিস্তিনিরা আমাদের পিছু নিয়েছে কি না।'

'অনেকদিন হলো পিএলও মিডল ইস্ট-এর বাইরে কিছু করেনি,' বলল বেয়ারমান। 'এখন মনে হচ্ছে ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'ইয়াসির আরাফাত মারা যাওয়ার পর অনেক টাকা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,' বলল রানা। 'ওরা খেপবেই তো।'

বেয়ারমান জবাবে কী যেন বলবে ঠিক করেছে, কিন্তু হঠাৎ চমকে গেল সবাই। ওয়্যারহাউজের বাইরে জোর সংঘর্ষের আওয়াজ হয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড, তারপর সাইলেন্সড আগ্নেয়াস্ত্রের গোলাগুলি শুরু হলো। মিখাইলের এক লোক আচমকা বিকট চিৎকার ছাড়ল। প্রায় নিঃশব্দে গোলগুলি চলছে। মানুষটা নীরব হয়ে গেল।

মারা গেছে?

মিখাইল এক টানে পিস্তলটা বের করে নিল, এক হাতে স্লাইড টানল। 'এখানে থেকো,' তামারাকে বলল। দ্রুত পায়ে চলে গেল সে দরজার কাছে, ঝুঁকে দরজার একপাশে সরল। বাইরে গোলাগুলির চলছে। পিস্তল বাগিয়ে দরজা পার হলো মিখাইল, সাবধানে কয়েক পা এগোল, এদিক-ওদিক দেখল। পরমুহূর্তে কয়েকবার গুলি করল। বিকট আওয়াজ হলো। ছায়ার মধ্যে কে যেন ট্রাকের আড়ালে সরে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তামারাকে কী যেন বলতে গেল সে, কিন্তু ঠিক তখন গুলিবর্ষণ হলো তার উপরে। হাঁটু থেকে শুরু করে বুক পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে

গেল তার। আট-দশটা গুলি লেগেছে বুকে। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে অফিসে এসে পড়ল সে। ডেস্কের পাশে ধাক্কা খেল, তারপর চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বুক, শার্ট রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

প্লেট গ্লাসের জানালা নিঃশব্দে চুরমার হয়ে গেল। বুলেটগুলো ঘরের চারপাশে লাগল। গুলি ধাতব আসবাবপত্রে স্ফুলিঙ্গ তুলছে। সস্তা প্যানেলগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গেল। বেয়ারমানের উপরে বিড়ালির মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তামারা, তাকে ঢেকে ফেলল, একইসঙ্গে হোলস্টার থেকে টেনে বের করল পিস্তল। জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে কে যেন, তামারা ছিটকে সরে গেল। লোকটা মুখে পেঁচিয়ে রেখেছে চেক-চেক কেফিয়া। ফিলিস্তিনিরা ওটা খুব পছন্দ করে। তামারাকে দেখেছে সে, তাড়াতাড়ি রাইফেল কাঁধে তুলে ফেলল। তামারাই আগে গুলি করল। লিয়ার বেয়ারমানের মনে হলো, প্যালেস্টাইনির মুখটা তরমুজের মত ফেটে গেল। গলগল করে রক্ত বেরল। মগজ বিস্ফোরিত হয়েছে, বেয়ারমানের পাশের দেয়ালে এসে লাগল। লাল-হলদে রঙে ভরে গেল জায়গাটা। ওই লোকের জায়গায় দাঁড়িয়েছে আরেক আততায়ী, অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে ব্রাশ ফায়ার করল সে। তামারার বাম হাতের অনেকখানি মাংস উধাও হলো, তারপরই পেটে পরপর কয়েকটা গুলি খেল বেচারি। নোংরা মেঝেতে পড়ল তামারা, গোঙালো কয়েক সেকেণ্ড, তারপর একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। পড়ে থাকল নিজের রক্তের মধ্যে।

এত ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে যে বেয়ারমান বুঝে উঠবার আগেই রাশানরা শেষ হয়ে গেল। সে-বেচারা নড়তে পারেনি, এখন আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরছে। ছোট্ট অফিসে রক্তের আঁশটে গন্ধ, গান-পাউডারের পোড়া ধোঁয়া। যে-লোক একটু আগে মিখাইলকে খুন করেছে, সে ঘরে এসে ঢুকেছে। লোকটা তামারার শিথিল দেহের পাশে দাঁড়াল, এক পায়ে দেহটা চিত করল, ক্ষতগুলো দেখল। গমগমে কণ্ঠে আরবীতে বলল, 'ভাল শ্যুটিং, আব্বাস।' জানালায় দাঁড়ানো লোকটাকে প্রশংসা করছে এ!

তার স্যাঙাৎ হাসল।

প্যালেস্টাইনি নেতা মুখ থেকে কেফিয়া সরাল, বেয়ারমানের দিকে তাকাল। তার নাক বাজপাখির মত খাড়া, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাতে পরিষ্কার ঘৃণা। কড়া স্বরে বলল, 'আমি জানি তুমি আরবী জানো। চেয়ারম্যান আরাফাতের হয়ে কাজ করেছ তুমি। উনি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়তে যে-টাকা সরিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো মেরে দিয়েছ তোমরা বেমালুম। বিশেষ করে তুমি।'

'আ... আ... আমি...'

ওয়্যারহাউজ ঘুরে এসে আব্বাস জানাল, 'ওরা সবাই মারা গেছে, রফি। এ বাড়িতে কিছুক্ষণ থাকা যায়।'

'আব্বাস, তোমাদের বলেছিলাম না ওরা ঠিকই এই শুয়োরের বাচ্চাকে বের করে আনবে,' টিটকারির দৃষ্টিতে বেয়ারমানকে দেখল রফি। চোখে তীব্র ঘৃণা। বেয়ারমান টের পেল, ঝরঝরিয়ে পেচ্ছাব হয়ে যাচ্ছে তার। 'বলেছিলাম না অপেক্ষা করলে ঠিকই এটাকে পাব।'

রফি একটানে কোমরের খাপ থেকে একটা সুইচ-ব্লেড বের করল। ফ্লুওরেসেন্ট বাতি পড়ল ওটার উপর, অস্ত্রটা ঝিকঝিক করছে। 'হ্যাঁ, বেয়ারমান, এবার এসো আমরা টাকা নিয়ে গল্প করি।'

তিন

লিয়ার বেয়ারমান কখনও ভাবেনি কারও টাকা মেরে দেয়া খারাপ কাজ। সবসময় মক্কেলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে সে। তারা ছিল সাধারণ কিছু পাসওয়ার্ড, কোড। তারা থাকত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের লেজারে বা আইনী চুক্তির মধ্যে। সেগুলো ছিল কিছু অর্থহীন সই, এর বেশি কিছু নয়। সবসময় নিজেকে নিরাপদ ভেবেছে সে, নিজের ডেস্কে বসে আইনী কাগজের দুর্গের আড়ালে থেকেছে। কিন্তু এখন এই অফিসের দেয়ালে লেগে আছে মৃত মানুষের রক্ত, মগজ! ওই যে চোখের সামনে পড়ে আছে তামারা জুকোভস্কির লাশ। মিখাইলের বুকের মধ্যে যে-গর্তগুলো তৈরি হয়েছে, সেদিকে তাকাবার সাহস নেই তার। এখন সে জানে, সে একটা কাপুরুষ।

কোনও প্রশ্ন করবার আগেই ওয়্যারহাউজ থেকে ডাক এল, অফিস ছেড়ে চলে গেল রফি। আব্বাস দরজা পাহারায় থাকল। লোকটার চোখগুলো জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে! বেয়ারমান জানালা দিয়ে ওয়্যারহাউজ দেখতে পেল। এক প্যালেস্টাইনি ট্রেইলারের পিছনে একটা র‍্যাম্প লাগিয়েছে। ওরা আর্মার্ড ভ্যান নামিয়ে আনছে। বেয়ারমানের কাঁদতে ইচ্ছে হলো। চারপাশে এত রক্ত! মিখাইল লোকটা নিশ্চয়ই কিডন্যাপিঙের সময় কাউকে খুন করেনি? কিন্তু পিএলওর এই নেতা হাসতে হাসতে মানুষ খুন করে। এরা কী তাকে মেরে ফেলবে? তীব্র আতঙ্কে বেয়ারমান কাঁপতে শুরু করল, যেন জোর বাতাসে কাঁপছে বাঁশপাতা।

আব্বাস নামের লোকটা কড়া চোখে বেয়ারমানের দিকে তাকিয়ে আছে। দলের নেতা তাকে ডাক দিল। আব্বাস আরেকবার বেয়ারমানকে দেখে নিয়ে ওয়্যারহাউজে গিয়ে ঢুকল।

একটা করে মিনিট পার হচ্ছে, আর আতঙ্ক বাড়ছে বেয়ারমানের। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে কী হতে পারে। নিশ্চয়ই মারাত্মক অত্যাচার করা হবে তার উপর। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পেল সে। প্রথমে বুঝতে পারল না ওটা কীসের আওয়াজ, তারপর মনে হলো কেউ নাম ধরে ডাকছে। শব্দটা যেন অনেক দূর হতে আসছে। বিকৃত শব্দ। কারও গলা থেকে বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে? দরজার দিকে তাকাল বেয়ারমান। ওখানে তো কেউ নেই! ঘরের চারপাশ দেখল সে। তামারা পড়ে আছে। ওর পোশাকে একগাদা রক্ত লেপ্টে আছে।

'বেয়ারমান।'

কথাটা আবারও শুনতে পেল উকিল। ঘুরে না তাকালে মিখাইলের ঠোঁটে দৃষ্টি পড়ত না তার। বিশ্বাস করতে পারল না সে, রাশান এখনও বেঁচে আছে! লোকটা

বিবর্ণ হয়ে গেছে, বুকের ক্ষত থেকে এখনও কালচে রক্ত বেরুচ্ছে। বেয়ারমানের বুকে আশা জন্মাল। লোকটা যদি তাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে...

মিখাইল বিড়বিড় করে বলল, 'ওদের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যান।' ব্যথায় চোখের পাপড়ি কাঁপছে তার।

তাড়াতাড়ি করে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল বেয়ারমান, 'কী বলব?' আব্বাস বা রফি যে-কোনও সময় চলে আসবে!

'যা খুশি বলুন, যা জানতে চায় জানান। কথা বলতে থাকুন... এরা কেউ বাঁচবে না।' মিখাইলের কণ্ঠ এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে কান পাততে হলো।

মাথা কাত করে শুনতে চাইছে বেয়ারমান, কাতর স্বরে বলল, 'আমি ভালমত শুনতে পাইনি। কেন বাঁচবে না!'

'আমার দলের আরও লোক আসবে...' মিলিয়ে গেল মিখাইলের স্বর। কয়েকবার চোখের পাতা কাঁপল, তারপর জ্ঞান হারাল সে। চোখ উল্টে গেছে। চিন্তা করা যায় না মানুষটা অতগুলো গুলির ক্ষত নিয়ে বেঁচে আছে কী করে। অবিশ্বাস্য!

বেয়ারমানের মনে পড়ল, এই হামলার আগে মিখাইল বলেছিল ওর দলের অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই অস্ত্র থাকবে! কথাটা ভাবতেই বেয়ারমান বুক ভরা সাহস পেল। ওরা তাকে উদ্ধার করবে। ওরা এসে গেলে মরতে হবে না!

ওয়্যারহাউজের ভিতরে একটা গাড়ি স্টার্ট হলো, একযস্ট থেকে জোর আওয়াজ বেরল। আর্মার্ড ভ্যান ধীরে ধীরে ট্রেইলার ছেড়ে বেরিয়ে এল। মুখোশ. পরা এক প্যালেস্টাইনি হাতের ইশারায় ওটাকে নামতে বলছে। একমিনিট পরে রফি এসে অফিসে ঢুকল। লোকটার চেহারায় মিশে আছে তীব্র ঘৃণা-রাগ আর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা। একটা ডেস্কের ওপাশ থেকে চেয়ার টেনে নিল সে, বেয়ারমানের সামনে এসে বসল। 'হ্যাঁ, এইবার বল্, শুয়োর, আমাদের টাকা কোথায় সরিয়েছিস।' লোকটার ইংরেজিতে কিছু একটা আছে, সেটার কারণে তাকে আরও ভয়ঙ্কর মনে হয়।

'যা জানতে চান, সব বলব,' আরবীতে বলল বেয়ারমান, 'কিছুই লুকাবো...'

গায়ের জোরে বেয়ারমানের গালে চড় কষাল রফি। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল। 'তোর আরবী বলতে হবে না, খবরদার! ওটা আমাদের পবিত্র ভাষা... ইংরেজিতে বল্, হারামির বাচ্চা। ...বেয়ারমান? ওটা তো সুইস-ইহুদি নাম মনে হচ্ছে!'

'আমি ক্যাথোলিক।'

আরেক গালে বাম হাতের চড় কষাল রফি। রাগে কাঁপছে সে। 'আমি যা জিজ্ঞেস করব, শুধু তারই উত্তর দিবি, বাড়তি একটা কথাও শুনতে চাই না!'

বেয়ারমান একবার মিখাইল এস্তোকোভের অসাড় দেহটা দেখল। লোকটার দলের সবাই চলে আসছে না কেন!

'আমরা জানি আমাদের অনেক টাকা খেয়ে ফেলেছিস ফালতু কোম্পানি বানিয়ে,' শুরু করল রফি। 'এনপি অ্যাডভাইজার্স, ফাইন্যানশিয়াল অ্যাসে, কমেট

ট্রেডিং—এসব নাম ব্যবহার করে বিরাট জাহাজ কিনেছিস তোরা। ওটার নাম দ্য চুহা। ওটা এখন আছে পুব চিন সাগরে। ...বল্, কে বা কারা এই কোম্পানি চালায়। আমরা জানতে চাই কারা ওই জাহাজের মুনাফা খায়। আমাদের দেশের মানুষ না খেয়ে মরছে আর তোরা আমাদের টাকাগুলো সব গিলে নিয়ে চদর-বদর করছিস!'

দেড় মিনিট পার হয়ে গেল, বেয়ারমান হাঁ করে আছে, বুঝতে পারছে না কী বলা উচিত। এই ফিলিস্তিনি মস্ত ভুল জানে! ওই জাহাজগুলো কিনতে গিয়ে পিএলওর কোনও টাকা ব্যবহার করা হয়নি। পিএলওর টাকা সে অন্যখানে রেখেছে। ওগুলো গেছে সুইটযারল্যাণ্ডের সেরা ব্যাঙ্কারের কাছে। ওগুলো সে ফ্রেডারিখ বাউয়ারের সঙ্গে শেয়ার করেছে। ...আর ওই দ্য চুহা? ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ও মুদাস্‌সর আলী খান ওটা নিয়ন্ত্রণ করে। সম্ভবত বাউয়ারও আছে ওদের সঙ্গে। বেয়ারমান ভাবছে, পিএলও যা খুশি ভাবুক, তার কী? ওরা ওই জাহাজগুলো নিয়ে ভাবছে, ভাবুক না! মিখাইলের লোকজন যে-কোনও সময় এসে পড়বে, এই শয়তানের বাচ্চাদের খুন করবে।

'মিথ্যে বলব না,' ডাহা মিথ্যে বলতে গিয়ে গলা খুসখুস করছে বেয়ারমানের, বারকয়েক কেশে গলা পরিষ্কার করল সে। 'আসলে ওরকম দুটো ফ্লোটিং ডক আছে। একটার নাম দ্য চুহা, আরেকটার নাম দ্য চুহি।'

'এই দুই জাহাজ দিয়ে কীসের ব্যবসা হয়? নিয়ন্ত্রণে কে আছে?' একটু ঝুঁকে গেল রফি।

'এক রাশান আর এক পাকিস্তানি। আমি জানি না কীসের ব্যবসা করে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন আর মুদাস্‌সর আলী খান।'

চড়াৎ করে চড় পড়ল আরেকটা। অসহ্য ব্যথায় কেঁদে ফেলল বেয়ারমান। 'সত্যি ব-ব্বলছি! আ...'

'আর কে?' হুঙ্কার ছাড়ল রফি, 'মিথ্যা বললে খুন হয়ে যাবি, হারামখোর! বল্ আর কারা আছে! আমরা ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন সম্পর্কে জানি। এবার বল্, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে।'

'আ... আমি জানি না,' গুঙিয়ে উঠল বেয়ারমান, জল গড়াচ্ছে দুই গাল বেয়ে। 'বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায় সে। তার কোনও বাড়ি আছে বলে শুনিনি। সেইন্ট পিটার্সবার্গে একটা পোস্ট বক্স রেখেছে সে, ওটার মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়।'

উকিলের গালে আরেক চড় বসাল রফি। 'লেখ্, নম্বরটা লিখে দে এই কাগজে!' কাঁপা হাতে লিখল সে নম্বরটা টেবিলে রাখা প্যাডে। 'এবার শোনা যাক, আর কে কে আছে তোদের সঙ্গে। তুই, সরোকিন, মুদাস্‌সর... আর কে?'

'আমি নেই!' রফিকে আবার নড়ে উঠতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'সত্যি বলছি, ঈশ্বরের শপথ করে বলছি! বাওয়ার থাকতে পারে।' মাথা নিচু করে অন্য দিকে তাকাল বেয়ারমান।

'বাওয়ার থাকতে পারে...'

'কে এই বাওয়ার?'

'ফ্রেডারিখ বাওয়ার। ব্যাঙ্কার। সুইস ব্যাঙ্কের...'
'আর সরোকিন? সে কী করে?'
'আমি জা...' মারের ভয়ে আঁৎকে উঠে তাড়াতাড়ি বলল, 'জীবনে মাত্র একবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। সত্যি! দু'বছর আগে।'
'ওর ব্যাপারে পরে আলাপ হবে। আগে পাকিস্তানি লোকটার কথা বল্। কে সে?'
'মুদাস্‌সর আলী খান। পাকিস্তানি। পাঞ্জাবি। এখন ইন্দোনেশিয়ায় থাকে। বিরাট বড়লোক। তার সম্পত্তির মধ্যে প্রচুর জায়গা-জমি, বিরাট জঙ্গল, শিপিং ইয়ার্ড, হোটেল, রিয়াল এস্টেট—তার সবচেয়ে বড় ব্যবসা সুমাত্রার পশ্চিম তীরে। খান ব্রেকার্স ইয়ার্ড। যতটুকু জানি, ওই জাহাজ দুটো এই লোকই নিয়ন্ত্রণ করে।'
'এর সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয়েছে তোর? কী ধরনের লোক সে?'
'গত বছর তাকে একটা ভিডিও কনফারেন্সে দেখেছি। আর সব পাঞ্জাবির মত, লম্বা-চড়া মানুষ। বুক ভরা দাড়ি।'
'ঠিক আছে, এবার বল্, আমাদের টাকাগুলো কোথায়। একটা মিছেকথা বলবি তো লাশ ফেলে দেব!'
'আম... আম...'
'কোথায়?' আবার চড় মারার ভঙ্গিতে হাত তুলল রফি।
চমকে উঠে মাথাটা পিছিয়ে নিল উকিল। 'বাওয়ারের কাছে। ওর ব্যাঙ্কের সেফটি ভল্টে রেখেছি।'
'লেখ্,' প্যাডের দিকে ইঙ্গিত করল রফি। 'অ্যাকাউন্ট নাম্বার, কোড... সব। টাকাগুলো তোলা না গেলে তোর মুক্তি নেই।'
এতক্ষণে ক্ষীণ আশা জাগল বেয়ারমানের মনে, টাকাগুলো পেয়ে গেলে এরা হয়তো ওকে খুন না-ও করতে পারে। ঠিক নম্বরগুলোই লিখল সে। মনে আশা, এখুনি হয়তো মিখাইলের লোকজন এসে এদের খুন করে ওকে উদ্ধার করবে। নম্বর-টম্বর কোনও কাজে আসবে না এই বদমাশটার। লেখা শেষ হতেই ফড়াৎ করে ওপরের চারটে পাতা ছিঁড়ে নিল রফি। কিছু বলতে যাচ্ছিল, মাথায় লাল ফুটকির কেফিয়ে জড়ানো একজন আরবকে ছুটে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে চাইল তার দিকে।
দৌড়ে এসে অফিসে ঢুকল আব্বাস, হড়বড় করে বলল, 'রফি! পুলিশ গাজি আবদেলকে গ্রেফতার করেছে! আবদেল জানে আমরা এখন কোথায় আছি। রফি...' থেমে গেল সে, সর্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।
বিরাট শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রফি, ওরফে আতাসি। ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে কাউচের ভিতরে গেঁথে গেল বেয়ারমান। ভয় পাচ্ছে লোকটা এবার তাকে খুনই করবে। কাঁপা স্বরে বলল, 'আমাকে মেরো না। প্লিজ!'
'চোপ!' ধমক দিল আতাসি। হাত বাড়িয়ে দিল সে, সঙ্গে সঙ্গে আব্বাস হার্ড প্লাস্টিকের এয়ার প্রোটেক্টর ও রুমাল এগিয়ে দিল।
বেয়ারমান ভয়ে চাপা স্বরে বলল, 'কী... ক্কী করবেন আপনারা?' তার দু'চোখ বিস্ফারিত। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা পানি গাল বেয়ে মেঝেতে পড়ল। সে বুঝে

গেছে, এবার তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে।

'অ্যাইও! চোপ!' ধমক দিল আতাসি।

বেয়ারমানের দু'হাত পিছ-মোড়া করে বেঁধে ফেলা হলো, কানে ভরে দেয়া হলো এয়ার প্রোটেক্টর। চোখ বাঁধা হলো। বেয়ারমান থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখে কিছুই দেখছে না সে, কানেও কিছু শোনা যায় না। মুখের মধ্যে রুমাল গুঁজে দেয়ায় চেঁচাতেও পারবে না। কে যেন তাকে ঘাড় ধরে টেনে ওঠাল। ধাক্কা দিয়ে অফিস থেকে বের করা হলো। কোথায় যে নিয়ে চলেছে, ঈশ্বর জানেন! কয়েক পা এগোনোর পর একটা গাড়ির সাইলেন্সারের গন্ধ পেল সে। পোড়া মোবিলের গন্ধ। তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে একটা গাড়িতে তোলা হলো। ধুপ করে বসে পড়ে নিতম্বে ব্যথা পেল সে। আশপাশে আরও কেউ আছে। বোধহয় সেই তিন গার্ড। প্লাস্টিকের টাই দিয়ে তার দু'গোড়ালি আটকে দেয়া হলো। টেপ দিয়ে দু'কব্জি ও হাত পেঁচানো হলো গায়ের সঙ্গে। মামির মত আটকা পড়ল সে। আঙুল নাড়ানোর উপায় নেই, কাজেই আর টেপ খোলা যাবে না।

রফি যার কাছ থেকে এসব শিখেছে, তার লোকজন সহজ কাজে ভুল করে না।

বেয়ারমান আন্দাজ করতে পারছে, তিন গার্ড এখন তার পাশে পড়ে আছে।

দড়াম করে আর্মার্ড ভ্যানের দরজা বন্ধ করা হলো। বেয়ারমান শুনতে পেল না রফি কার সঙ্গে কথা বলছে। যদি জানত মিখাইল সুস্থ হয়ে উঠেছে, খুবই অবাক হতো। মিখাইলের লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তারা ওয়্যারহাউজের যেসব জায়গায় গেছে, সেসব জায়গায় ব্লিচ ছিটাচ্ছে, পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলছে। আঙুলের ছাপ বা ডিএনএ-র ট্রেস থাকলে চলবে না। ওয়্যারহাউজ পুড়িয়ে না দিলে ওগুলো থাকতে পারে। রানার মার্সিডিজ গাড়ি ভাল ভাবে ধোয়া হলো, কোথাও সিমেন্টের কণা থাকল না।

বেয়ারমান পড়ে আছে। জানে না, কিছুক্ষণ পর সত্যিকারের ফিলিস্তিনিরা আসবে! ওরা সত্যিই পিএলওর সদস্য! মাসুদ রানা নামের এক বদ-লোকের খবর পেয়ে আসবে ওরা, টাকা তো উদ্ধার করবেই, নানান কৌশলে তার পেট থেকে আরও অনেক কথা বের করবে; তারপর গভীর রাতে আর্মার্ড ভ্যান নিয়ে সামনের রাস্তায় রেখে সরে পড়বে। পুলিশের হাতে আবারও ধরা পড়বে সে! তাদেরকেও বলতে হবে অনেক কথা।

অফিসে ঢুকে সবাইকে দেখল রানা। আতাসি এইমাত্র কেফিয়ে খুলেছে। ওটা চওড়া কাঁধে জড়িয়ে নিল। ফারা কিছুক্ষণ আগে জলিলের হাতে মারা পড়েছিল, এখন দিব্যি হাসছে।

'চমৎকার অভিনয়,' প্রশংসা করে বলল রানা। 'ভাল করেছ তোমরা।'

'বস্, আপনি যেমন শিখিয়েছেন,' হাসছে আতাসি। 'এমন দুষ্টবুদ্ধি আমার মাথায় আসত না।'

'মাসুদ ভাই যেভাবে মারা গেল,' হেসে ফেলল জলিল ওরফে আব্বাস। 'জানালা থেকে দেখে মনে হলো বড় করুণ মৃত্যু!'

ফারা মাথা নাড়ল। 'তবে ও মরেনি। ওকে ফিসফিস করে বেয়ারমানকে কী যেন বলতে শুনেছি। তবে ভুল হতে পারে, আমি তো তার অনেক আগেই মরে গেছি! তারপর দেখলাম আতাসি উকিলের গালে কষে কয়েকটা চড় দিয়েছেন। আমার ধারণা তার গালের ব্যথা কয়েকদিন থাকবে।'

কাশেম মৃদু মৃদু হাসছে, 'আমি অনেক আগের মরা। সেই যে ফারা আমাকে খুন করলেন, তারপর আর সুযোগ পেলাম না।' শরীর থেকে নানান ডিভাইস খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। হলিউডি এক্সপার্টরা ওগুলো স্কুইব বলে। সিনেমা তৈরির সময় এগুলো সুপার এফেক্ট আনবার জন্য ব্যবহার করা হয়। মোফিজ বিল্লাহ জিনিসগুলো মার্ভেলে বসে তৈরি করেছে। রানাকে মনে মনে স্বীকার করতে হলো, ছোকরা ভাল জিনিসই বানিয়েছে।

বিশেষ এক ভেস্ট পরেছে ওরা, ওটা শার্টের তলায় পরতে হয়। ভেস্টে আছে অসংখ্য অতি খুদে বিস্ফোরক, সঙ্গে থাকে কয়েক আউন্স নকল রক্ত। কাশেমকে দেয়া হয়েছিল আরও সফিসটিকেটেড স্কুইব। তার কেফিয়ের ভিতরে ছিল ওটা, কিছুক্ষণ আগে মনে হয়েছে ফারার গুলিতে তার খুলির অর্ধেক উড়ে গেছে। অফিসের দেয়ালে ও ফার্নিচারে ছিল বারুদের খুদে সব চার্জ। ওগুলো ঠিক সময় ফাটিয়ে দেয়ায় মনে হয়েছে বুলেট আঘাত করছে। যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে বুলেট ছিল ব্ল্যাঙ্ক।

পুলিশ যখন বেয়ারমান ও গার্ডদের খুঁজে পাবে তখন অদ্ভুত কাহিনি শুনবে। গার্ডরা বলবে একদল রাশান বেয়ারমানকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যোগ করবে বেয়ারমান, এই ঘটনার পর আরেক দল এসে রাশানদের খুন করে। তারা ফিলিস্তিনি। পিএলও। তারা দু'দফা জেরা করেছে তাকে। তারপর রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে।

পুলিশ চিন্তায় পড়ে যাবে, রাশানদের লাশ কোথায়! ওই ওয়্যারহাউজ কোথায়, যেখানে এতকিছু ঘটল! এই ফিলিস্তিনিরা কোত্থেকে এল? অনেক প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু উত্তর পাবে না কেউ।

সন্দেহ নেই, সুইস কর্তৃপক্ষ খেপে উঠবে, সীমান্তে কড়াকড়ি করবে, কিন্তু যখন কাউকে ধরতে পারবে না, তখন এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকবে, তাদের রাজসাক্ষী তো ফিরে পাওয়া গেছে!

কর্তৃপক্ষের জিজ্ঞাসাবাদে বেয়ারমান আরও যা বলবে সেটা ঠেকাতে পারবে না রানা। লোকটা ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ও মুদাসসর আলী খানের ব্যাপারে কিছু বললে সুইস কর্তৃপক্ষ তদন্ত করতে পারে। তবে আশা করা যায়, বেয়ারমান সরোকিন ও পিএলওর ভয়ে চুপ থাকবে।

ওয়্যারহাউজে একটা মাত্র বাথরুম। সবার আগে সেখানে গেল ফারা, মুখ-হাতে লেগে থাকা নকল রক্ত ধুয়ে ফেলল। স্কুইবের জন্য মনে হয়েছিল হাতের এক অংশ উড়ে গেছে, কিন্তু এখন হাত ধোয়ার পর লালচে একটা দাগ থাকল। হাতে অবশ্য সামান্য ব্যথা আছে। পোশাক পাল্টে নিল ও।

ওর পরে সবাই একে একে বাথরুম ব্যবহার করল। পোশাক পাল্টে নিল। সবাই অফিসে জড় হওয়ার পর রানা বলল, 'ফারা, তুমি হোটেলে ফিরবে। প্লেনের

রিজার্ভেশন করেছ?'

'দুপুর দুটোয় ইস্তাম্বুলে পৌছব,' বলল ফারা। 'তুমি ওখানে পৌছলে একসঙ্গে রওনা হবো। বেয়ারমান যা বলেছে, তাতে মনে হয় তুমি ইন্দোনেশিয়ায় যাবে?'

'মনে হচ্ছে শিকলের পরের লিঙ্ক ওই মুদাস্সর আলী খান,' বলল রানা।

'আতাতুর্ক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌছে তোমার জন্য টিকেট নেব,' বলল ফারা। 'জাকার্তার রিজার্ভেশন করব। ...আরেকটা কথা, আমার মেকআপ-এর সবকিছু এখানে আছে, ওগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'সব পুড়িয়ে ফেলা হবে,' বলল রানা। 'আমরা কিছুক্ষণ পর চলে যাচ্ছি। কয়েক ঘণ্টা পর ওয়্যারহাউজে আগুন লাগবে।'

বিদায় নিল ফারা, ওর ফোক্সওয়াগেনে গিয়ে উঠল। আতাসি ওয়্যারহাউজের দরজা খুলে দিল, ফারা চলে যাওয়ার পর আবারও দরজা বন্ধ করল।

জলিল আরেকবার গেল বাথরুমে, আঙুলের ছাপ ও ডিএনএ মুছবার জন্য ব্লিচ করল। আতাসি ও কাশেম ওয়্যারহাউজের বিভিন্ন জায়গায় আগুনে বোমা রাখল। মাসুদ ভাই বলেছেন ওয়্যারহাউজটা ট্রাক ও আতাসির ভ্যানসহ পুড়ে ছাই হবে।

সবাই ফিরে আসবার পর রানা বলল, 'আমরা আলাদা ভাবে নানা পথে যাচ্ছি, কাজেই বিপদ হওয়ার কথা নয়। আশা করি আগামীকাল তোমরা এই সময় মার্ভেলে পৌছে যাবে।'

'বস্, বোমার টাইমারে কত বসাব?' জানতে চাইল আতাসি।

'একটু অপেক্ষা করো,' বলল রানা, ফোন করল মার্ভেলে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করল উর্বশী, 'কেমন আছ তোমরা, রানা?'

সুইটযারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ চিন সাগরের সময়ের পার্থক্য হিসাব করল রানা। 'শুভ বিকেল, উর্বশী। আমরা ভাল আছি। তুমি?'

'কী করে বেড়াচ্ছ?'

'কিছুই নয়, আমাদের কাজ শেষ। ...ভাল কথা, উর্বশী, অনিল কি জুরিখের সব খবর রাখছে?'

'হ্যাঁ। একটু ধরো, মিস্টার চ্যাটার্জিকে দিচ্ছি।'

দশ সেকেণ্ড পর ফোনে এল অনিল। 'রানা, সিএনএন আর স্কাই নিউজ দেখছি আমি। সুইস কর্তৃপক্ষ কিছুই বুঝতে পারছে না। প্রথমে ওরা ভেবেছে ওই বাড়ির স্ট্রাকচারাল ফল্ট আছে, পরে ভেবেছে ওদের নিজেদের নাইন/ইলেভেন ঘটছে। পুলিশের আলাপে কয়েকবার আর্মার্ড ভ্যানের কথা এসেছে। দু'জন বলেছে ওখানে যখন বিস্ফোরণ হয়, তখন এক অস্ত্রধারীকে দেখা গেছে।'

'ওরা সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে, বা ফ্লাইট পিছিয়ে দিচ্ছে?'

'না। ওদের ধারণা এসব স্থানীয় ব্যাপার, দ্রুত সামলে নেবে।'

'তা হলে আপাতত আমরা নিরাপদ।'

'ওদের দুইয়ে দুইয়ে চার করতে দেরি হবে। হয়তো জানবেও না কী হয়েছিল।'

'তোরা সুমাত্রা থেকে কতটা দূরে?'

'আরও দু'দিন। কেন?'

'লিয়ার বেয়ারমান এক লোকের নাম দিয়েছে। মুদাসসর আলী খান। সে দ্য চুহার মালিকদের একজন। এই লোকের একটা কোম্পানি আছে—খান ব্রেকার্স ইয়ার্ড। খুঁজে দেখ্ মুদাসসর আলী খান আর তার কোম্পানি সম্বন্ধে কী পাওয়া যায়। দ্য চুহার মত আরেকটা ফ্লোটিং ড্রাই-ডক আছে, ওটার নাম দ্য চুহি—ওটাও খানের।'

'পাওয়া যাবে। আর কিছু?'

'গগলকে বল্ ও যেন দ্য চুহাকে অনুসরণ করা বাদ দিয়ে বেস্ট প্র্যাকটিকাল স্পিডে খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের দিকে রওনা হয়ে যায়।' মার্ভেলের বেস্ট প্র্যাকটিকাল স্পিড ওটার টপ স্পিডের চেয়ে অনেক কম। দিনের আলোয় মার্ভেল টপ স্পিড তুললে আশপাশের জাহাজগুলো চমকে যাবে। রেইডার জ্যাম না করলে জাহাজের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, সেই দ্রুতগতির রহস্য প্রকাশ পাবে।

'গগলকে জানিয়ে দিচ্ছি। ...কবে ফিরবি?'

'মনে হয় কালকে, রাখি তা হলে,' ফোন রেখে দিল রানা। আতাসি-কাশেম-জলিল ওর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। 'পুলিশ এখনও কিছু বুঝতে পারেনি। আমরা সবাই ছ'ঘণ্টার মধ্যে সুইটযারল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বেয়ারমানকে নিয়ে গাজি আবদেলের কাজ চার-পাঁচ ঘণ্টা পর শেষ হবে। রাত বারোটার পর রাস্তায় আর্মার্ড ভ্যান ফেলে যাবে। ঠিক আছে, আতাসি, তোমরা টাইমারগুলো রাত আড়াইটায় সেট করো।'

মার্সিডিজে উঠল রানা, ওর স্যাঙাতরা ওয়্যারহাউজের দরজা খুলে দিল। ও চলে যাওয়ায় যে-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রানা এখন লম্বা ড্রাইভে চলেছে। মিউনিখে যাবে, ওখান থেকে উঠবে প্লেনে।

চার

টেবিলের ওপাশে বসা লোকটার পরনে কম দামি পোশাক। তাকে দেখতে কেমন লাগছে তা নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই তার। মাথায় সুতির গোল টুপি, অনেক পুরোনো। প্রচুর ঘামে লোকটা। টুপি-শার্টে ঘামের অসংখ্য তিলে, শার্টের দু'বগলে গোল হলদেটে দাগ। গোঁফ-দাড়ি খাবারের টুকরো ধরে রেখেছে। একে দেখেই রানার মনে হয়েছে, এ লোক মহা হারামজাদা।

অফিসে এমন একটা ভঙ্গি নেয়া হয়েছে যে, এটা কাজের জায়গা, আড্ডা মারবার জায়গা নয়। টেবিলে অসংখ্য কাগজ ছড়িয়ে আছে, ফাইল কেবিনেটগুলো উপচে পড়ছে। আসবাবপত্র সস্তা, আরাম করে বসবার জন্য নয়। কাজ শেষ হলেই বিদায় করবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। দেয়ালে কয়েকটা পোস্টার ঝুলছে, ওগুলো সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ান ট্যুরিস্ট বোর্ড থেকে পাওয়া। ডেস্কের একপাশে একটা কম্পিউটার, তবে ওটার যাওয়া উচিত প্রাচীন প্রকৌশল জাদুঘরে।

এক ইন্দোনেশিয়ান মহিলা রানাকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। মহিলা বয়স্কা। কাঠির মত চিকন, দেখলে মনে হয় অতি ক্লান্ত। পরনে বসের মতই সস্তা পোশাক। রানার ধারণা হয়েছে, এদের স্মাগলিং সেটআপ-এ মহিলাকে গরীব দেখানো হয়েছে, তা নয়—আসলে বেতন এমনই কম দেয়া হয় যে, ভাল পোশাক পরা তো দূরের কথা, পেট ভরে খেতেই পায় না।

অনিল মুদাস্‌সৃর্‌ আলী খান ও তার পরিবারের উপরে একটা ডোশিয়ে তৈরি করেছে। এখানে আসবার আগে ওটা পড়েছে রানা। এখন ও জানে, মুদাস্‌সৃর্‌ আলী খানের সহায়-সম্পত্তি আধ বিলিয়ন ডলারের বেশি। পাঁচশো একর দেয়াল ঘেরা জমির উপর তার বাড়ি। লোকটার এগারো ছেলে-মেয়ে ও তাদের পরিবারের সবাই একইসঙ্গে প্রকাণ্ড ওই বাড়িতে থাকে। জামাইদের বিশ্বাস করে না সে, বেআইনী ব্যবসায় বসায় না। তার ছেলেরা সেসব দেখে। তার বড় ছেলে আজগার আলী খান তাদের খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ।

এই আজগার আলী খান জাকার্তার ডাউন-টাউনের ঘুপচি একটা এলাকায় অফিস করে। এখান থেকে ডক বেশি দূরে নয়, তবে নতুন কেউ শহরে এলে জায়গাটা খুঁজে বের করতে হিমশিম খাবে। অফিসে বসে জাহাজের বাঁশি শুনছে রানা।

আজগার আলী খানের সঙ্গে দেখা করা কঠিন হয়নি। মিউনিখ থেকে জাকার্তায় আসবার পথে রানা মার্ভেলের ক্যাপ্টেন হিসেবে এ-অফিসে যোগাযোগ করেছে। বলেছে, ও জাহাজটা স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করবে। জানতে চেয়েছে খান ব্রেকার্স ইয়ার্ড ওর জাহাজ কত টাকায় কিনবে।

রানা আজগারের মতই কম দামি পোশাক পরেছে। যে-দিন ও ফসেট বেয়ারমানকে ঘুম থেকে তুলল তার কয়েকদিন আগে থেকে দাড়ি রেখেছে, পরেও কাটেনি। মাথায় এখন উইগ, তার উপর চাপিয়েছে ইয়টসম্যান ক্যাপ। দেখলে মনে হয় কালো প্যান্টে কখনও ইস্ত্রি পড়েনি। পুরোনো একটা কালো ব্লেযার পরেছে ও, ওটা কোনওমতে বিরাট ভুঁড়ি ঢেকেছে। ব্লেযারের হাতায় দুটো বোতাম নেই। বিত্তশালী খানরা যদি নিজেদের মজুর শ্রেণীর মানুষ হিসেবে দেখায়, তা হলে রানা কী দোষ করেছে? ও এখন এমন এক দুর্ভাগা ক্যাপ্টেম, যার বেতন অতিরিক্ত কম। তাকে বাধ্য হয়ে চুরি করতে হয়।

আজগার আলী মার্ভেলের রিপোর্ট পড়ছে। অবশ্য মার্ভেলের নাম পাল্টে দেয়া হয়েছে, ওটা এখন পুরোনো একটা ফ্রেইটার, হাল-এ লেখা: দ্য ফরচুন। কাগজে লেখা আছে মার্ভেলের ডাইমেনশন, টনেজ, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি। কাগজের সঙ্গে এক ডজন ছবিও আছে। আজগার খানের চোখ শুয়োরের মত কুতকুতে, রানার মনে হলো লোকটা ডকুমেন্টগুলো চোখ দিয়ে গিলছে। অফিসের ভিতরে আওয়াজ বলতে পুরোনো একটা খটাংখট করা সিলিং ফ্যান আর জানালা দিয়ে আসা গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ।

'এখানে একটা জিনিস দেখতে পেলাম না, ক্যাপ্টেন... হব্‌স্‌,' লোকটা তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে দেখল। 'আপনি কিন্তু ওউনারশিপ ডকুমেন্টস দেখাননি। আমার মনে হচ্ছে আপনি এই জাহাজের মালিক নন, কাজেই আপনি চাইলেও স্ক্র্যাপ

বিক্রি করতে পারবেন না।'

রানার মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল, খানের চোখে তাকাল। 'আপনি ওখানে আরেকটা জিনিস দেখেননি।' কয়েকটা কাগজ টেবিলের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল ও।

কাগজগুলো নিল খান, পড়তে পড়তে মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে একবার রানাকে দেখে নিয়ে আবারও কাগজে মন দিল। তার চোখে লালসা ফুটে উঠল।

'এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন,' বলল রানা। 'আমরা করাচি থেকে আট হাজার টন অ্যালুমিনিয়াম তুলেছি। ওগুলো এখন জাহাজের হোল্ডে। মিস্টার খান, এখন কেমন হয় আমরা ওগুলো নিয়ে ব্যবসা করলে? আপনি যদি ভুলে যান জাহাজের মালিক অন্য কেউ, তা হলে আমিও ভুলে যাব ইনগটগুলোর কথা। ওখানে দশ মিলিয়ন ডলার পড়ে আছে।'

কাগজগুলো ডেস্কে নামিয়ে রাখল আজগার, ওগুলোর উপরে দু'হাত রেখে রানাকে হিসাবী চোখে দেখল। 'ক্যাপ্টেন, একটু খুলে বলুন তো আপনি কেন খান ব্রেকার্সে এলেন?'

লোকটা জানতে চায় রানা কী করে জানল তাদের ব্রেকার্সে বেআইনী কাজ হয়। 'মিস্টার খান, কবিরা বলেছেন সাগর আসলে অনেক বিশাল। কথাটা ঠিক, কিন্তু ওঁরা একথা বলেননি দুনিয়াটা আসলে ছোট্ট একটা গ্রাম। কান খোলা রাখলে অনেক কথা শোনা যায়।'

'তো সেসব কথা কোথা থেকে শোনা গেল?'

ক্যাপ্টেন টম হবসের চেহারা দেখে মনে হলো এসব গোপন বিষয়ে আলাপ করতে চায় না। 'অনেকে অনেক কথা বলে।' ঠিক মনে পড়ছে না কে আপনার ব্রেকার্স ইয়ার্ডের কথা বলেছিল, কিন্তু আমি নামটা মনে রেখেছি। আপনি তো জানেনই, কথা আগুনের চেয়ে দ্রুত ছড়ায়, বাতাসের আগে ছোটে—আর বেশি কথা কখনও কখনও মানুষের জীবন ধ্বংস করে।' ক্যাপ্টেন হব্স্ হিমশীতল চোখে আজগার খানকে দেখল, এখন তার চেহারা পাথরের মত হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন মুখে বলছে না কিছু, কিন্তু নীরবে যেন বলে দিল: যথেষ্ট প্রশ্ন করেছ, বাড়তি প্রশ্ন করলে এবার বিপদে পড়বে তুমি—এমন ব্যবস্থা করব, কর্তৃপক্ষ খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে তদন্ত করবে।

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল আজগার। 'শুনে খুব ভাল লাগল যে আমাদের ব্রেকার্সের এত প্রশংসা করা হয়েছে! ক্যাপ্টেন হব্স্, আমার মনে হয় আমরা ভাল কোনও চুক্তি করতে পারব। নিশ্চয়ই জানেন, স্টিলের স্ক্র্যাপের দাম বেড়েছে, এখন হাল্কের জন্য একশো দশ ডলার করে পাবেন।'

'আমার ধারণা প্রতি টনে আমি সাড়ে পাঁচশো ডলার পাব,' বলল রানা। যা বলছে তার চারগুণ পাবে ওই অ্যালুমিনিয়ামের ইনগটের জন্য, কিন্তু জিনিসগুলো নিজের না হওয়ায় ওর বুকে এখন আর অত সাহস নেই।

'না, এত টাকা আমি দিতে পারব না,' বলল আজগার। তার ভাব দেখে মনে হলো এইমাত্র তার বোনকে চরম অপমান করা হয়েছে। 'দুশো ডলার দিতে পারব, তাতেও কষ্ট হয়ে যাবে।'

'আপনি হাসতে হাসতে চারশো দিতে পারবেন, কিন্তু আমি তিনশোতে রাজি হবো।'

'ক্যাপ্টেন... ক্যাপ্টেন...' গুঙিয়ে উঠল খান, এবার রানার মনে হলো লোকটার মাকে চরম অপমান করা হয়েছে। 'তিনশো ডলার? ওই দামে আমার ব্রেক ইভেনই হয় না।'

'তার বেশি পাবেন। আপনি ভাল করেই জানেন হোল্ডে যা আছে সেটার দাম কত করে। ...ঠিক আছে, প্রতি টন আড়াইশো ডলার করে দেবেন, আর দু'দিন পর আপনার ইয়ার্ডে জাহাজ পৌঁছে যাবে।'

প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবছে আজগার। রানা জানে, আগামী পরশু দ্য চুহা খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে পৌঁছুবে, সেসময় মার্ভেল নিয়ে হাজির হবে ও। খান কী ভাবছে জানতে পারলে ভাল হতো। সাবধানী লোক হলে জাহাজটা ড্রাই-ডক থেকে নামিয়ে ভেঙে ফেলবে, জলদস্যুতার প্রমাণ রাখবে না। এদিকে তাকে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, তাতে তার কয়েক মিলিয়ন ডলার লাভ থাকবে। লোকটা লোভকে গুরুত্ব দেবে, নাকি সতর্কতাকে?

সিদ্ধান্ত নিল আজগার খান। 'ইয়ার্ডে এখন জায়গা নেই। সাতদিন পরে জাহাজ আনুন। তখন জায়গা দিতে পারব।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'ঠিক আছে। আর জাহাজের মালিক যদি জাকার্তায় কোনও গুপ্তচর পাঠায়, তা হলে দুদিনের মধ্যে ইয়ার্ডে চলে আসব।'

আজগার খান কথাটা পুরোপুরি বুঝবার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা, রিসেপশন পার হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের সঙ্গে দেখা করল রানা। পনেরো মিনিট পর ক্যাপ্টেনের হেলিকপ্টার সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল। মার্ভেল এখন শিপিং লেনের বাইরে রানার জন্য অপেক্ষা করছে। আলম সিরাজ গত দু'দিন ঘুমাননি, এক এক করে রানার কমাণ্ডো দল জাকার্তায় ফিরেছে, তাদের জাহাজে পৌঁছে দিয়েছেন। মার্ভেলের সবাই এখন জাহাজে, কিন্তু একজন এখনও নেই—লিউ ফু-চুঙের কোনও খবরই নেই।

জাহাজে ফিরে সোজা নিজের কেবিনে চলে এল রানা, দুর্গন্ধওয়ালা পোশাক ও ভুঁড়ি প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরল, রেখে দিল ওয়াক-ইন ক্লজিটে। জিনিসটা পরে আবার লাগতে পারে।

দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে স্নান শেষে নিজেকে মানুষ বলে মনে হলো ওর। ট্রাউজার্স আর পোলো শার্ট পরল, চুল আঁচড়ে নিল। ভাবল, ওদের শিকার ধরবার সময় এসেছে। আজগার আলী খান চোরাই জাহাজ কিনতে রাজি হওয়ায় এখন লোকটাকে গ্রেফতার করানো যাবে। জুরিখ-কর্মকাণ্ডের সুফল পাওয়া যাচ্ছে এখন, ওরা এখন জানে জলদস্যুতা ও আদম-পাচার একইসঙ্গে চলছে। আজগার খান ও তার বাপ বেআইনী কাজে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। এবার এদের হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে। এখন বাকি রইল জাল গুটিয়ে তোলা। ওদের মাধ্যমে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনকে পাওয়া যাবে। হয়তো বেরিয়ে আসবে আরও বড় কুমির।

পায়ে নরম মোকাসিন পরে টেবিলের সামনে চলে এল রানা, ইন্টারকমে

স্টুয়ার্ডকে ওদের জন্য বোর্ডরুমে স্ন্যাক্স পাঠাতে বলল। কেবিন থেকে বেরিয়ে আসবার আগে দলের সিনিয়রদের জানিয়ে দিল, ওরা জরুরি মিটিঙে বসবে।

বোর্ডরুমটা জাহাজের সুপারস্ট্রাকচারের পিছনে, স্টার-বোর্ডে। ওখানে চল্লিশজন মিটিং করতে পারে, তবে টেবিলে বসবার ব্যবস্থা মাত্র বারোজনের। চওড়া পোর্টহোলগুলো খুলে দিলে প্রচুর আলো-হাওয়া আসে। সবার আগে ওখানে পৌঁছে গেল রানা, নিজের চেয়ারে বসে পড়ল। ওর পরপর হাজির হলো স্টুয়ার্ড, প্লেট ভরা গরম সামুসা ও কফি দিয়ে গেল।

আধ মিনিট পর বোর্ডরুমে ঢুকল সোহেল, উর্বশী ও ফারা, যার যার চেয়ারে বসল। সোহেল কাপে কফি ঢালল, একবার ফারাকে দেখে নিয়ে উদাস হয়ে সামুসা নিয়ে কামড় বসাল।

'এগুলো বিষ,' বলল ফারা। 'বিশেষ করে যার ওজন ঠিক নেই।'

সামুসা শেষ করে আরেকটা নিল না সোহেল, কফিতে চুমুক দিয়ে বদ-দোয়া দিল, 'আল্লা যেন তোকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়!'

পঁচিশ সেকেণ্ড পর এল গগল, অনিল ও আতাসি, চেয়ারে বসে পড়ল।

'তা হলে মিটিং শুরু করা যাক,' বলল রানা। '...ফু-চুঙের কোনও খবর পাওয়া গেল?'

'না,' বলল আতাসি।

ফারার দিকে তাকাল রানা।

'তোমরা জাপানের উদ্দেশে রওয়ানা হবার আগেই মিস্টার ফু-চুঙের উরুতে সাবকিউটেনিয়াস ট্র্যান্সমিটার বসিয়েছি আমি, সেটা তুমি জানো,' বলল ফারা। 'ওটা কাজ করছিল তখন, পরেও কোনও সমস্যা করেনি। তোমাদের প্রত্যেকের ট্র্যান্সমিটার কাজ করছে।'

মার্ভেল ছেড়ে যাদের আর কোথাও যাবার প্রয়োজন হতে পারে, তাদের প্রত্যেকের চামড়ার নীচে স্পেশাল বার্স্ট্ লোকেটার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরমুহূর্ত থেকে ওগুলো বিপ্ পাঠাতে শুরু করে। জিনিসটা ছোট্ট একটা স্ট্যাম্পের মত, দেহের নিজস্ব নার্ভাস সিস্টেম থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। বারো ঘণ্টা পর পর একটা কমার্শিয়াল স্যাটালাইটকে তথ্য পাঠায়, জানিয়ে দেয় মানুষটা বেঁচে আছে কি না, এবং কোথায় আছে। ওই স্যাটালাইট মার্ভেলকে তথ্য পাঠায়। এই টেকনোলজি আবিষ্কার হওয়ায় আজকাল আর গুপ্তচররা গুবরে পোকা সঙ্গে রাখে না। কেউ ধরা পড়লেও তার সঙ্গে বাগ থাকে না। তবে নতুন টেকনোলজি, এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

'ফু-চুং বসের শেষ ট্র্যান্সমিশন থেকে জানা যায়, উনি শাংহাইয়ের কাছাকাছি ছিলেন,' বলল আতাসি। 'জায়গাটা নতুন এয়ারপোর্টের কাছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'এমন হতে পারে ওকে প্লেনে তুলে পাচার করা হয়েছে।'

বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল সোহেল, একটা সিগারেট নিল, কিন্তু ডক্টর ফারার কড়া দৃষ্টি দেখে ঠোঁটে ঝুলাল না। বলল, 'আমরা এ নিয়ে ভেবেছি। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, তা থেকে মনে হয় না স্মাগলাররা ওকে

প্লেনে তুলেছে। আমরা স্মাগল্ড মানুষের কন্টেইনার পেয়েছি, ফু-চুং সে-পথে এগিয়েছে, স্মাগলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমার ধারণা ওকে সাগর পথেই নিয়েছে।'

'এমন যদি হয় সাগর পথে স্মাগলিং হচ্ছিল, তারপর জলদস্যুরা হামলা করেছে?' বলল অনিল। 'হতে পারে আদম-ব্যাপারীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর জাহাজ করে লোক পাঠাবে না।'

'আমাদের জানা নেই জলদস্যুরা কত মানুষ এভাবে নিয়েছে,' বলল গগল। 'ট্রলারে যারা ছিল তারা হয়তো প্রথম ব্যাচ।'

'অথবা ওই ট্রলারে ওরাই ছিল শেষ ব্যাচ,' বলল অনিল। 'আদম-ব্যাপারীরা হয়তো ঠিক করেছে এখন থেকে প্লেনে মানুষ পাচার করবে।'

'এরা তো আগেও লোকজন সাগর পার করেছে, এখন যদি প্লেন কাজে লাগায়, তা হলে বুঝতে হবে এদের সংগঠন নতুন করে সাজিয়েছে,' বলল সোহেল।

এ কথার পর চুপ হয়ে গেল সবাই। বুঝতে পারছে বাস্তবে কী ঘটছে তা না জেনে কথা বলা উচিত নয়। ফু-চুঙের ট্র্যান্সমিটার থেকে বিপ পেলে জানা যাবে ও কোথায় আছে।

'আতাসি, তুমি চারপাশে যেসব স্যাটালাইট আছে, সেগুলোর দিকে নজর দাও,' বলল রানা। 'ওরা হয়তো ইলেকট্রনিক বিপ পাচ্ছে।'

'আমরা ওগুলো দেখেছি, বস,' নরম স্বরে বলল আতাসি। 'এখনও দেখছি। শাংহাইয়ের এক হাজার মাইলের মধ্যে যত স্যাটালাইট আছে, সেগুলো দেখছি আমরা। কিন্তু কোথাও কোনও বিপ পাইনি।'

'ফু-চুং এক হাজার মাইল সার্কেলে থাকলে তোমরা বিপ পেতে,' বলল রানা। 'আমার মনে হয় ও ওই সার্কেলে নেই। তুমি শাংহাই থেকে শুরু করে চারপাশের দু'হাজার মাইল খোঁজো। এরপরেও যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তা হলে সার্কেলের বিস্তৃতি আরও বাড়াবে। যে-করে হোক ফু-চুংকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'ঠিক আছে, বস্, আমরা রেঞ্জ বাড়াব।'

'এখন থেকে খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে চোখ রাখতে হবে।' অনিলের দিকে তাকাল রানা। 'তুই দ্য চুহার সিস্টার শিপের ব্যাপারে কিছু পেলি?'

'আমরা জানি, দ্য চুহা আর দ্য চুহি রাশানদের তৈরি,' বলল অনিল। 'দুই ড্রাই-ডক একইসঙ্গে কেনা হয়েছে। কয়েকটা ডামি কোম্পানি ওগুলো কিনেছে। এসব কোম্পানি গড়েছে উকিল লিয়ার বেয়ারমান। দ্য চুহা স্যালভেজের কাজ করে, কিন্তু দ্য চুহিকে ও-কাজে নামানো হয়নি। আজ পর্যন্ত কেউ ওটা ভাড়াও নেয়নি। ওই ড্রাই-ডক লয়েড'স-এর লিস্টে আছে, কিন্তু বলা হয়েছে, ওটার মালিকরা এখনও জাহাজটা ভ্লাদিভোসটোক থেকে ডেলিভারি নেয়নি।'

প্রশ্ন করতে মুখ খুলেছিল রানা, কিন্তু অনিল উত্তর জানিয়ে দিল, 'চেক করা হয়েছে। ওই ড্রাই-ডক আঠারো মাস আগে সরিয়ে নেয়া হয়। ওটার টাগ দুটোর নাম কারও মনে নেই।'

ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'তা হলে কোনও সূত্র পাব না।'

অর্ধেক সামুসা প্লেটে নামিয়ে রাখল উর্বশী, বলল, 'দেড় বছর হলো খান অ্যাণ্ড কোম্পানি দ্য চুহিকে গোপন কাজে নামিয়েছে। ওরা হয়তো ওই ড্রাই-ডক দিয়ে জাহাজ ধরছে না, কিন্তু সাগরে আর সব স্মাগলিং করছে। ইচ্ছে করলেই ওরা চোরাই গাড়ি সরাতে পারবে। ওই ড্রাই-ডকে একশোর বেশি রাখা যাবে। স্মাগলাররা হাসতে হাসতে এক হাজার লোক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নিতে পারবে।'

একটু থমকে গেল সবাই। উর্বশী ঠিক কথাই বলেছে। ওই ড্রাই-ডক যদি মানুষ পাচারে ল্যাগানো হয়, তা হলে ঠেকাচ্ছে কে?

'এরকম হতেই পারে,' বলল গগল। 'গড়বড় দেখলে সাগরে মানুষ ডুবিয়ে দিতেই অসুবিধে কী?'

'দ্য চুহিকে খুঁজে বের কর্, অনিল,' বলল রানা। 'আমাদের জানা দরকার ওটা কী কাজ করছে।'

'দেখছি কী করা যায়,' গম্ভীর স্বরে বলল অনিল।

'এই মিটিঙে আরেকটা কথা বলব আমি,' বলল রানা। 'তোরা জানিস আমি এখানে আসবার আগে জাকার্তায় অপেক্ষা করেছি। আমার কাজ ছিল ওখানে বসে মার্ভেলকে স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করা। লিয়ার বেয়ারমান যা বলেছে, সেটাই ঠিক। গতকাল পর্যন্ত আমরা সন্দেহ করেছি, কিন্তু এখন ভাল করেই জানি, খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের মালিক-পক্ষ চরম দুর্নীতি-পরায়ণ। এরা নিয়মিত জলদস্যুতা করে। এমন হতে পারে, এরাই মানুষ-পাচার করছে।

'আজগার আলী খান চায় না আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের ইয়ার্ডে হাজির হই। দ্য চুহার ভেতরের জাহাজটা এর আগেই সরিয়ে ফেলবে। তবে সে-সুযোগ পাবে না। আগামী পরশুদিন আমরা তার ইয়ার্ডে হাজির হবো। দ্য চুহা আসুক, আমি সে-রাতেই ব্রেকার্স ইয়ার্ডে হানা দেব।'

'কোনও পরিকল্পনা করেছ?' জানতে চাইল গগল।

'এখনও না।'

'ব্রেকার্স ইয়ার্ডে তোর একা যাওয়া ঠিক হবে না,' বলল সোহেল। 'আমিও যাব। বসে থেকে বিরক্ত হয়ে মরতে চাই না। তোর কোনও আপত্তি আছে?'

বহুদিন তুই অপারেশনে নেই, বলতে পারত রানা, কিন্তু বলল, 'যাস, আমরা দু'জন প্রথমে ওখানে ঢুকব।' ও জানে, সোহেল অফিস করে হাঁপিয়ে উঠেছে, ওকে এখন বাধা দিলে মনে ভয়ানক কষ্ট পাবে। অনিলের দিকে চাইল রানা, 'অনিল, তোর কাছে ইয়ার্ডের ছবি আছে?'

'আছে। তবে কমার্শিয়াল স্যাটালাইট থেকে পাওয়া। একবছর আগে তোলা। ওই ইয়ার্ড তখন তৈরি হচ্ছে।'

'আলম সিরাজকে বলব ইয়ার্ডের উপর দিয়ে দু'বার ঘুরে আসতে,' বলল সোহেল। 'উনি ভাল ছবি নিয়ে আসতে পারবেন।'

'ওই ইয়ার্ড রবিনসনের রেঞ্জের বাইরে,' বলল উর্বশী। 'মিস্টার সিরাজ জাকার্তা গেলে তাঁকে আরেকটা হেলিকপ্টার যোগাড় করে দিতে পারব। আমার এক বান্ধবীর স্বামী হেলিকপ্টার ভাড়া দেয়।'

'তা হলে খুব ভাল হয়,' বলল সোহেল।
'ক্যাপ্টেন ঘুরে আসুন, ছবিগুলো দেখলে বোঝা যাবে ইয়ার্ডে কোথায় কী আছে,' বলল রানা।
'সবাই ছবির কপি নেব, তারপর আলাপ করা যাবে,' বলল উর্বশী।
ওর দিকে তাকাল রানা। 'আমরা জানি না ইয়ার্ডে কতজন পাহারা দেয়, সঙ্গে কী ধরনের অস্ত্র রাখে—কাজেই তোমার দলের সবাইকে সম্পূর্ণ সশস্ত্র রাখবে। তোমাদের সঙ্গে যেন শোল্ডার-ফায়ার্ড মিসাইলও থাকে।'
'ঠিক আছে।'
'ফারা...'
'জানি,' রানা কথা শুরু করবার আগেই বলল ফারা, 'আমাদের ব্লাড সাপ্লাই যথেষ্ট রয়েছে। তারপরও যদি লাগে, ক্রুদের কাছে ভ্যাম্পায়ার হয়ে দেখা দেব।'
মৃদু হেসে ফেলল সবাই।
'তোমরা জেনেশুনে এই অপরেশানে নামছ, কাজেই আমার আর কিছু বলার নেই,' বলল রানা। 'সবাই মানসিক ভাবে তৈরি হয়ে নাও। ধরে নিতে পারো, আমরা খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে ঢুকলে লড়াই হবে। ...কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো।'
অপেক্ষা করল রানা, কেউ কোনও প্রশ্ন তুলল না। এসবে ওরা অভ্যস্ত।

অনেকক্ষণ হলো রানা ক্যাপ্টেন টম হবসের ছদ্মবেশ পরে সৈকতের দিকে তাকিয়ে আছে, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে মার্ভেলের ব্রিজের রেইলিঙে। ওর দু'হাতে লেগে আছে নকল মরচে। সূর্যের বিরাট গোলকটা কমলা রঙা হয়ে নীচে নামছে। খান ইয়ার্ডের অনেক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়, সূর্য তার ওপাশে নেমে যাচ্ছে। বাতাসে ভাসছে পোড়া বাঙ্কার ফিউল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্টস ও ঝলসে যাওয়া ধাতুর কটু গন্ধ। রানা সুমাত্রা আসবার সময় কুমারী বনাঞ্চল ও সাদা সৈকত দেখেছে, এখনও ওখানে মানুষের কলঙ্কিত হাত পৌঁছয়নি। কিন্তু ইয়ার্ডে এসে মনে হচ্ছে দ্রুত এই ক্যান্সার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। সৈকত ভরে আছে হাজারো জিনিসে। সাগরের দিকটা সাবান-গোলা বিশ্রী রং ধরেছে। উপসাগরের মুখে একটা বিরাট ওয়্যারহাউজ, ওটা বাদ দিলে তিন দিকের বিল্ডিংগুলো অতি পুরোনো লাগছে। ওগুলোর গায়ে লেপ্টে আছে কালো ধুলো। রানা আগে কখনও এত কাছ থেকে কোনও ব্রেকার্স ইয়ার্ড দেখেনি।
একের পর এক বিল্ডিং, ক্রেন, কনস্ট্রাকশান ইকুইপমেন্ট—এসবের যেন শেষ নেই। ওখানে সব মিলে বিরাট হুলুস্থুল চলছে। হাজারো লোক কাজ করছে ডেরিকগুলো সৈকত থেকে স্টিলের স্ল্যাব তুলছে, দূরে নিয়ে গিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় নামিয়ে দিচ্ছে। ওখানে একদল শ্রমিক ইলেকট্রিক টর্চ ও হাতুড়ি নিয়ে কাজ করছে। সবাই মিলে ব্যস্ত হয়ে জাহাজের ধাতব টুকরো ভাঙছে। সিকি মাইল দূরে মার্ভেলকে রেখেছে রানা, ওখান থেকে সৈকতের দিকে তাকালে মনে হয় একদল কর্মঠ পিঁপড়ে বিরাট কোনও মরা গুবরে পোকা পেয়েছে, টানাটানি করে লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

মার্ভেলের চারপাশে অন্তত পঞ্চাশটা জাহাজ ভাসছে। যেদিকে তাকানো যায়, একটার পর একটা জাহাজ। কন্টেইনার শিপ, অয়েলার, ফ্রেইটার—কী নেই! সব জং ধরা, পরিত্যক্ত হয়েছে। একে একে ভেঙে ফেলা হবে। স্ল্যাবগুলো যাবে স্টিলের প্ল্যান্টে।

ব্রিজে ঢুকে গগল বলল, 'ওগুলোর তুলনায় মার্ভেলকে ব্র্যাণ্ডনিউ লাগছে।' ওর সঙ্গে সোহেলও আছে। দু'জন রানার পাশে এসে দাঁড়াল।

চকচকে ওয়্যারহাউজের ভিতর থেকে ভয়ঙ্কর আওয়াজ বেরিয়ে কানে তালা লাগিয়ে দিল। কী যেন বলল রানা, কিন্তু ওর কণ্ঠ হারিয়ে গেল প্রচণ্ড আওয়াজে।

'কী বললে?' আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার পর জানতে চাইল গগল।

'জাহাজের করাত।'

'হ্যাঁ, ওয়্যারহাউজের ভেতরে ওই জিনিস আছে,' বলল গগল। 'পত্রিকায় পড়েছি চেইনের মত করাত তৈরি হয়েছে, খুব সহজেই জাহাজ কেটে ফেলে।'

চার্ট টেবিলের ওপাশের দেয়ালে ঝুলছে বিনকিউলার, ওটা নামিয়ে আড়াল নিল সোহেল, চোখে লাগাল। কয়েক মিনিট পর ওয়্যারহাউজের পিছন দিকের দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল ছোট একটা লোকোমোটিভ। সঙ্গে নিয়ে এসেছে ইস্পাতের বিশ ফুটি একটা টুকরো। মনে হলো অংশটা তরমুজের মত করে কেটেছে। ওটা ছিল কোনও জাহাজের বো। রেল লাইনের শেষ মাথায় চলে গেল লোকোমোটিভ, থামল। একটা মোবাইল ক্রেন তরমুজের টুকরো তুলে নিল। মনে হলো, যে জাহাজটা কাটা হচ্ছে, সেটা কোনও ফ্রেইটার না, বাল্ক ক্যারিয়ার বা ট্যাঙ্কার।

ক্রেন ইস্পাতের অংশটা নিয়ে আরেক জায়গায় নামিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা কাজে নেমে পড়ল।

সোহেলের হাত থেকে বিনকিউলার নিল রানা, ওয়্যারহাউজটা দেখল। 'ওখানে রাতে ঢুকব।'

'তার আগেই দ্য চুহা চলে আসবে,' বলল সোহেল।

'সন্ধ্যার আগেই,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'আসুক, আমরা জানি ওটার ভিতরে জাহাজ থাকবে।'

'তোমার বন্ধুর জাহাজও হতে পারে,' বলল গগল।

'সোহেল আর আমি আগে যাব ওয়্যারহাউজে।'

'শুধু তোমরা দু'জন? উচিত হবে?'

গগলের হাতে বিনকিউলার ধরিয়ে দিল রানা। 'দেখো, ওয়্যারহাউজের মুখে তাকাও। ওখানে অনেকখানি বেড়ে আছে। ওসব জায়গায় পাইলিং করেছে। দু'পাশের দেয়াল সাগরের মেঝে পর্যন্ত নামার কথা না। নামলেও, ওটার গেট সাগরতল পর্যন্ত নামবে না। পুরো দরজা থাকলে ড্র্যাগ অনেক বেশি হতো, পাল্লা খোলা-আটকানো অসম্ভব হয়ে উঠত।'

ওয়্যারহাউজের গেট দেখল গগল। 'ওই দরজার তলা দিয়ে ঢুকবে?'

'হ্যাঁ। চারপাশ দেখে আসব। জানতে চাই জাহাজটা কাদের। ঘুরে আসতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। বেশিরভাগ সময় যাবে যাওয়া-আসাতেই।'

বিশাল ছাউনিটা দেখছে গগল, আবারও গেট দেখল, তারপর বলল, 'সঙ্গে ড্রেইগার রিব্রিদার নিয়ো।' তীক্ষ্ণ হুইসল শুনতে পেল ওরা। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল, আজকের মত শ্রমিকদের ছুটি, কাজ শেষ। আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার পর গগল বলল, 'রিব্রিদার থাকলে বুদ্বুদ উঠবে না, চুপচাপ ঘুরে আসতে পারবে।'

রাত একটায় বোট গ্যারাজে চলে এল রানা ও সোহেল। পোশাক পাল্টে ওয়েট স্যুট পরে নিল ওরা। ওরা শীতের কারণে স্যুট পরেনি, খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের আশপাশের সাগর কবোষ্ণ—কালো রঙের মাইক্রোপ্রেনের কারণে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা যাবে। পুরু সোলওয়ালা ডাইভ বুট পরেছে ওরা, ফিনজোড়াও লাগিয়ে নিল। ওদের পিঠে ড্রেইগার ইউনিট ঝুলিয়ে দিল ডাইভ টেকনিশিয়ান। ড্রেইগার ইউনিট ব্যবহার করলে সাগরের উপর বুদ্বুদ উঠে আসে না, একই বাতাস ফিল্টার করে কার্বন ডাই অক্সাইড সরিয়ে রিসাইকেল করা হয়।

ড্রেইগার ইউনিট ব্যবহার করলে তিরিশ ফুটের বেশি গভীরে যাওয়া উচিত নয়। রানা ও সোহেল অবশ্য ঠিক করেছে বেশি নীচে নামবে না। ওদের সঙ্গে আছে একটা করে ওয়াটার-প্রুফ পাউচ ও ফ্ল্যাশলাইট। সোহেল নিয়েছে সদ্য আবিষ্কৃত একটা ফেব্রিক ন্যাশনাল ফাইভ-সেভেনএন ডাবল অ্যাকশান অটোমেটিক। ওটার অ্যামো ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এমএম। ক্লিপে রাখা যায় বিশটা বুলেট, চেম্বারে একটা। সূচালো-মাথার বুলেটগুলো বহু দূর পর্যন্ত সরল রেখায় ছুটতে পারে।

ডান ঊরুতে একটা করে খাপে পোরা ডাইভ-নাইফ বেঁধে নিয়েছে ওরা। রানা বাম কব্জিতে বেঁধেছে ডাইভ কম্পিউটার। ডান বাহুতে বাঁধা একটা পাউচে পিস্তল ও ফ্ল্যাশলাইটের সঙ্গে রয়েছে মিনি কম্পিউটার।

ডাইভ টেকনিশিয়ান ওদের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখছে।

গ্যারাজে ঢুকল উর্বশী, দ্রুত পায়ে এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। 'আমি ডক্টর ফারাকে পানির স্যাম্পল দিয়েছিলাম, ও অ্যানালাইয করেছে।' শ্রাগ করল। 'ও বলেছে উনিশশো ষাটে কুয়াহোগা নদীর পানি যেমন ছিল, সাগর এখানে তার চেয়েও বিষাক্ত। ভুলেও পানি গিলতে যেয়ো না, মারা পড়বে।'

'এর চেয়ে ভাল কোনও খবর নেই?' বলল রানা। গম্ভীর। হাতের ইশারায় টেকনিশিয়ানকে গ্যারাজের ব্যাটল ল্যাম্প নিভিয়ে দিতে বলল।

'গগল হেলম-এ আছেন,' বলল উর্বশী। 'মিস্টার চ্যাটার্জি উইপন্স স্টেশনে আছেন। তোমরা ওয়্যারহাউজের অর্ধেক পথে যেতে না যেতে তৈরি হয়ে যাব আমি আমার কমাণ্ডোদের নিয়ে। দরকার পড়লে আমরা জোডিয়াক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে পারব। খবরগুলো ভাল বলে মনে হচ্ছে?'

'মন্দ নয়। দেখা যাক আমরা গোলমাল না করে ফিরতে পারি কি না।'

গ্যারাজের দরজা খুলে গেল। দু'বন্ধু র‍্যাম্প বেয়ে দরজার কাছে চলে গেল, ফিন পরে নিয়ে নিঃশব্দে সাগরে নেমে পড়ল। ডুবে যাওয়ায় একগাদা ওজন হালকা হয়ে গেল। ওরা ট্রেইণ্ড কমাণ্ডো, একটু আগেও ওদের মনে হাজারো চিন্তা ছিল, কিন্তু এখন সব দূর হয়ে গেছে। এমন কী ফু-চুঙের কথাও মনে নেই। ওরা

জানে, ওদের কাজ এখন গন্তব্যে পৌছুনো।

বয়্যান্সি অ্যাডজাস্ট করল ওরা, দশ ফুট গভীরে নেমে গেল। ডাইভ কম্পিউটারে ইনটিগ্রেটেড কমপাস দেখল রানা, হাতের ইশারা করল সোহেলকে, তারপর দু'হাত কোমরের পাশে রেখে রওনা হয়ে গেল। অনুসরণ করল সোহেল। ওরা কালি-গোলা পানির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। নিয়মিত শ্বাস নিচ্ছে, যন্ত্রের মত পা চলছে। একমিনিট পর টের পেল মার্ভেল এখন আর বামপাশে নেই। ওরা বো পিছনে ফেলে এসেছে।

ড্রেইগারের মাউথপিস বড়সড়, তারপরেও মুখে বিশ্রী স্বাদ পেল। মনে হলো জিভে কোনও পুরনো সিকি আটকে গেছে। সাগর এখানে নোংরা। স্পর্শ করে টের পেল স্যুট তেলতেলে হয়ে গেছে। দু'জনের মনে একই চিন্তা এল, মুদাস্‌স্‌র আলী খান চারপাশের পরিবেশ নষ্ট করছে।

ধরা পড়বার ভয়ে ওরা টর্চ জ্বালছে না। ইন্দ্রিয় কাজে লাগিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, একটানা সাঁতার কাটছে। ভাটা চলছে। সাগর ওদের টেনে নিতে চাইছে। আরও কিছুক্ষণ পর হুশ্‌হুশ্ আওয়াজ শুনতে পেল। প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউজের গেটের কাছে চলে এসেছে ওরা, ওটার তলা দিয়ে স্রোত ঢুকছে। ঢেউ ওদের একপাশে সরিয়ে নিতে চাইল। বাধ্য হয়ে একটু দিক বদলাল। হাত বাড়িয়ে রাখল। আধ মিনিট পর কর্কশ কংক্রিট পেল রানা। ও দাঁড়িয়ে যাওয়ায় থামল সোহেল, কংক্রিট স্পর্শ করে দেখল। যেসব কলাম বিশাল এই ওয়্যারহাউজ ধরে রেখেছে, সেগুলোর একটা। ঘুরল রানা, ছাউনির দিকে পিঠ দিয়ে থামল। সামনে পানি একদম কুচকুচে কালো। বেশ দূরে সৈকতে অনেক বাতি আছে। বিল্ডিঙের সাগরের দিকটা একদম অন্ধকার। কোথাও কোনও আলো নেই। সোহেলকে ইশারা করে ডাইভ লাইট জ্বালল রানা। লালচে মৃদু আলোয় নিজেদের গন্তব্য ঠিক করে নিল।

টর্চ নিভিয়ে দিল রানা, দু'জন আস্তে করে ভেসে উঠল। খানিকটা দূরে দরজাটা দেখতে পেল—ওটা উচ্চতায় ওয়্যারহাউজের সমান, সাগর সমতল থেকে আশি ফুট উঁচু। বিল্ডিং চওড়ায় প্রায় দুশো ফুট, ওই দরজাও প্রশস্তে প্রায় সমানই। সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপ, কন্টেইনার শিপ বা ট্যাঙ্কার ছাড়া আর সবই ওই ওয়্যারহাউজে ঢুকবে।

মাউথপিস খুলে বলল রানা, 'এবার ঢুকব, চল্।'

ডুব দিল ওরা, এগিয়ে ফটকের সঙ্গে মিশে গেল, তারপর আরও নামতে শুরু করল। মাত্র পাঁচ ফুট নামবার পর গেটের তলা পেয়ে গেল ওরা, এপাশে চলে এসে আস্তে করে ভেসে উঠল। ছাউনিটা বিশাল কোনও হ্যাঙারের মত। রেগুলেটর খুলে ফেলল দু'জন, ডাইভ মাস্ক তুলে দিল কপালের উপরে। দম নিয়ে নাক কুঁচকে ফেলল ওরা, হ্যাঙারের বদ্ধ বাতাসে পোড়া ধাতুর গন্ধ, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

কয়েক সেকেণ্ড ওদের মনে হলো ওয়্যারহাউজ পুরোপুরি অন্ধকার, চাঁদহীন আকাশের মত, তারপর বুঝতে পারল ওরা আছে একটা ক্যাটওয়াকের নীচে। তলা থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে দেখল, ওয়্যারহাউজের ছাদে কয়েকটা বালব

জ্বলছে। ওগুলো এতই উঁচুতে যে জোর আলো আসছে না। চারপাশ ঘন ছায়ায় ডুবে আছে। স্বল্প আলোয় একটা জাহাজের আকৃতি দেখতে পেল। জাহাজের পাশে চলে গেল ওরা, আরও সামনে এগোল। সাগর-সৈকতের ওপাশে যে জাহাজগুলো ভাসছে, জং ওগুলোকে ভাল ভাবে ধরেছে, কিন্তু এটাকে নয়। হাল স্পর্শ করে দেখল, এই জাহাজটা পরিত্যক্ত হওয়ার মত নয়। পুরোনো তো নয়ই, বরং প্রায় নতুন একটা জাহাজ। সামান্য শেওলাও নেই। শরীরে চকচকে কালো রং। রংটা গাঢ় নীলও হতে পারে।

ওয়্যারহাউজের এপাশে একটা ধাতব সিঁড়ি উঠে গেছে অনেক উপরে। কিছুটা উঠলেই একটা ওয়াকওয়ে। ওটা প্রায় পুরো বিল্ডিং ঘিরে আছে। কয়েক ধাপে উঠে গেছে একেবারে ছাদের কাছে। গিয়ারগুলো খুলে ফেলল ওরা, ওগুলো পানির নীচে বেঁধে রাখল। পাউচ থেকে বের করে নিল সাইলেন্স্‌ড্‌ পিস্তল। সঙ্গে শোল্ডার-হোলস্টার এনেছে ওরা, তবে ওখানে পিস্তল রাখল না। রানা চেক করে দেখল ওর মিনি কম্পিউটার, ওটা ঠিক মত কাজ করছে।

সিঁড়িতে পা রাখল রানা, পিস্তল হাতে উঠতে শুরু করে বলল, 'আমি আগে যাচ্ছি, কাভার দে।'

ওয়াকওয়েতে উঠে অপেক্ষা করল ও, সোহেল উঠে আসতেই এগোল। প্রতি পা মেপে ফেলছে ওরা, পায়ের পুরো ওজন ফেলবার আগে দেখে নিচ্ছে, যেন পড়ে না যায়। আপাতত জানবার পথ নেই মুদাস্‌সর আলী কোনও প্রহরী রেখেছে কি না। বদ্ধ ধাতব হ্যাঙার। পায়ের সামান্য আওয়াজ অনেক জোরে প্রতিধ্বনিত হবে। সাবধানে এগোচ্ছে ওরা।

কিছুটা দূরে একটা সরু পাত দেখতে পেল, চওড়ায় দু ফুটের বেশি হবে না। ওটা নেমে গেছে জাহাজের ডেকে। ওরা আছে এখন আবছায়ায়। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, কান পাতল। প্রহরীদের কথাবার্তা, বা কাশির আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করল। দু'মিনিট পেরিয়ে গেল, আছে শুধু হিসহিস একটা আওয়াজ। বারবার স্রোত আসছে, ফিরছে। বড় ঢেউ এলে আওয়াজ বাড়ছে, তারপর মিলিয়ে যাচ্ছে। কারও গলার আওয়াজ নেই।

পাত ধরে এগোল রানা, নেমে এল জাহাজের ডেকে, গিয়ে থামল ক্যাপস্টানের আড়ালে। চারপাশ কাভার করল ও। পঁচিশ সেকেণ্ড পর সোহেল ওর পাশে চলে এল। ডেকে দু'আঙুল ছোঁয়াল রানা, ঘষল। ধাতব ডেক, নতুন রং করা হয়েছে। খসখসে অনুভূতি নেই। জাহাজ পুরো না দেখেও বোঝা যায়, এটা একটা মাঝারি ট্যাঙ্কার। এগুলোকে বলা হয় প্রোডাক্ট ট্যাঙ্কার। এরা শুধু রিফাইণ্ড জিনিস বহন করে, ক্রুড অয়েল নয়। কেরোসিন বা গ্যাসোলিনের মত জিনিস পৌঁছে দেয়। করাতের হামলায় ট্যাঙ্কারের প্রথম ষাট ফুট গায়েব হয়ে গেছে। জাহাজটা লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে বানানো হয়েছে, কিন্তু মুদাস্‌সর আলী খান এক বেলাতেই ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

ওরা আছে অ্যাফটে। হাতের ইশারা করল রানা, কুঁজো হয়ে ছুটল সুপারস্ট্রাকচারের দিকে। সোহেলের চারপাশ দেখা হয়ে গেছে, বন্ধুকে কাভার দিল ও। যে-কোনও সময় বিপদ আসতে পারে, কাজেই সাবধান হয়ে আছে।

রানা সুপারস্ট্রাকচারে পৌঁছে যাওয়ার পর উল্টো কাভার দিল। সোহেল হালকা দৌড়ে ওর কাছাকাছি চলে গেল।

স্টার্নে বসে আছে চারতলা অ্যাকোমোডেশন ব্লক। শ্রমিকরা ওখানে কাজ শুরু করেছে—ওয়্যারহাউজে ঢোকানোর আগে লম্বা ফানেল, ব্রিজ ইত্যাদি করাত দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। এক পাশে একটা হ্যাচ, ওটার পাশে চলে গেল রানা। ভিতরে ঢুকল, টর্চ জ্বালল। ডেক লিনোলিয়াম, দু'পাশের দেয়াল দামি প্যানেল দেওয়া। দেয়ালে বামহাত রেখে সামনে এগোল রানা, পিছনে সোহেলের বুটের খসখস আওয়াজ পেল। জাহাজের নাম, রেজিস্ট্রেশন বা অন্যান্য তথ্য কোম্পানির প্লেকে নেই, বদলে পাওয়া গেল স্ক্রু-র চারটে গর্ত। জাহাজের নাম সরিয়ে ফেলেছে কেউ।

সামনেই সিঁড়ি, রানাকে কাভার দিল সোহেল। রানা বারো ফুট উপরে উঠবার পর অনুসরণ করল সোহেল। পাঁচ মিনিট পর ভাঙা ব্রিজে ঢুকল রানা, টর্চ নিভিয়ে দিল। এক মিনিট পর ঢুকল সোহেল। চারপাশ দেখে এসেছে, বাইরে কেউ নেই। ব্রিজে ইলেট্রনিক্স-এর কোনও ম্লান আলো নেই, ওগুলো উপড়ে নেওয়া হয়েছে। রেডিয়ো, ওয়েদার কম্পিউটার, ন্যাভিগেশন এইড—সব উধাও হয়েছে। র‍্যাকগুলো পুরোপুরি খালি, কিছুই নেই। যে-ই হোক, কাজে কোনও খুঁত রাখেনি। ছেঁড়া তারও নেই। মনে হলো এখানে তাড়াহুড়ো করেনি কেউ।

চারপাশে জাহাজের নাম থাকবে, এমন কিছু নেই। সুপারস্ট্রাকচার খুঁজে দেখল ওরা। গ্যালিতে যা কিছু আছে, সব স্টেইনলেস স্টিল। রিফ্রিজারেটর থেকে শুরু করে হাঁড়ি-প্লেট-চামচ-চুলো সব ঘাঁটল ওরা—কোথাও জাহাজের নাম নেই। কোথাও মালিকের করপোরেট লোগো নেই। সাবধানে সরিয়ে ফেলা হয়েছে সব। প্রতিটা কেবিনে ঢুকল ওরা, কোনও আসবাবপত্র পেল না। তবে বোঝা গেল, ওখানে কয়েকদিন আগেও আসবাবপত্র ছিল। এক কেবিনে সিগারেটের গন্ধ পেল, আরেকটায় আফটার শেভের সুবাস।

মেইন ডেক পার হয়ে আরও নীচে নামল ওরা, চলে এল ইঞ্জিন রুমে।

এখানে বিরাট দুটো ডিজেল ইঞ্জিন অনেক জায়গা নিয়েছে, দেখতে একেকটা আস্ত পাবলিক বাস। ওগুলোর ডাক্ট-এ ঢুকেছে হাজারো তার। দু'জন ইঞ্জিন দুটো ঘুরে দেখল, কোনও আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ নেই। সিরিজ নাম্বার যেখানে ছিল সেখানে কেউ গ্রাইণ্ডিং হুইল চালিয়েছে, সব মিশিয়ে দিয়েছে। ওসব জায়গায় ধাতু রুপালী হয়ে চকচক করছে।

ওয়ালথার হোলস্টারে পুরল রানা, 'তুই গার্ডে থাক্, আমি দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।'

ইঞ্জিন রুমের দরজার আড়ালে থাকল সোহেল, হাতে পিস্তল।

ঘরটা বড়সড় গুহার মত, ছোট্ট টর্চ দিয়ে পুরোটা খুঁজে দেখা প্রায় অসম্ভব—রানা ঠিক করেছে ইঞ্জিন থেকে শুরু করবে। চারপাশ অন্ধকারে ডুবে আছে। বামপাশের ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়াল ও, তারপর একটা ফ্রেশওয়াটার কণ্ডেনসারের নীচে ঢুকল। এক মিনিট পর হতাশ হলো। আগেই কেউ ম্যানুফ্যাকচারের সিল উঠিয়ে রেখেছে। প্রত্যেক কোণ খুঁজে দেখল ও, কোথাও

কোম্পানির নাম পাওয়া গেল না।

মুদাস্‌সির আলী খানের লোকজন জানে কী করতে হয়, কাজে ভুল রাখেনি তারা। স্টার-বোর্ড ইঞ্জিনের তলায় ঢুকল রানা, কালি মেখে ভূত হয়ে গেল। নীচে উপচে পড়েছে তেল। এক কোণে বেশি পড়েছে। জায়গাটা এমন কোণে যে ওখানে ঢোকা খুব কঠিন। রানার মন চাইল না ওই ঘুপচিতে ঢুকতে। তবে ওর যখন ওখানে যেতে মন চাইছে না, তা হলে খানের লোকও হয়তো যায়নি ওখানে।

হাঁচড়ে এগোল রানা, মাথার উপর থম মেরে বসে আছে ঠাণ্ডা ইঞ্জিন। মাউন্টগুলো বাধা দিচ্ছে। পিছলে আগে বাড়ল ও, বাম হাতে টর্চ রেখেছে, আলো ফেলল। ওর ডান মুঠো জোরে ঘসা লাগল একটা কণ্ডিউটে, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে গাঁট রক্তাক্ত হয়ে গেল। এক সেকেণ্ড থেমে আবারও এগোল রানা, ঘুপচির মধ্যে গিয়ে থামল। জায়গাটা তেল-ধুলো ভরা। সামনে চওড়া মাউন্ট। দু'ফুট জায়গায় তেল-মবিল বেশি পড়েছে। ডান হাতে ওগুলো সরাল। কয়েক সেকেণ্ড পর হাতে ধাতব প্লেটের ঘসা লাগল। খানের লোক ভুলে এটা সরায়নি!

তিন মিনিট ধরে প্লেট পরিষ্কার করল রানা, সরিয়ে ফেলল সব গ্রিজ। টর্চ তাক করে দেখল ট্যাগে লেখা: মিটসুবিশি হেভি ইণ্ডাস্ট্রিজ। পনেরো ডিজিট আইডি নাম্বার জ্বলজ্বল করছে। সংখ্যাগুলো মুখস্থ করল রানা, পিছলে পিছিয়ে এল, দু'মিনিট কসরৎ করে ইঞ্জিনের তলা থেকে বেরিয়ে এল। বাঁ হাতে মিনি কম্পিউটার খুলে অন করল। আধ মিনিট পর নাম্বারটা ক্রস-রেফারেন্স করল।

নাকিমুচি প্রচুর তথ্য পাঠিয়েছে, জাপান সাগরে ওর যে ক'টা জাহাজ হারিয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সবই জানিয়েছে। ক্রুদের ডোশিয়ে আছে; ছবি আছে, রয়েছে জরুরি কম্পোনেন্টের সিরিয়াল নাম্বার। স্টাইলাস দিয়ে পনেরো ডিজিট লিখল রানা, ইঞ্জিনের জন্য আইকন দেখানো জায়গাটা বাছাই করল, সার্চ বাটন দাবাল। চার সেকেণ্ড পর জাহাজের নামটা দেখা গেল।

'নাকিমুচির জাহাজ,' বিড়বিড় করল রানা। 'একটা পাওয়া গেল।' হঠাৎ ঝটকা-ঝটকির আওয়াজ শুনতে পেল। ঠন-ঠনাৎ করে একটা পিস্তল মেঝেতে পড়ল। হোলস্টার ছেড়ে বেরিয়ে এল রানার ওয়ালথার।

'আপনি কে?' সোহেলের বিস্মিত কণ্ঠ শুনতে পেল।

'আর আপনি কে?' কড়া স্বরে বলল মেয়েটা। 'আপনি আমার পিঠে খোঁচা দিচ্ছেন! কব্জিতে ব্যথা দিয়েছেন!'

সোহেলের লাথি খেয়ে পিস্তলটা রানার দিকে এগিয়ে এল।

'কব্জি ভেঙে দিইনি সেটাই বেশি,' বলল সোহেল। 'রানা, এগিয়ে আয়। ওর পিস্তলটা তুলে নে।'

দশ সেকেণ্ড আগে কেউ দরজা পার হয়েছে, সরাসরি টর্চ মেরেছে রানার মুখে। সোহেল নিরাপদ। কোনও মেয়েকে বন্দি করেছে। কে সে? নিঃশব্দে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল রানা, জানে বন্দিনীর পিস্তল কোথায় থেমেছে। পাঁচ সেকেণ্ড পর থামল, ওটা তুলে নিল। মেয়েটার মুখে টর্চ তাক করে চমকে গেল। একবার ওদিকের দরজা দেখল, তারপর টর্চ নিভিয়ে দিল।

'এহ্‌হে, ওরা আসছে!' বলল মেয়েটা, তার টর্চ এখনও জ্বলছে। রানার মুখে

আলো পড়ল।
ইঞ্জিন রুমে আরও দুটো দরজা আছে, ওগুলোর একটায় ম্লান বাতি। টর্চের আলো! ওই দলে কয়েকজন আছে। পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে।
তাদের একজন কর্কশ স্বরে বলল, 'আয়া। হামনে দেখা। চালিয়ে দেখাতে হ্যাঁয়!'

পাঁচ

ঘড়িতে দেখেছে ফু-চুং, প্লেন ছয় ঘণ্টা পর ল্যাণ্ড করেছে। তারপর একটা শিপিং কণ্টেইনারে তুলেছে ওদের। স্টিলের বাক্সে আবারও বন্দি হয়েছে ওরা। বদ্ধ জায়গায় অপেক্ষা করেছে। একটা ট্রাক ওদের নিয়ে গেছে কোনও বন্দরে, জাহাজে তুলেছে কণ্টেইনার। ওরা দশ ঘণ্টার বেশি দাঁড়িয়ে আছে। জানে না কোথায় চলেছে। তবে আবহাওয়া এখন অনেক শীতল হয়ে গেছে। প্লেন ওদের ঘণ্টায় অন্তত পাঁচশো মাইল বেগে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এই জায়গাটা বোধহয় উত্তর মোঙ্গলিয়া বা দক্ষিণ সাইবেরিয়া। সম্ভবত সীমান্ত এলাকা। এদিকে এমন কোনও বড় লেক নেই যেটা জাহাজ দিয়ে পার হতে হবে। ফু-চুং আন্দাজ করছে, ওরা আছে কামচাটকা পেনিনসুলা বা ওখোটস্ক সাগরে।
হঠাৎ কণ্টেইনারটা খুব জোরে নামানো হলো। ছিটকে পড়ল ওরা, কষ্টেসৃষ্টে আবারও উঠে দাঁড়াল। ফু-চুং কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, কণ্টেইনারের দরজা খুলছে। দরজা খুলে গেল। এবার ও আস্ত নরক দেখতে পেল।
অন্ধকারে দূরে উঁচু পর্বত দেখা গেল। শৃঙ্গগুলো যেন কয়লার কালো সূক্ষ্ম কণা দিয়ে ঢাকা। সব ঝাপসা লাগল। দুর্বল লাগছে ওর, বারকয়েক চোখ পিটপিট করে আবারও পর্বতের দিকে তাকাল। ওদিকটা ভালভাবে দেখা যায় না। সৈকতের দিকে ফিরল। চারপাশে পড়ে আছে নুড়ি-পাথর। ওগুলো থেকে শুরু করে ক্রিকেট বল আকৃতির পাথরও আছে। একটার পর একটা ঢেউ সৈকতে ফিরে আসছে, ক্ষুদ্র পাথরগুলো নিয়ে টুশ-টাশ আওয়াজ তুলে খেলছে। সৈকতের ওপাশে শান্ত সাগর, যতদূরে দেখা যায় সব কালো। ঝড় আসবার আগে সাধারণত সাগর এরকম শান্ত থাকে।
সৈকতের পর উঠে গেছে টিলা, সেদিকে তাকাল ফু-চুং, মানুষের অমানবিক কষ্ট দেখে চমকে গেল, শিউরে উঠল। ওদিকে হাজারো মানুষ কাদার মধ্যে ব্যস্ত। কারও পরনে লুঙ্গি, কারও ধুতি, কারও সারং। অনেকের আবার কিছু আছে কি না বোঝা গেল না। নানান দেশের অসংখ্য মানুষ টিলার গায়ে পিলপিল করছে, বেশিরভাগই এশিয়ান। ওরা খাটতে খাটতে শেষ হয়ে যাওয়া মানুষ। প্রাণ আছে, কাজেই তাদের খাটতে হবে। টলতে টলতে কাজ করে চলেছে।
এদিকের ঢালে আছে খেতে না পাওয়া অন্তত দু'হাজার মানুষ। সশস্ত্র প্রহরীরা তাদের পাহারা দিচ্ছে।

একদল মানুষ একসারিতে টিলার উপরে উঠছে, হাতে এখন খালি বাকেট। আরেকদল মাথায় তুলে বাকেট নিয়ে নেমে আসছে, ভিতরের জিনিস পৌঁছে দেবে নীচে। টিলার চুড়ো থেকে দুশো ফুট নীচে কাজে ব্যস্ত একদল, তারা কোদাল দিয়ে কাদা তুলছে, বাকেট ভরছে। সবাই যেন যন্ত্র, একই কাজ বারবার করছে, একটানা। মাটি খুঁড়ে তুলছে, খালি বাকেট ভরে দিচ্ছে, আরেক দল ওগুলো মাথায় নিয়ে নেমে আসছে। টিলার আরও উপরে অন্য এক দল ওয়াটার ক্যানন নিয়ে ব্যস্ত। অনেক উপরের গ্লেশিয়ার থেকে নেমে আসছে পানি, একটা পুকুর কেটে ধরা হয়েছে ওই পানি, সেখান থেকে নেমে এসেছে অসংখ্য মোটা হোস পাইপ। মাধ্যাকর্ষণের কারণে দ্রুত নামছে পানি, ক্যাননের মুখ দিয়ে বিস্ফোরণের মত বেরুচ্ছে। এসব ক্যাননের চালকরা উপরের ঢালে পানি ছুঁড়ছে। পানির তীব্র স্রোত মাটি সরিয়ে নামিয়ে আনছে।

বাড়তি পানি টিলা বেয়ে নামছে, চারপাশের মাটি ভিজে উঠছে। ওখানে সাবধান না হলে পা পিছলে পড়তে হবে। কয়েক সেকেণ্ড বোকার মত চারপাশ দেখল ফু-চুং, বিশ্বাস করতে পারল না কী ঘটছে। তারপর হঠাৎ দেখতে পেল ঢাল বেয়ে নেমে আসছে তুমুল পানি ও কাদা! উপরের টিলায় যারা আগেই সাবধান হয়নি, তারা ওয়াটার ক্যাননের তীব্র স্রোতে ভেসে গেল—ডিগবাজি খেয়ে টিলা থেকে নীচে পড়তে লাগল। অনেকে দ্রুত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, অনেকে উঠল ধীরে ধীরে। শেষ পর্যন্ত শুধু একজন আর উঠল না। কাদার তলায় চাপা পড়েছে সে।

সেদিকে কেউ তাকাল না, সবাই অনেক আগেই এসব মেনে নিয়েছে।

শ্রমিকরা একরের পর একর জুড়ে কাজ করছে, মাথার উপরে ক্যামোফ্লেজ নেটিং। ওগুলো ধূসর, কালো, বাদামি—দেখতে ঠিক চারপাশের জমির মতই। আকাশ থেকে শ্রমিকদের দেখা যাবে না। স্রষ্টাই জানেন, এখানে কী ঘটছে গোপনে!

সৈকতের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ফু-চুং, দলের সবার মত বোকা হয়ে কাণ্ড দেখছে। শ্রমিকদের চোখে তাড়া খাওয়া দৃষ্টি, বাকেট নিয়ে আসছে তারা, মেকানিকাল স্লুইস বক্সে কাদা ঢালছে। এসব যন্ত্রপাতি একশো বছর আগে আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু এখনও একই কাজে লাগে। লম্বা একটা যান্ত্রিক টেবিলে কাদা নামিয়ে দেয়া হচ্ছে, মৃদু মৃদু ঝাঁকি খেয়ে কাদা সামনে বাড়ছে। ট্রেওফের তলায় আছে ব্যাফল্স্, সেটা ভারী ধাতু আটকে রাখছে, ধুয়ে সরিয়ে দিচ্ছে কাদা। ওগুলো বাক্সের শেষ মাথায় পৌঁছে সোজা সাগরে গিয়ে পড়ছে। কাদা ওদিকের স্রোতে গিয়ে মিশছে, সাগর ওদিকটায় বাদামি হয়ে উঠেছে তার ফলে। ব্যাফল্স্ কাজ করছে, ধাতু জমিয়ে পরে তুলে নেবে। ওগুলো আরও ভালভাবে শোধন করা হবে।

একদল লোক যান্ত্রিক টেবিল থেকে শুরু করে সৈকতের কাছের এক বিল্ডিং পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে, তারা হাত বদলে বাকেট পৌঁছে দিচ্ছে। সাগর ও সৈকতের শেষপ্রান্তে আছে একটা সমতল বার্জ, জিনিসটা সাধারণত সাগরে কাজে লাগানো হয়। ফু-চুং ধারণা করল, ওখানে আছে প্রসেসিং প্ল্যান্ট। ইচ্ছে করলে বার্জটা

সাইট থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়। ওটার একপাশের দেয়ালে একটা মোটা চিমনি, ওখান থেকে সাদা ধোঁয়া উড়ছে। যে জিনিস শোধন করা হয়, সেটার জন্য তাপ লাগে।

প্রহরীরা চারপাশ থেকে সবাইকে ঘিরে রেখেছে। প্রহরীদের পরনে উলের পুরু প্যান্ট ও জ্যাকেট। পায়ে হাঁটু সমান বুট। কাদায় হাঁটবার জন্য মোটা রাবার দিয়ে তৈরি সোল। সবার হাতে গ্লাভ্‌, কাঁধে ঝুলছে একে-ফোরটিসেভেন। বামহাতে মুগুর বা খাটো চাবুক। টিলার উপরে প্রহরী কম, বেশিরভাগ দায়িত্ব পালন করছে মাইনিং প্রসেসিঙের আশপাশে। চারজন করে প্রহরী প্রতি বারোটা স্লুইস বক্সে চোখ রাখছে। বাকেটওয়ালা দশজন শ্রমিকের জন্য একজন করে প্রহরী। চাবুকগুলো কিলবিল করছে, মাঝে মাঝে শ্রমিকদের পিঠে পড়ছে। তাদের ফাঁকি দেওয়ার পথ নেই।

মাইন প্রসেসিং বিল্ডিং ঘিরে রেখেছে কাঁটাতার দিয়ে। ওটার কাছে থেমে আছে একটা ট্র্যাকওয়ালা বাহন, দেখে মনে হলো ওটা আর্কটিক স্নো ক্যাট। আরও ওপাশে আছে একটা ক্রুজ শিপ। একসময় ওটা সাগরগামী জাহাজ ছিল, কিন্তু এখন ডেবে গেছে সৈকতে।

শ্রমিকদের আটকে রাখা কাঁটাতারের এপাশের সৈকতে আছে আরও কিছু জাহাজ। ওগুলো ছোট ক্রুজ শিপ, এখন সৈকতে গেঁথে গেছে। দেখলে অবাক হতে হয় ওগুলো কী করে সাগর পেরিয়ে এসেছে! ওগুলোর চারপাশে প্রচুর পাথর দিয়ে দেয়াল তৈরি করা হয়েছে, মাঝখানে জাহাজ আটকা পড়েছে। ডেকের উপর ঝুলছে ক্যামোফ্লেজ নেটিং, চারপাশ থেকে জাহাজ ঢেকে রাখা হয়েছে।

ফু-চুং আন্দাজ করল, ওই জাহাজগুলো আসলে শ্রমিকদের বসতি। চিন্তা আসতেই নিজেকে শুধরে নিল—এখানে কোনও শ্রমিক নেই। এখানে যা ঘটছে তার সঙ্গে শ্রমের কোনও সম্পর্ক নেই। সবাই এখানে ক্রীতদাস, বিশ্রী এই পরিবেশে কাজ করে করে মারা পড়বে।

দুনিয়ায় খুব কম জিনিস আছে যার জন্য মানুষ এত লোভী হয়ে উঠতে পারে। ওর মন বলে দিল, এরা নিরীহ মানুষ মারছে সোনার খনি পেয়ে!

খনি থেকে সোনা তুলে মারকিউরি দিয়ে শোধন করা হচ্ছে! মারকিউরি দুনিয়ায় একমাত্র জিনিস, যেটা দিয়ে সোনা পুরোপুরি পরিষ্কার করা যায়। সোনার মাইক্রোপার্টিকল্‌স্ একত্র হলে তখন প্রচণ্ড তাপ দিয়ে মারকিউরি উড়িয়ে দেয়া হয়, থাকে শুধু থকথকে খাঁটি সোনা।

আধুনিক স্মেলটারগুলো মারকিউরি আটকে রাখে, ঘন করে আবারও ব্যবহার করে। এমন ব্যবস্থা রাখা হয় যেন ভয়ানক এই বিষাক্ত ধাতু শ্রমিকের ক্ষতি না করে। কিন্তু ওই টিলায় সবাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, বারবার রিফাইনারিতে গেছে, মারকিউরির বাষ্পে শ্বাস নিয়েছে। মারকিউরি দুনিয়ার অন্যতম কড়া বিষ।

এই প্রকাণ্ড যজ্ঞ মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ভালভাবে দেখতে পেল ফু-চুং, তারপরই বিশ্রী গালি শুনল। ওদের দলের সবাইকে একটা লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে। এক গার্ড ওর ঘাড় ধরল, গলায় সরু একটা চেইন পরিয়ে দিল। ওটা থেকে ঝুলছে একটা ট্যাগ। ওকে একটা আইডেনটিফিকেশন নাম্বার দেয়া হয়েছে। আরেক গার্ড

নাম্বারগুলো খাতায় তুলে নিল। এবার ওদের দলের সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া হলো সামনে, তোলা হলো একটা বিধ্বস্ত ক্রুজ লাইনারে। ওদের জন্য কেবিন দেয়া হয়েছে। ভিতরে শীতল পরিবেশ, কোনও চুলো নেই। মেঝেতে পড়ে আছে বাঙ্কের গদি, ওখানে ঘুমাতে হবে। কেবিনগুলো তৈরি করা হয়েছে দু'জন যাত্রীর জন্য, কিন্তু ওখানে থাকতে হবে দশজনকে। দুর্গন্ধের তীব্রতায় বোঝা গেল জাহাজের প্লামিং কাজ করে না। শীত ঠেকাবার কোনও উপায় নেই এখানে, শ্বাস ফেললেই চোখের সামনে কুয়াশা তৈরি হচ্ছে। প্রতি বাঙ্কে আছে একটা করে কাদা-ভরা ব্ল্যাঙ্কেট। কুয়াশার কারণে ম্যাট্রেসগুলো ভিজে আছে। ক্রীতদাসরা গা মুছে নেবে আশপাশে সেরকম কোনও জায়গা নেই। তারা কাজ শেষে জাহাজে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ে, ভেজা-কাদামাখা শরীরে পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে বিদেশে চাকরির নমুনা টের পেয়ে গেছে সবাই।

এক প্রহরী ফু-চুংকে ঠেলে বের করে আনল কেবিন থেকে, দলের সবার সঙ্গে চলল ও। দেখিয়ে দেয়া হলো কোথায় বসে খাবার খেতে হবে। একসময় জায়গাটা ছিল ক্রুজ শিপের মেইন ডাইনিং রুম। এখন আর আসবাবপত্র বা কোনও অর্নামেন্টেশন নেই। সবাইকে শীতল ধাতব মেঝেতে বসে খেতে হবে। ওদের একটা লাইনে দাঁড় করানো হলো, একটা করে নোংরা বাসন দেয়া হলো। ওগুলো পড়ে ছিল এক কোণে। এবার কাজে লাগবে। এক লোকের বামহাতে স্লিং দেখল ফু-চুং, সে-লোক ডানহাতে এক হাতা ভাত বেড়ে দিল। এর পাশে আছে আরেক পঙ্গু লোক, তার সামনে একটা বিরাট ড্রাম। লোকটা বড় এক চামচ ভরা লালচে-ধূসর আঠালো কী যেন বাসনে তুলে দিল।

পাঁচ মিনিট পর সরে এসে মেঝেতে বসল ফু-চুং। হালুয়ার মত জিনিসটা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, স্বাদ এতই খারাপ যে মনে হলো বমি হয়ে যাবে। বোধহয় কোনও মাছ। আঁশটে গন্ধ। রান্নার আগে ধোয়া হয়নি। সুপের মধ্যে মাছের কাঁটা। গলায় ঠেকল। বাসনে রাখল। ফু-চুং ভাল করেই জানে, খেতে যেমনই হোক, খেতে হবে, নইলে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়বে সে।

কিছুক্ষণ পর এক প্রহরী ধমক দিয়ে উঠল, 'শোন্, শালারা!'

তার পাশে আছে আরেকজন, সে বলল, 'তোরা নতুন এসেছিস বলে আগেই খেতে পেলি। এখন থেকে মনে রাখবি, তোদের কাজের শিফ্‌ট্ শেষ হলে তখন খেতে পাবি।'

লোকটা ম্যাণ্ডারিন ভাষায় কথা বলল, কিন্তু মনে হলো চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে। দেখতে এরা উপমহাদেশীয়দের মত। ফু-চুং জানে না এরা কোন্ দেশি। পাকিস্তানি, ভারতীয়, বাংলাদেশি? শীঘ্রি জানা যাবে।

খাওয়া শেষে এ-দলের সবাইকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথমবারের মত ফু-চুং টের পেল, সাগর থেকে উঠে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। হাওয়ায় ভাসছে ছাইয়ের সূক্ষ্ম কণা। ছাই সম্ভবত আগ্নেয়গিরি থেকে এসেছে। এখন ও নিশ্চিত, ওরা আছে কামচাটকা পেনিনসুলায়। প্রহরীদের নির্দেশ শোনা গেল। ওদের দলের সবাইকে একটা করে বাকেট ধরিয়ে দেয়া হলো, বলা হলো সোজা টিলায় গিয়ে উঠতে হবে। ফু-চুং জানে, আজ থেকে ওর কাজ শুরু।

পরবর্তী দেড় ঘণ্টায় সাত বার টিলায় উঠল ও। একটু বিশ্রাম নেয়ার পথ নেই। ষোলো বার নামবার সময় ঊরুতে চাপড় দিল ও। ওখানে চামড়ার নীচে আছে ফারার বসানো হোমিং ডিভাইস।

ও আছে মার্ভেল থেকে অনেক দূরে, তবুও মনে হলো কাছেই আছে। বড়জোর দু'দিন, তারপর রানা ওর কমাণ্ডো দল নিয়ে হাজির হবে, ওকে এই দোজখ থেকে উদ্ধার করবে। আর বড়জোর দুটো দিন!

রাতে জাহাজে ফিরে খাওয়া সেরে নিল, কেবিনের আর সব বন্দির সঙ্গে আলাপ হলো। জাহাজে ইলেকট্রিসিটি নেই, কাজেই অন্ধকারে শুয়ে আছে ওরা। সবার কাহিনি একটু এদিক-ওদিক, কিন্তু বাকি ঘটনা সব এক। এই মানুষগুলো আদম-ব্যাপারিদের কাছে গিয়েছিল, তারা ওদের কন্টেইনারে তুলে দিয়েছে। স্নেকহেডের নেতা তাদের কাছ থেকে পুরো টাকা নিয়েছে, বলেছে তাদের জাপানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু কন্টেইনার খোলার পর তারা দেখল, এখানে এই নরকে হাজির হয়েছে।

'আপনি আছেন কতদিন ধরে?' জানতে চাইল ফু-চুং।

পাশের বাঙ্ক থেকে ক্লান্ত, হতাশ একটা কণ্ঠ বলল, 'সারাজীবন ধরে।'

'ঠাট্টা না, কতদিন?'

'পুরো চার মাস,' বলল লোকটা। বাঙ্কের ভেজা গদিতে একটু সরে বসল সে। 'তবে এই খনিতে কাজ হচ্ছে আরও অনেক আগে থেকে।'

'কেউ পালাতে চায়নি?'

'যাবে কোথায়?' জবাব দিল আরেকজন। 'সাঁতার কেটে তো সাগর পার হতে পারবে না। পানি এত ঠাণ্ডা! ট্রলারগুলো মাছ ধরে ফিরে আসে, কিন্তু সর্বক্ষণ ওখানে থাকে সশস্ত্র গার্ড। পাহাড় তো দেখেইছেন। গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে। যদি গার্ডদের ফাঁকিও দিই, যাব কোথায়? এই ঠাণ্ডায় একদিনও তো টিকব না।'

'আমরা আসলে ক্রীতদাস, মরলে বেঁচে যাব,' বলল তৃতীয় এক লোক। 'যখন চিন ছাড়ব বলেছি, তখন থেকে ওরা আমাদের কিনে নিয়েছে। আমরা খাটতে খাটতে মারা পড়লে ওদের কী? আমরা জাপানের কোনও টেক্সটাইল মিল-এ থাকি, বা নিউ ইয়র্কের কোনও সোয়েট-শপে থাকি—আমরা সবসময় চাকর। ঈশ্বর আমাদের বানিয়েছে এমন করে। আমরা খেটে মরব, তারপর একদিন মারা যাব—সেদিন সত্যিই মুক্তি। আমি আছি এখানে দশ মাস ধরে। এই কেবিনে আগে যারা ছিল তারা এখন আর নেই, মারা গেছে। বন্ধু, আপনি যেই হোন, স্বপ্ন দেখতে পারেন, কল্পনা করতে পারেন পালাবেন—কিন্তু জানবেন, আপনার এখান থেকে মুক্তি নেই। একমাত্র মরলেই বাঁচবেন।'

ফু-চুং দ্বিধা করল, ও কি বলবে ওর কাজ এখানে কী? কেবিনের ভিতরে হাঁটছে দু'তিনজন, শরীরে কটা হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। মনে হয় না খনির ম্যানেজার এদের কাউকে গুপ্তচর হিসেবে রেখেছে, কিন্তু কিছু বলা উচিত হবে না। এদের যা অবস্থা, এরা খানিকটা বাড়তি খাবার বা আরেকটা ব্ল্যাঙ্কেটের জন্য কী যে করবে বলা যায় না। বেচারাদের বাঁচবার আশা দিতে পারত ও, কিন্তু ওর ট্রেইনিং ওকে সাবধান করল—কিছু বলা উচিত হবে না। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে ঘুম

আসছে ওর, শুয়ে পড়ল ভেজা বেডিঙে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে, সারা শরীরে ব্যথা, ঘুমাতে চেষ্টা করল। ওর পাশের দু'জন একটু পর পর কাশছে। ওরা সারারাত কাশল। ওদের নিউমোনিয়া বা আরও খারাপ কিছু হয়েছে। বিশ্রী আবহাওয়ার সঙ্গে আছে বাজে খাবার, সামান্য শরীর খারাপ হলেই রোগ ধরে যাবে। এখানে ঠিক তা-ই ঘটছে।

তৃতীয় দিন ফু-চুং বুঝতে পারল আপাতত কেউ ওকে উদ্ধার করবে না। হাড়-ভাঙা পরিশ্রম, প্রচণ্ড শীত, কাজ শেষে ফিরে এসে ভেজা গদিতে পড়ে থাকা—আর কী করতে পারে ও! রানা যদি জানত ও এখানে আটকা পড়েছে, তা হলে নিশ্চয়ই কিছু করত। প্লেন ভাড়া করে চলে আসত, কোনও এয়ারপোর্ট থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে চক্কর দিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও হেলিকপ্টার এই এলাকার উপর দিয়ে যায়নি।

ফু-চুং চুপচাপ সবার সঙ্গে কাজ করে চলেছে, ও যেন একটা পিঁপড়ে, শুধু সহজাত প্রবৃত্তির বশে অনুসরণ করছে সামনের জনকে। মন থেকে সব চিন্তা দূর করে দিয়েছে, টিলা থেকে বাকেট ভরা কাদা নামিয়ে আনছে, আবার বাকেট নিয়ে উঠছে উপরে। এখানে বাঙালি, চাইনিজ, ইণ্ডিয়ানে তফাৎ নেই কোনও।

এরইমধ্যে জুতো হারিয়েছে ও, গতকাল থেকে শুনছে জোরে শ্বাস টানলে ফুসফুসে কেমন বিশ্রী খড়খড় আওয়াজ হচ্ছে। এই দলের অন্যদের তুলনায় অবশ্য অনেক ভাল আছে ও। ওদের কেবিনের দু'জন ইতিমধ্যে মারা গেছে। একজন মারা গেছে কাদার অ্যাভালাঞ্চে। দ্বিতীয়জন বাংলাদেশি, তাকে পিটিয়েছিল এক গার্ড। বেচারার কান ফেটে গেল, চোখ-কান দিয়ে প্রচুর রক্ত গেল, সবার চোখের সামনে ধড়াস্ করে পড়ে মারা গেল।

পঞ্চম দিন সকালে ফু-চুং কোনও দোষ না করেও মার খেল। ওকে চাবুক দিয়ে পেটানো হলো। এ থেকে দুটো ব্যাপার বুঝে নিল ফু-চুং। এক, ওর উরুতে বসে থাকা বার্স্‌ট্ ট্র্যান্সমিটার কাজ করছে না। দ্বিতীয় কথা, কেউ এখান থেকে উদ্ধার করবে না, এখানেই ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে ওকে।

ঠিক করল, তার আগে কোনও গার্ডের রাইফেল কেড়ে নেবে, মরার আগে যে কটা গার্ড পাবে, সঙ্গে নেবে।

ষষ্ঠ ভোররাতে ওদের সবাইকে বাইরে নেয়া হলো। শীতে থরথর করে কাঁপল ওরা। সাগরে বিশাল একটা জাহাজ দেখতে পেল। ওটা উপসাগরে ঢুকল। ওদের তাড়িয়ে সৈকতে নামানো হলো। ফু-চুং জাহাজ দেখে বুঝতে পারল, ওটা কোনও ফ্লোটিং ড্রাই-ডক, তবে ওর ধারণা হলো ওটা দ্য চুহা। কিন্তু বাস্তবে ওটা সিস্টার শিপ, দ্য চুহি। এত দূর থেকেও প্রচণ্ড দুর্গন্ধ এল, কালো জাহাজটার ভিতরে কী আছে কে জানে! এক ঝাঁক সিগাল ওটার খোলা পোর্টহোলের বাইরে উড়ছে, নরমাংসের টুকরো তুলে নিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে।

এক গার্ড পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফু-চুঙের কিডনিতে ব্যাটনের খোঁচা দিয়ে গেল। তীব্র ব্যথা পেয়ে চমকে গেল ও। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, ওই জাহাজ আসলে ক্রীতদাসদের বাহন। যত শ্রমিক মারা গেছে, বা অসুস্থ হয়ে অতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাদের বদলে নতুন দাস আনা হয়েছে। ও জানে না এভাবে কত

মানুষ হারিয়ে গেছে, কতজন মরেছে, তবে আন্দাজ করতে পারে,- উৎসাহী দেশত্যাগীরা নতুন করে জীবন গড়তে আসে এখানে।

বদলে কী পায়?

মৃত্যু?

একই কেবিনের এক যুবক বলল, 'এভাবেই আমাকে লোভ দেখিয়ে এনেছে ওরা।' এর নাম হুয়েং, ফু-চুঙের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে তার। দু'জন পিচ্ছিল টিলা বেয়ে উঠছে এখন। হুয়েং বলেছে চার মাস হলো সে এখানে আছে। কাঠির মত চিকন এক যুবক, পাঁজরের সবকটা হাড় বেরিয়ে এসেছে খেতে না পেয়ে। বয়স মাত্র সাতাশ বছর, কিন্তু দেখলে মনে হয় ষাট। 'আমাদের একটা পুরানো জাহাজে তুলে দিয়েছিল, তারপর ওই জাহাজটা গিলে ফেলল আরও বড় একটা জাহাজ। ওই যে বিরাট জাহাজটা দেখতে পাচ্ছ, হয়তো ওটাই ওখানে ছিল। যতদিন বাঁচব মনে পড়বে ওখানে কেমন অবস্থায় ছিলাম। এখানে যে কাজ করি তার চেয়ে ঢের খারাপ কাজ করতে হয়েছে তখন।'

কাদা দিয়ে বাকেট ভরে নিল ওরা, ফিরতি পথ ধরল। অনেক নীচে স্লুইস বক্সগুলো, বাকেট ওখানে পৌঁছে দিতে হবে। নামবার সময় দেখল, ড্রাই-ডকের ভিতর থেকে একটা জং-ধরা জাহাজ বেরিয়ে আসছে। ওটার ডেকে ক্রীতদাসরা কাজে ব্যস্ত, ভারী কী যেন বস্তার মত পানিতে ফেলছে।

'লাশ,' বলল হুয়েং। 'আমাকে দিয়ে ওই কাজ করিয়েছে ওরা। জাহাজে করে আসবার সময় যত মানুষ মারা গেছে, তাদের লাশ ফেলে দিয়েছে।'

'সে-সময় কতজন মারা গেছে?'

'একশো, বা আরও বেশি। আমার নিজের দুই চাচাতো ভাইয়ের লাশ ফেলতে হয়েছে আমাকে। ওরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।'

হাঁটবার গতি কমাল না হুয়েং, তবে ফু-চুং টের পেল মানুষটা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেঁপে গেছে।

'ওই জাহাজটা কী সৈকতে ভিড়িয়ে দেবে?' বলল ও। 'ওখানে আরও শ্রমিক রাখবে?'

'প্রথমে ওরা জাহাজের চারপাশে পাথরের দেয়াল তৈরি করবে, তারপর জাল পাতবে। ওটা আর আকাশ থেকে দেখা যাবে না।'

'কিন্তু সাগর থেকে সবই দেখা যাবে।'

মাথা নাড়ল হুয়েং। 'সাগরের এই এলাকায় আছে শুধু দুটো ট্রলার, গত চার মাসে ওগুলো ছাড়া আর কোনও জাহাজ দেখতে পাইনি। আমরা বোধহয় সব জাহাজের পথ থেকে অনেক দূরে। কেউ এখানে আসে না।'

স্লুইস বক্সের কাছে চলে গেছে ওরা, কিন্তু পরমুহূর্তে ফু-চুঙের মনে হলো কেউ ওর পায়ের তলা থেকে কার্পেট সরিয়ে নিয়েছে। থতমত খেল ও, ধুপ্ করে পড়ে গেল। চোখ তুলে দেখল অন্তত একশো শ্রমিক পড়ে গেছে। হঠাৎ মাটি কেঁপে উঠল, থরথর করে কাঁপছে সব।

ঘটনা বুঝে ওঠার আগেই ভূমিকম্প থেমে গেল। কানে তালা লেগে গেল প্রচণ্ড গর্জনে। মনে হলো অনেক দূর থেকে বজ্রের আওয়াজ ভেসে এল।

উঠে দাঁড়াল ফু-চুং, কাদা-মাখা কাপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করতে চাইল। দশ সেকেণ্ড পর দূরের পর্বতের দিকে তাকাল। ওদিকেই তাকিয়ে আছে আর সবাই। পর্বতের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড চূড়া আকাশ ছুঁয়েছে, ওখান থেকে কালো ছাই ও বাষ্প ছিটকে উঠছে। চূড়ার মাথার উপরে নিকষ কালো মেঘ জমেছে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। শীঘ্রি সূর্য ঢেকে ফেলল। চূড়ায় বারবার যেন বজ্রপাত হলো! মনে হলো ওখানে সেইন্ট এলমোর আগুন জ্বলে উঠেছে, এদিক-ওদিক ছুটছে।

তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা প্ল্যান্টের দরজা খুলে গেল, এক লোক ছিটকে বেরিয়ে এল, দৌড়ের উপরে গ্যাসের মুখোশ পরে নিল। এখানে আসবার পর ফু-চুং প্রথমবারের মত কোনও শ্বেতাঙ্গ দেখল।

'ও-ই গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক,' বলল হুয়েং। ফু-চুং দেখল, একদল প্রহরী ওদের দিকে ছুটে আসছে। 'খনির ম্যানেজার।'

গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক শক্তপোক্ত ধরনের লোক, কাঁধ দুটো অতিরিক্ত চওড়া, চেহারায় প্রচণ্ড পরিশ্রমের ছাপ, হাতের পাঞ্জা কোদালের মত বড়। ফু-চুং ও হুয়েঙের কাছাকাছি এসে থামল সে, নতুন জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি দেখে নিয়ে কোমরের খাপ থেকে স্যাটালাইট ফোন বের করে নিল, অ্যান্টেনা উঁচু করে নিশ্চিত হলো সিগনাল আছে, তারপর ডায়াল করল।

'মিস্টার সরোকিন, আমি গিলবার্ট,' ইংরেজিতে বলল সে। কণ্ঠে দক্ষিণ আফ্রিকার টান। কথা শুনছে সে, তারপর বলল, 'আপনি যে পেদ্রোপাভলোভস্ক থেকে কাঁপুনি টের পেয়েছেন, তাতে অবাক হচ্ছি না। আমরা সবাই ভয় পেয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ খবর আছে, সেইজন্যেই ফোন করেছি—আমাদের টিলার ওপাশে যে পাহাড়টা ছিল, সেটা এখন আগ্নেয়গিরি, জেগে উঠেছে।' ওদিকের কথা শুনল সে। 'হ্যাঁ, আমরা আগেও এ নিয়ে আলাপ করেছি। এখন চোখের সামনে বিরাট লালচে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। ওগুলো ছাই আর বাষ্প দিয়ে তৈরি। হ্যাঁ, তা-ই। আগ্নেয়গিরি লাভা ছুঁড়লে আমরা শেষ।'

তার কথা শেষ হতে না হতে প্রকৃতি যেন জানিয়ে দিল যে-কোনও সময় লাভা উদ্গিরণ করবে। জমি মৃদু কাঁপতে লাগল। 'ভালভাবে টের পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, মিস্টার সরোকিন?' টিটকারির সুরে বলল ওয়ালজ্যাক। 'আপনি যতই নিশ্চয়তা দিন, ওসব কথার কোনও দাম নেই। আমার পোঁদে আগুনের আঁচ লাগছে, আপনি তো বসে আছেন গিয়ে তিনশো মাইল দূরে হোটেলের কামরায়।'

কী যেন জবাব দিল সরোকিন। ওর কথা শুনবার ফাঁকে ঘুরে তাকাল ওয়ালজ্যাক। সঙ্গে সঙ্গে কাদার মধ্যে বাকেট চুবিয়ে দিল ফু-চুং, আশা করল লোকটা টের পায়নি সব কথা শুনছিল ও। 'হ্যাঁ, দ্য চুহি মাত্র ফিরেছে। ওরা এখন খানের জাহাজ থেকে শেষ চালানের মজুর নামাচ্ছে। ওদের কাজ শেষ হলে প্রথম চালান তুলে দেব। আপনার সঙ্গে তো কথা হয়েই আছে, এই সপ্তাহেই প্রথম চালান পাচ্ছেন।'

ভ্রূ কুঁচকে ফু-চুংকে দেখল সে। বাধ্য হয়ে হাঁটতে শুরু করল ও, তবে যতক্ষণ পারে শুনল। 'মারকিউরি স্মেলটারের কাজ আপাতত শেষ। আমাদের এখন উচিত প্রসেসিং প্ল্যান্ট সৈকত থেকে সরিয়ে দেয়া। আগ্নেয়গিরির অবস্থা

দেখি আগে, পরে দরকার পড়লে স্মেলটার জায়গায় ফিরিয়ে আনা যাবে। আপনার রাশান বন্ধুদের বলে দিন তারা যেন এখানে কোনও বিজ্ঞানী না পাঠায়। আগ্নেয়গিরি দেখার দরকার নেই। ওরা কিছু ঠেকাতে পারবে? বরং আপনি নিজে এসে অবস্থা দেখে যান। আমি এদিকে দেখছি, আমরা এখান থেকে কীভাবে সরে পড়তে পারি।' ম্যানেজারের কণ্ঠ চড়ে গেল, বোধহয় কথা শুনতে সমস্যা হচ্ছে। 'কী? হ্যাঁ? ওগুলো মরল কি না সেটা দেখতে যাবে কে! দ্য চুহি দিয়ে গার্ডদের সরিয়ে নেয়া যাবে। খান আরও জাহাজ দিতে পারবে। মরুক শালারা। প্রতিবছর এশিয়া থেকে দেড় লাখ বেরিয়ে আসছে। দরকার পড়লে আবারও লোক পাব। কাজ এক-দেড় মাস বন্ধ থাকবে, থাকল। আমাদের এখন যা রসদ আছে তা দিয়েই মিণ্টার চলবে আরও... হ্যাঁ। ঠিক আছে, ঘণ্টা তিনেক পরে আপনার সঙ্গে সামনাসামনি কথা হবে।'

হুয়েং এগিয়ে গেছে, ধীরে ধীরে টিলার উপরে উঠছে। তাকে ধরে ফেলতে সময় লাগল না ফু-চুঙের। মাথার উপরের আকাশে আরও ঘন হচ্ছে মেঘ। ম্যানেজারের কথাগুলো শুনে ভাবনায় পড়ে গেছে ও। পিশাচটা নিজের লোকজন নিয়ে সরে পড়তে চায়, কিন্তু তা করবার আগে তাকে সরোকিন নামের এক লোকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হচ্ছে। সে-লোক প্রভাবশালী কেউ, এমন একজন, যার দহরম-মহরম আছে রাশান সরকারের সঙ্গে। ইচ্ছে করলে সে ভলকানোলজিস্টের এখানে আসা ঠেকিয়ে দিতে পারবে। দক্ষিণ আফ্রিকান ম্যানেজার বলেছে এখনই সরে যাওয়ার সময়। ড্রাই-ডকের শক্তিশালী টাগ-বোট তাদের সরিয়ে নেবে। কথা থেকে এটুকু বোঝা গেছে, এরা ইতিমধ্যে প্রচুর সোনা সংগ্রহ করেছে। তাদের সবচেয়ে দামি জিনিস স্মেলটার প্ল্যাণ্ট, ওটা তারা সৈকত থেকে সরিয়ে নেবে। থাকবে শুধু ক্রীতদাসদের মরচে ধরা আস্তানাগুলো, ওসব জাহাজ বড়জোর লোহার দামে বিক্রি হতো। ওয়ালজ্যাক তো বলেছে ওদের মত মানুষের দাম নেই। প্রয়োজনে হাজারে হাজারে পাবে।

তিক্ত হয়ে গেল ফু-চুঙের মন। লোকটা ঠিকই বলেছে। এদের কাছে ওরা আসলেই মানুষ না। মানুষ আবারও পাবে এরা, ভাবছে কিছুদিন হয়তো কাজ বন্ধ রাখতে হবে—এর বেশি কিছু নয়।

আবারও ভূমিকম্প হলো। গলা শুকিয়ে গেল ফু-চুঙের। ওই আগ্নেয়গিরি সত্যিই লাভা উদ্গিরণ করতে পারে! যদি মাউন্ট সেইন্ট হেলেন্সের মত ভয়ঙ্কর উদ্গিরণ হয়? বিস্ফোরণ ঘটে? পালাবার পথ থাকবে না! কেউ বাঁচবে না! গত কয়েকদিন হলো কাজে মন দিয়েছে ও, জানে রানা ওকে খুঁজে বের করবে, কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে। তবে তার আগে বেঁচে তো থাকতে হবে!

ওয়ালজ্যাক বা স্ট্যানিভের হাতে অনেক সময় আছে, কিন্তু ওর হাতে সময় কোথায়!

ছয়

'কপালের ওপরে ওটা কী উঠিয়েছ?' জানতে চাইল রানা। 'নাইট ভিশন?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন,' প্রায় নিঃশব্দে বলল মেয়েটা। 'আপনারা এ জিনিস সঙ্গে আনেননি?'

'আমাদের মনে হয়েছে দরকার হবে না,' তিক্ত সুরে বলল সোহেল। 'আলো নেভান, জুডি।'

টর্চ নিভিয়ে দিল জুডি স্টিভেনসন, ওটা কোমরে গুঁজল।

'পথ দেখাও,' জুডির কব্জি ধরল রানা, পিস্তলটা হাতে দিল। 'পরে লাগতে পারে। ধরো।'

ইঞ্জিন রুমে হাজারো পাইপ, জুডি টর্চ নিভিয়ে দেয়ায় যে-কোনও সময় হোঁচট খেয়ে পড়বে ওরা। মেয়েটা চোখে নাইট ভিশন আটকে নিল।

ওদিকের দরজায় শক্তিশালী টর্চের আলো। লোকগুলো এগিয়ে আসছে।

'সোহেল, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেলে ওকে ডানপাশ থেকে কাভার দিবি,' বলল রানা। 'আমি ওর বাঁ পাশে থাকব।'

রানা ও সোহেলের মনে একই চিন্তা খেলছে। ওরা জাহাজে উঠেছে চল্লিশ মিনিটের বেশি, কেউ ওদের অনুসরণ করেনি। এর একটাই অর্থ, ওদের সঙ্গিনী কিছু একটা ভুল করে গার্ডদের সতর্ক করে তুলেছে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখন আলাদা হয়ে যাওয়া। জাহাজের রেইলিং পর্যন্ত পৌঁছে গেলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। ডুব সাঁতার দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েটার কী হবে? ধরা পড়লে তো স্রেফ মরবে।

'জুডি, এগোও,' তাড়া দিল রানা।

ওরা একটা হ্যাচওয়েরে কাছে চলে এসেছে, ঢুকে পড়ল পরবর্তী ঘরে। এটা স্টিয়ারিং গিয়ার রুম। ঘরটা পেরিয়ে এল ওরা, সামনে বাঁক নিয়েছে করিডোর। চলে এল এপাশে, হাঁটছে দ্রুত। পিছনে লোকগুলোর আওয়াজ নেই।

নিঃশব্দে বো-র দিকে চলেছে ওরা। রানা বলল, 'বলো তো তুমি কে? এমআই-সিক্স, নাকি রয়াল নেভি?'

একমুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিল জুডি, 'কোনওটাই না। আমি লণ্ডন লয়েড্‌স্-এর ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর। ফ্রড ডিভিশনে আছি।'

জাপান সাগরের জাহাজ হারিয়েছে যারা, তাদের অনেকে লয়েডসের ক্লায়েন্ট, কাজেই ইন্স্যুরেন্স দাবি করছে—মিলছে ব্যাপারটা। লয়েড্‌স তদন্ত করতে পাঠিয়েছে জুডি স্টিভেনসনকে। মেয়েটা সে-জন্যই দুর্ভাগা অ্যাভালাঞ্চে ছিল। ওই জাহাজে বোধহয় ওর দলের আরও অনেকে ছিল, জলদস্যু ধরতে এসেছিল, জানতে চেয়েছিল কারা আছে জলদস্যুতার পিছনে। তবে বুঝতে পারেনি আধুনিক জলদস্যুরা অনেক বেশি সচেতন, অস্ত্রেশস্ত্রে অনেক শক্তিশালী। শেষে তাদের

মরতে হয়েছে, টিকে ছিল শুধু জুডি স্টিভেনসন।

'আর তোমরা?' জানতে চাইল জুডি। রানার দিকে চট্ করে তাকাল। 'রানা, তুমি বলেছ তুমি ভাঙা একটা ফ্রেইটারের ক্যাপ্টেন। কথাগুলো বিশ্বাস করিনি। তোমাদের অন্য কোনও পরিচয় আছে।'

রানা মুখ খুলবার আগে সোহেল বলল, 'এখন কথা বলার সময় আছে, সিস? দ্রুত পা চালান।'

মেয়েটার উপস্থিতি রানাকে বিরক্ত করে তুলেছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছেঃ সামনে বিরাট বিপদ! রানা, এই ওয়্যারহাউস ছেড়ে পালাও! মার্ভেলের ডেকে উঠবার আগে থেমো না!

টর্চের ডায়াল ঘুরিয়ে নিল রানা, আলোটা হবে নেভা-নেভা মোমবাতির মত, তবে বহু দূরে যাবে—সামনে টর্চ তাক করল। জুডি চোখ থেকে নাইট ভিশন খুলে ফেলল, কাঁধের ব্যাগে ভরে রাখল। লম্বা এলো-চুল ক্যাপের ভিতরে গুঁজে নিল।

দু'বন্ধু ভাবছে মেয়েটা কী ধরনের ট্রেইনিং পেয়েছে, কে জানে! তবে ডুবে যাওয়া অ্যাভালাঞ্চে একা থেকেছে, বাঁচবার আশা ছাড়েনি—এ থেকে বোঝা যায়, হাল ছাড়বে না।

সোহেল ফেলে আসা করিডোর দেখল, হাতে উদ্যত ফেব্রিক ন্যাশনাল ফাইভ-সেভেনএন ডাবল অ্যাকশন অটোমেটিক।

সামনের করিডোরে টর্চের আলো ফেলল রানা। শেষমাথায় একটা মই, উঠে গেছে একটা ওভারহেড হ্যাচে।

একটু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'তোমরা নিশ্চয়ই জানো কী করা উচিত?'

'আমাদের প্ল্যানে তুমি ছিলে না,' বলল রানা। 'ভাবিনি তুমি পাকিস্তানি বন্ধুদের সঙ্গে আনবে। আপাতত গোলাগুলি এড়াতে চাই। ছাউনিতে ড্রেইগার রিব্রিদার রেখে এসেছি আমরা। তুমি ডাইভিং জানো?' দ্রুত মাথা দোলাল জুডি। 'তা হলে আমরা ড্রেইগার নিয়ে সাঁতার কেটে জাহাজে ফিরব।'

'এখনই না!' এক পা ঠুকল জুডি। 'এ জাহাজ কাদের জানার আগে যাব না!'

মেয়েটা চিবুক উঁচু করেছে, রানা এক সেকেণ্ড পর বুঝে গেল, এ কিছুতে যাবে না। 'এটা একটা জাপানি জাহাজ, নাম টায়ে-টায়ে,' বলল রানা। 'মালিককে চিনি। এ জাহাজ এখানে থাকার কথা নয়। জলদস্যুরা যখন অ্যাভালাঞ্চ ডুবিয়ে দিল, তার একটু আগে এটা দখল করেছিল। সে-সময় তুমি একটা ড্রাই-ডক দেখেছ। ওটার নাম দ্য চুহা। সেটা এই জাহাজ গিলে নেয়, পরে উগরে দেয়। আমরা জানতাম দ্য চুহা একটা জাহাজ নিয়ে আসছে।'

'কিন্তু কেন এই জাহাজ এখানে থাকার কথা না?'

শ্রাগ করল রানা। 'কারণ দ্য চুহার এখানে আসতে এখনও দু'দিন বাকি।'

জুডির চোখে দ্বিধা ফুটে উঠল। 'কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

আরও বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। দ্রুত এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত, অথচ মেয়েটা একের পর এক প্রশ্ন তুলছে!

সোহেল বিড়বিড় করে কী যেন বলল। মিজের উপরে রেগে আছে ও, দোষ

দিচ্ছে নিজেকে—জলদস্যুরা ওদের ফাঁকি দিয়ে এখানে চলে এসেছে, অথচ ওরা জানেও না!

'আমরা একদিনের জন্য তাইওয়ানের তাইপেতে গিয়েছিলাম, তখন ওরা টায়ে-টায়ে সরিয়ে ফেলেছে,' বলল সোহেল। 'এদের একদল নাবিক এই জাহাজ চালিয়ে এখানে এনেছে। অথচ পরে আমরা ড্রাই-ডকের পিছু নিয়েছি আবারও।'

'এদিকে ওরা ছাউনিতে এনে জাহাজ কাটছে,' বলল রানা। 'বো-টা এরইমধ্যে কাটা হয়ে গেছে।' জুডির বাহু স্পর্শ করল ও। 'পরে খুলে বলব, এখন চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

হাতের ইশারা করল ও, একটু দ্বিধা করল সোহেল, তারপর পিস্তল হোলস্টারে ভরে মই বেয়ে উঠতে লাগল। হ্যাচের কাছে চলে গেল, হুইল ঘোরাল—ধাতব তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে হ্যাচ খুলে গেল। সাবধানে হ্যাচ তুলল ও, পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল। মই থেকে সরে এদিক-ওদিক দেখল। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

ওর পরপর উঠল জুডি স্টিভেনসন। শেষে রানা।

'আমরা আছি মেইন ব্যালাস্ট কণ্ট্রোল রুমে,' বলল রানা।

ক্রুরা পাম্প চালিয়ে এক ট্যাঙ্ক থেকে অন্য ট্যাঙ্কে ওজন সরিয়ে দিত, জাহাজের ভারসাম্য ঠিক রাখত। ও ভাবছে, ওরা যদি সাকশন ইনলেট খুঁজে পায়, হাল-এ একটা ব্রিচ পাবে—ওটার মাধ্যমে পানি ঢুকিয়ে জাহাজের ব্যালাস্ট বদলে দেয়া যাবে। কাজটা করতে হলে আগে সাকশান ইনলেট খুঁজতে হবে, খুলে দিতে হবে ইন্সপেকশন হ্যাচ। কিন্তু সাকশান ইনলেটে মোটা নেট না থাকলে? শেওলা বা বড় মাছ পাম্পে ঢুকতে পারবে। পাম্পের বারোটা বাজবে। এতে শুধু সময় নষ্ট হবে, কোনও কাজই হবে না।

মিনি কম্পিউটার অন অবস্থায় রেখেছে রানা, ডানহাতে তুলে নিল ওটা—টায়ে-টায়ের ব্লু-প্রিন্ট খুলল। খুদে স্ক্রিনে দেখা খুব কঠিন, দেড় মিনিট লাগল এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করতে।

'ঠিক আছে, সোহেল, জুডির ডানপাশ কাভার কর্,' বলল রানা। হাতের ইশারা করল, 'আমাদের পিছনে এসো, জুডি।'

এগোল না মেয়েটা। 'তোমরা ভদ্রতা করছ, নাকি দয়া?'

রানা কড়া কথা বলবার আগেই সোহেল বলল, 'ভদ্রতা বা দয়া নয়, মিলিটারি ট্রেইনিং পাওনি? রানা আর আমি কেভলার আর্মার পরেছি। ...তুমি?'

'না, পরিনি,' আড়ষ্ট স্বরে বলল জুডি, 'এগোও তোমরা।'

ব্যালাস্ট কণ্ট্রোল রুমের বাইরের করিডোরে বেরিয়ে এল রানা ও সোহেল। জুডি আবারও গগলস পরেছে, কিন্তু কোনও আলো না থাকায় ওটা কোনও কাজে এল না। রানা একবার টর্চ জ্বেলে সামনে দেখল, তারপর নিভিয়ে দিল। ভাবছে, গার্ডরা এলে নিশ্চয়ই টর্চ জ্বালবে?

ঘরটা পেরিয়ে এল ওরা, সামনে পড়ল খাড়া মই। সোহেল অর্ধেক উঠে গেল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'রানা, ওপরে আলো।' সাত ফুট নেমে এল ও। 'তোর কম্পিউটারে অন্য কোনও পথ আছে কি না দেখ্।'

কম্পিউটার দেখবার সময় পেল না রানা, মইয়ের উপরের শেষপ্রান্ত পার হলো দু'জন রাইফেলধারী লোক, চলে গেল আরেক দিকে। তিন মিনিট পার হয়ে গেল, তারপর রানা ও সোহেলের পিছু নিয়ে উপরে উঠে এল জুডি। ততক্ষণে আলাপের শব্দ অনেক দূরে চলে গেছে। গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

ওরা আছে এখন মেইন ডেকের নীচে। একবার উপরে উঠলে রেইলিং পার করে নেমে পড়বে, রিব্রিদার নিয়ে পানিতে ডুব দেবে। মুদাস্‌স্‌র খানের লোকজন ওদের খুঁজে পাবে না।

হলওয়ের ওপাশে হঠাৎ অস্ত্রের যান্ত্রিক আওয়াজ পাওয়া গেল, এইমাত্র অস্ত্র কক্ করা হয়েছে। জুডির পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, চট্ করে মেয়েটাকে ধরে বসিয়ে দিল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডেকের সব ক'টা বাতি জ্বলে উঠল। রানা-সোহেল প্রতিপক্ষকে চমকে দিতে চাইল, টার্গেট পাওয়ার আগেই দুটো করে গুলি করল। আশা করল, শত্রুরা দ্বিধায় পড়বে। লোকগুলোর অ্যাম্বুশ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। একবার গুলি ছুঁড়ল জুডি। ওর পিস্তলটা নাইন এমএম, সাইলেন্সার সঙ্গে নেই—ওটার আওয়াজে মনে হলো বদ্ধ জায়গায় কামান গর্জে উঠল।

'মই বেয়ে নেমে যা, সোহেল,' চিৎকার করল রানা, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, তা সম্ভব নয়। মইয়ের নীচ থেকে পাল্টা গুলি করা হচ্ছে। কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে যাচ্ছে। মাযলের আগুন ওদের মুখের কাছে চলে আসছে, যে-কোনও মুহূর্তে কানে ঢুকবে গুলি।

মইয়ের পাশে ঘুরে বসল সোহেল, ফোকরে হাত ভরে দিল, পিস্তল নীচে তাক করে চারবার গুলি করল। চিৎকার করে উঠল কেউ, ধুপ করে নীচে পড়ল। একটা অস্ত্র মেঝেতে খটাংখট করে পড়ল। ওই লোকের সঙ্গী আছে, পাল্টা ব্রাশ-ফায়ার করল সে।

সোহেলের পিস্তলের ব্যারেলে লাগল একটা, আরেকটা কনুইয়ের পিছনের চামড়ায়। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে পিস্তল ছেড়ে দিল ও, অস্ত্রটা খসে পড়ল। হাতের ব্যথায় ওর মনে হলো পাগল হয়ে যাবে। বুলেট ওর কনুইয়ের চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে, আর কিছু না। গড়ান দিয়ে সরে গেল সোহেল, ক্রল করে প্যাসেজের একপাশে চলে এল।

কিন্তু অস্ত্র হারানো উচিত হয়নি। 'প্যাসেজের বাঁকের দিকে এগিয়ে যা, রানা,' বলল ও।

'মাঝখানে এগোও, জুডি,' দ্রুত বলল রানা।

তিনজন ক্রল শুরু করল, প্যাসেজ সামনে নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়েছে, চলে এল ওরা এপাশে। যারা অ্যাম্বুশ করেছে, তারা এখন সামনে-পিছনে। চিৎকার করে কী যেন বলল দু'জন।

'সালা, মার গ্যায়া! হুঁশিয়ার!'

'হাঁ-হাঁ! আগে বাড়ো!'

'সোহেল, সাবধান, পাশে থাক্,' ফিসফিস করে বলল রানা, ঘুরে বসে মিনি-কম্পিউটার বামহাতে নিল, আস্তে করে হলওয়ের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অটোমেটিক গর্জে উঠল। লোকটার মনে প্রাণের ভয় জন্মেছে। হল-এ

হাত বাড়িয়ে দিল রানা, পিস্তল মেঝের সামান্য উপরে রেখে পরপর তিনবার গুলি করল। ও সরে যেতে না যেতে জুডি একই কাজ করল, তবে রানার দেয়া সুযোগটা কাজে লাগাতে পারল। দুবার গুলি ছুঁড়ল। লোকটা ডেকে শুয়ে একে-ফোরটিসেভেন প্যাসেজের দিকে তাক করছিল, বুকে গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। দ্বিতীয়জনকে দেখতে পেল রানা, লোকটা হলওয়ের আরও দূরে, রাইফেল তাক করছে। মাথা পিছিয়ে নিল ও। লোকটা ট্রিগার টিপল, হলওয়েতে গুলিবর্ষণ হলো। মুহূর্তে রাইফেলের ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গেল।

জুডির হাত ধরল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে টান দিল, ছুটল অ্যাম্বুশ থেকে দূরে। পাশে ছুটছে সোহেল। এই মুহূর্তে ওদের লুকিয়ে থাকবার ইচ্ছে নেই। পিছনে লোকগুলো ওদের গুলি করবে। তার আগেই পালাতে হবে।

দৌড়ে প্যাসেজের কোনা আগে ঘুরল সোহেল। এক সেকেণ্ড পর চোখের কোণে নড়াচড়া দেখতে পেল। ওর মাথার উপরে নেমে এল রাইফেলের বাঁট। ধড়াস করে পড়ল ও। ওর বামে বেরিয়ে এল জুডি ও রানা। চোখের পলকে লোকটার নাকের ফুটোয় পিস্তলের ব্যারেল ঠেকাল রানা। গার্ড তখনও রাইফেল তুলে দ্বিতীয়বার তৈরি হয়নি, তার নাকের হাড় থ্যাচ করে বসে গেল, কার্টিলেজ মগজের ভিতরে ঢুকে গেল। কলাগাছের মত পড়ল সে। আরও সামনে আছে আরেকজন, এইমাত্র প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে, তাকে গুলি করল জুডি—ওর পিস্তলের নাইন এমএম বুলেট লোকটাকে মেঝে থেকে তুলে নিয়ে দূরে ছিটকে ফেলল, তার আগেই মারা গেছে।

এক হাতে সোহেলকে তুলল রানা, 'হাঁটতে পারবি?'

'পারতে হবে,' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সোহেল, ভালমত কথা বুঝতে পারছে না। 'এগো তোরা, আমি হাঁটতে পারব।' ওর কপাল কেটে গেছে, ভ্রূ বেয়ে নাকের পাশ দিয়ে রক্ত নামছে। ডান চোখের উপরে নেমে এসেছে ফাটা চামড়া। একটানে চামড়াটা ছিঁড়ে ফেলল ও। রক্ত আরেকবার দ্রুত নামল, তবে এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে।

কাণ্ড দেখে আঁৎকে উঠল জুডি।

'আমি এক সুন্দরী ভাল প্লাস্টিক সার্জনকে চিনি, এগোও!' তাড়া দিল সোহেল, 'সুযোগ পেলে ও আমাকে না খাইয়ে মারবে।'

তিনজন দৌড়াতে শুরু করল।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজে চমকে গেল ওরা। ওদের জানা ছিল না এরকম কিছু দুনিয়ায় আছে। মাথা ঝনঝন করে উঠল ওদের। স্পষ্ট বুঝতে পারল, চালু করা হয়েছে জাহাজ-কাটা করাত। ওরা যেখানে আছে তার তিরিশ ফুট দূরে চেইনটা নেমে এল, ইস্পাত কেটে নামছে। দু'পাশে লুব্রিকেটিং জেট, প্রচণ্ড তাপে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। প্যাসেজের হিউমিডিটি একশো হয়ে গেল, চারদিকে ইস্পাতের শ্র্যাপনেল রূপার খণ্ডের মত ছিটকে গেল। করাত দিক পাল্টাল, পাশ থেকে কাটতে কাটতে আসছে এখন। ধাতব বাল্কহেডগুলো টিশ্যু পেপারের মত ছিঁড়ছে। পুরু চেইনটা ওদের একপাশের দেয়ালে ঢুকে গেল, অতি সহজে কাটছে জাহাজটা। ওদের চার ফুট দূরে ডেক কাটছে ওটা। পড়িমরি করে বামপাশে ছুটল

ওরা। করাত এগিয়ে আসছে! পোড়া ইস্পাতের গন্ধে শ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে উঠল। ছিটকে আসছে তপ্ত টুকরোগুলো। রানার ভেজা স্যুটের পিঠে গর্ত তৈরি হলো।

আরেকটা স্টেয়ারকেসের সামনে পৌঁছে গেল ওরা, হুড়মুড় করে উঠতে শুরু করল। করাত ওদের পিছনে ছুটে আসছে এখনও! ওটা যেন ওদের চোখে চোখে রেখেছে, জানে ওরা কোথায় যাবে। করাত আগের অ্যাঙ্গেল পাল্টাল, সিঁড়ি কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে! সিঁড়ির রেইলিঙের দু'পাশে মাউন্ট, ও-দুটো কাটা পড়ল। করাত এখন দেয়াল ছিঁড়ছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সোহেল, টলে উঠল। কংকাশন ওকে ধরে বসেছে। খেয়াল করেছে রানা, হাত ধরে দ্রুত এগোল। 'তুই হাঁট, মাথায় কোনও চিন্তা রাখিস না।'

'আমরা আছি,' দৃঢ় স্বরে বলল জুডি। 'কোনও চিন্তা নেই।'

ওরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, করাত এগিয়ে আসছে। সোহেল দ্রুত হাঁটতে পারছে না। পাশে ক্রু কেবিন, হাঁটছে ওরা। প্যাসেজ বাঁক নিল। একটু দূরেই খোলা দরজা। করাত পিছন থেকে আড়াআড়ি ভাবে এগিয়ে আসছে, জাহাজ কেটে নামিয়ে দিচ্ছে!

দরজার দশ ফুট দূরের দেয়াল লাল হয়ে উঠল, চেইন করাতের দাঁতগুলো বাল্কহেড কাটছে এখন। জাহাজটা ঠিক ছাউনির মাঝখানে নেই, যে-কারণে ওটা প্রথমে কেটেছে কোনাগুলো। এখন ডেকের দেয়াল কাটছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, চেইনটা হলওয়ের প্রথম দশ ফুট কেটেছে, এখন আরও গিলছে। ধাতব টুকরোগুলো একদল ভীমরুলের মত ছুটছে হলওয়েতে। করাত এরপর করিডোর কাটবে।

আর পাঁচ ফুট পেরিয়ে গেলে বেরিয়ে যাবে ওরা ডেকে। এক হাতের চাপে জুডিকে বসিয়ে দিল রানা, কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। 'বেরিয়ে যাও, জুডি!'

সোহেল বুঝেছে রানা কী করতে চায়, শুয়ে পড়ল ও, শরীর গড়িয়ে দিল। ওর পরপর রানা। ওরা দেখল, করাতটা চোখের সামনে বেরিয়ে আসছে, বিশ্রী আওয়াজ তুলে করিডোর কাটছে! জুডি ও সোহেল করাত পার হয়ে গেল, ডেকে গিয়ে থামল। অন্ধের মত ক্রল করল রানা, মাথার উপরে করাত ঘুরতে দেখল। পরের সেকেণ্ডে ডেকে পৌঁছে গেল ও।

উঠে বসল ওরা, এবার বুঝল, আরেকটা অ্যাম্বুশে পড়েছে!

ছয়জন লোক ওদের জন্য অপেক্ষা করছে, একে-ফোরটিসেভেন তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। রানা বা জুডি পিস্তল তুলতে পারল না, তার আগেই লোকগুলো ওদের মাথায় মায্‌ল্ ঠেকাল। রানা ও জুডির পিস্তল কেড়ে নিল দু'জন। জাহাজের করাতের আওয়াজ দ্রুত কমছে, তারপর খ্যাস-খ্যাস শব্দ করে থেমে গেল।

জাহাজের উপরে ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক দানব, অন্তত পৌনে সাত ফুটি। লোকটা গমগমে স্বরে বলে উঠল, 'ভাবছিলাম আমার করাত তোমাদের খতম করে দিলে মনে কষ্ট পাব।'

ওদের উঠে দাঁড়াতে বলা হলো, আদেশ দেয়া হলো দু'হাত মাথার পিছনে

রাখতে। নির্দেশ পালন করল ওরা। ক্যাটওয়াকে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল রানা। তার বয়স পঞ্চাশও হতে পারে, তবে চেহারা মিলছে আজগার খানের সঙ্গে। বুঝতে পারল, এই লোকই মুদাস্‌সর আলী খান, জলদস্যুদের নেতা, স্মাগলিং রিঙের হোতা।

'তুমিই মুদাস্‌সর আলী খান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমরা যা খুঁজছিলে সেটা নিশ্চয়ই পেয়েছ?' বলল খান। 'কবরে যাওয়ার আগে সমস্ত কৌতূহল মিটিয়ে নাও, নইলে মনে কষ্ট পাব।' দলের লোকদের পাঞ্জাবি ভাষায় নির্দেশ দিল সে। রানা, জুডি ও সোহেলকে জাহাজের বো-র দিকে সরিয়ে নেয়া হলো।

আবার চালু হলো করাত।

অনেক উপরে আছে এক অপারেটর, করাতের চেইন ব্লেড বো-র কাছে সরিয়ে নিল সে। জাহাজের বো যেখানে কাটা হয়েছে, তার পনেরো ফুট পিছনে করাত রাখা হলো। মোটর বন্ধ হয়ে গেল। এমনভাবে রাখা হয়েছে, দুশো ফুট দৈর্ঘ্যের চেইন একটুও ঝুলে পড়েনি। ছাউনির ছাদে অসংখ্য বাতি জ্বলে উঠল। সেই আলোয় ওরা দেখল, বিশেষ অ্যালয় দিয়ে তৈরি করাতের দাঁতগুলো শতশত ছোরার মত ঝিকঝিক করছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুদাসসর আলী খান নেমে এল টায়ে-টায়ের ডেকে, তার দু'পাশে রয়েছে দু'জন সশস্ত্র গার্ড। প্রকাণ্ডদেহী ছয়জন লোক টেনে সোজা করে দাঁড় করালো রানা, সোহেল ও জুডিকে। ওদের তিন জনের হাতে অদ্ভুত আকারের তিনটে পাঁচ ফুট লম্বা ধাতব দণ্ড। ওটার দুই প্রান্তে আড়াআড়িভাবে ছোট দুটো হ্যাণ্ডেল লাগানো। ওদের দুই হাত পিছনে নিয়ে একটা করে রড ভরে দেয়া হলো বগলের নীচে। দু'পাশ থেকে দু'জন একটা করে হাত ধরে রেখে ঘাড়ে তুলে নিল রড। শূন্যে ঝুলছে ওরা এখন। এমনভাবে ধরেছে যে পা ছুঁড়ে কারও গায়ে লাগাবার উপায় নেই। শরীর নেড়ে দেখল রানা, যদি হাত ছাড়ানো যায়... না, এরা শক্ত করে ধরে আরও উপরে তুলে ফেলল ওকে।

'এটাকে দিয়েই শুরু করা যাক,' বলল মুদাসসর আলী। তার গার্ডরা সোহেলকে আরও উপরে তুলে ফেলল, নির্দেশের অপেক্ষায় চেয়ে আছে মনিবের দিকে।

মুদাস্‌সর খান কী করতে চায় বুঝতে পেরে চমকে গেল রানা। হাত ছাড়াতে চাইল, পারল না। আরও দু'জন গার্ড ওর দু'পা টেনে ধরল। চ্যাংদোলা হয়ে শূন্যে আটকা পড়েছে—ঘাড় ফিরিয়ে মুদাস্‌সর আলীকে দেখল ও। জলদস্যুটার হাতে একই রকম দেখতে আরও একটা রড। ওই রড দিয়ে পিটিয়ে ওদের খুন করবে! না। মনিবের ইঙ্গিত পেয়ে গার্ডরা সোহেলকে নিয়ে এগিয়ে গেল করাতের দিকে। একবার দোল দিয়ে বুঝিয়ে দিল কী করা হবে। এরা দূরে থাকবে, কোনও বিপদ হবে না, কিন্তু আস্ত মানুষ দু'টুকরো করে কেটে নামাবে করাত!

কী ঘটবে বুঝতে পেরেছে জুডিও, সিংহীর মত লড়াই করার চেষ্টা করল, হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল; কিন্তু বিশালদেহী পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না। লোকগুলো খিকখিক করে হাসল, জুডিকে আরও উঁচু করে ধরল। ওর

দু'কাঁধে প্রচণ্ড চাপ লাগল, লড়াইয়ের চিন্তা ভুলে গিয়ে, ককিয়ে উঠল ও ব্যথায়।

'শুয়োরের বাচ্চা!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'হারামজাদা! তুইও বাঁচবি না!'

'এটা তো দেখি পাঞ্জাবি বলে!' হেসে ফেলল মুদাসসর আলী। গম্ভীর হয়ে গেল তার চেহারা। 'একদিন সবাই মরে, ক্যাপ্টেন টম হব্‌স্! তবে তুমি খুব তাড়াতাড়ি মরবে। খুব দ্রুত ওজন কমাতে পারো তো তুমি! আমার ছেলে বলেছে তুমি আসবে, কিন্তু এখন দেখছি তোমার অর্ধেকও নেই!'

'আমার কথাগুলো খেয়াল করে শোনো, খান,' চাপা স্বরে বলল রানা। 'আমরা জানি তোমরা দ্য চুহা দিয়ে কী করো। দ্য চুহির কথাও জানি। ওগুলো যে-কোনও বন্দরে যাক, সঙ্গে সঙ্গে আটকা পড়বে। তোমরা শেষ, খান! আরও কয়েকটা জান নিয়ে লাভ কী তোমার!'

ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসল মুদাসসর আলী খান। 'টায়ে-টায়ের ক্রুদের মেরে ফেলেছি বলে আমার বিরুদ্ধে চার্জ আনা হবে না? হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

ক্রুদের যে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি সেটা টের পেলো রানা। দ্রুত একবার সোহেলের দিকে তাকাল, তারপর মুদাস্‌সর আলীকে বলল, 'আর ঠিক দশ মিনিট পর একটা কমাণ্ডো দল এই ছাউনির ভেতরে ঢুকবে, তোমাদের যাকে পাবে গুলি করে মারবে।'

পেট কাঁপিয়ে আবারও হেসে উঠল মুদাসসর আলী, প্রচুর আনন্দ পাচ্ছে বন্দির কথা শুনে। ডান হাতের তর্জনী তুলে নাড়ল। 'ওদের আসতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে যাবে! তোমরা তখন আর নেই! লাভ কী তোমার, কথা দিয়ে তো আমাকে ঠেকাতে পারবে না! ঠিক এই মুহূর্তে আমার দলের ছেলেরা তোমার জাহাজে উঠছে। ওখানে বড়জোর পাঁচ-সাতজন মার্সেনারি আছে। আমরা ওদের হাসতে হাসতে খতম করব।'

রানা জানে, হয়তো এদের ঠেকানো যাবে না, ওদের মরতেই হবে—কিন্তু বাঁচবে না এরাও। মার্ভেলের কমাণ্ডো দল এদের ছাড়বে না, পালাতে পারবে না এরা, কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরবে।

মুদাসসর আলীকে কথা বলানোর জন্য আলাপের সুরে বলল ও, 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম আমরা মারা যাব। কিন্তু মরার আগে জানতে চাই তোমরা মানুষ স্মাগলিং করো কেন। মানুষ নিয়ে কী করো?'

মুদাসসর আলী রানার পা ধরা দুই গার্ডকে ইশারা করল, লোকগুলো পা ছেড়ে দিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। ওর পাশে চলে এল খান, ছাগলের মত পিঙ্গল চোখে প্রতিপক্ষকে দেখল। লোকটার মুখে সস্তা সিগারেট ও বদহজমের বিশ্রী দুর্গন্ধ। রানার সোলার প্লেক্সাসে টেনে ঘুসি বসাল সে। ভুশ্ করে সব বাতাস বেরিয়ে গেল নাক-মুখ দিয়ে। চোখে অন্ধকার দেখল ও। বিশ সেকেণ্ড পর আবার শ্বাস নিতে পারল। চমকে গেছে লোকটার শক্তির বহর দেখে। আরও একটু জোরে ঘুসি মারলেই ফুসফুস ফেটে মারা যেত ও।

'তোমরা বোঝোনি যে, আমি জেনে গেছি দ্য চুহার পিছু নিয়েছ। যখন বুঝলাম তোমরা এই জাহাজ দেখেছ, দেরি না করে সরিয়ে নিলাম।' টিটকারির হাসি হাসল মুদাস্‌সর আলী। 'আমি দাবার চালে সবসময় এক কদম এগিয়ে

ছিলাম। এখনও কোনও ভুল করব না। তোমাকে কিছু বলা অনর্থক! জ্ঞান সবসময় পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। এই শিক্ষা আমার ছেলেদের শিখিয়েছি। খেলতে চেয়েছ, আমি তোমাদের নিয়ে খেলেছি। আমার ক্ষতি হওয়ার রাস্তা নেই। ...আমরা কেন মানুষ সরিয়ে নিই, সেটা তোমাকে বলব কেন?'

এটা নিশ্চিত যে মুদাস্‌সর আলী খানের সঙ্গে আদম-ব্যাপারিদের সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় ঘুসি খাওয়ার ভয় কাটিয়ে রানা বলল, 'আমরা কাদের হয়ে কাজ করি, কেন এখানে এসেছি, তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?'

কড়া চোখে রানাকে দেখল মুদাস্‌সর। 'আমি জানি না তোমরা কাদের চাকর। হাঁ, যদি এক হফ্‌তা আগে আসতে, তোমাদের পেট চিরে সব কথা বের করতাম। তোমরা কারা জানতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু এখন আর আমার কিছু যায়-আসে না। ...মূল কথা, তোমরা তোমাদের পেটের সব খবর নিয়ে কবরে যাও, আমি আমার কাজে যাই।'

ডানহাত তুলে ইশারা করল খান, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের করাতের শক্তিশালী মোটর চালু হয়ে গেল। গিয়ার দেয়া হয়েছে, কয়েক সেকেণ্ড পর তীব্র গতি তুলল চেইন। ডেকের কাছে নেমে আসছে। কাছ থেকে অস্পষ্ট দেখা গেল। আওয়াজে তালা লেগে গেল কানে। করাত জাহাজের গায়ে দাঁত বসালে এর চেয়ে অনেক জোরে আওয়াজ করে।

ওটার দিকে তাকিয়ে একবার ঢোক গিলল রানা, সোহেলের দিকে তাকাল। চোখ সরিয়ে নিল সোহেল। হিসাব কষছে ওরা, বড়জোর নিজেদের গার্ডদের কাবু করতে পারবে, কিন্তু বাকিগুলো ওদের পাখির মত গুলি করে মারবে। জুডি মাথা ঠাণ্ডা রাখলে বেঁচে যাবে। যদি দৌড়ে গিয়ে রেইলিং টপকে পানিতে পড়ে ডুব সাঁতার কেটে বেরিয়ে যায়... জুডির দিকে একবার তাকাল রানা। চোখাচোখি হলো দু'জনের। মনে হলো পরস্পরের চোখ পড়ছে। জুডি বুঝে গেছে রানা ও সোহেল পাগলের মত কিছু করবে। আস্তে করে চোখ সরিয়ে নিল জুডি, মন প্রস্তুত করে নিল—একটু পর ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে হবে। মানুষ দুটো মরবে। মরতে তো হবে ওরও। দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

গার্ডরা সোহেলকে ঘুরন্ত করাতের কাছে নিয়ে গেল। সোহেল বুঝতে পারছে, এক পা সামনে এগোতে প্রবল মানসিক জোর লাগছে। করাতটা আর পাঁচ ফুট দূরে! ঘুরছে! প্রচণ্ড গতি! আশপাশে কিছু পেলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে! ঘড়ঘড়-খ্যাসখ্যাস আওয়াজ করে ঘুরছে দ্রুত!

আর তিন ফুট!

মুদাস্‌সর আলী খান এগিয়ে এসেছে, একপাশ থেকে দেখবে কী ভাবে মানুষটা কাটা পড়ে। সোহেল শ্বাস আটকে ফেলল। পিশাচটার হাতে এক খণ্ড পুরু কাঠ, অন্য হাতে সোহেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—ঘুরন্ত করাতের ভিতরে কাঠের টুকরো গুঁজে দিল। বাড়তি কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না, তবে চারপাশে ছিটকে গেল কাঠের গুঁড়ো। মোটা মেহগনির টুকরো কাটতে এক সেকেণ্ডের ষাটভাগের এক ভাগও লাগেনি করাতের! মুদাস্‌সর আলী খান বড়বড় হলদেটে দাঁত বের করে হাসল, পিছিয়ে রানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, গলা চড়িয়ে বলল,

'জনাব টম হবস্, মেয়েটাকে করাতে দেয়ার আগে আমার লোকজন একটু চেখে দেখবে! তুমি কিন্তু তখন এখানে নেই! তুমি আছ বেহেস্তের হুর-পরীদের সঙ্গে... হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

বন্ধুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। খেয়াল করতে হবে সোহেল কখন কাজে নামে! সোহেলের চোখে কোনও দ্বিধার ছাপ নেই। ও সবসময় ওরকমই ছিল। নিশ্চয়ই কিছু পরিকল্পনা আছে ওর।

দু'পাশের গার্ডদের দেখল সোহেল। পরমুহূর্তে কী যেন করল! বাম বগলে চাপ ফেলেছে—সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং সক্রিয় হলো, নকল হাত ছিটকে সামনে চলে এল। যান্ত্রিক হাত দেখতে সাধারণ হাতের মতই, জিনিসটা প্লাস্টিক-সিনথেটিক-রাবার ও টাইটানিয়াম দিয়ে তৈরি—মাঝারি গতিতে নাড়ানো যায়, আঙুলগুলো বেশ ভারী জিনিস ধরে রাখতে পারে।

বামপাশের গার্ড হাতটা ধরে রাখতে না পেরে মুহূর্তের জন্য বোকা হয়ে গেল। সুযোগটা নিল সোহেল, ডাইভ বুটের গোড়ালি নামিয়ে আনল লোকটার স্যাণ্ডেল পরা পায়ের পাতায়। ব্যথায় অস্ফুট আওয়াজ করল লোকটা। কাঁধ থেকে রডটা খসে পড়ল। ডানপাশের গার্ড এখনও সোহেলের ডানহাত ধরে। হাত টেনে নিল না ও, উল্টো তার হাত নিয়ে সামনে বাড়ল সোহেল, ডান পায়ে জোরে মারল ওর পায়ে। প্রহরী হাত ছাড়ছে না। টানাহ্যাঁচড়া করলে ওরা করাতের মধ্যে ঢুকবে। ওটা আর মাত্র এক ফুট দূরে! লোকটা শেষমুহূর্তে বুঝল হাত না সরিয়ে নিলে করাতে কাটা পড়বে। ঝটকা দিয়ে হাত ছেড়ে দিল সে, পিছিয়ে যেতে চাইল। সোহেল ডানে ঘুরে লোকটার মুখে উল্টো হাতের চড় কষাল। লোকটা বিস্মিত হয়ে পিছিয়ে গেল। এদিকে সোহেলের বামহাত অনেকটা উপরে উঠে গেছে, আর ওটার ভারসাম্য রাখতে পারল না ও—হাতটা ঢুকে গেল ঘুরন্ত চেইনের ভিতরে! আবছা ভাবে জুডির কণ্ঠ শোনা গেল, ভয়ে চিৎকার করছে। প্লাস্টিক-সিনথেটিক হাতের ভিতরে আছে স্টিলের চেয়ে অনেক শক্ত টাইটানিয়াম—করাতের দাঁত ওই জিনিস কামড়ে ধরেছে। কাঁধের জয়েন্টে ভীষণ ঝাঁকি খেল সোহেল, ব্যথায় মনে হলো জ্ঞান হারাবে। ওর কব্জি ও কনুইয়ের মাঝখানটা স্পর্শ করল করাতের দাঁত, মুহূর্তে কাটা পড়ল হাতটা, ধপ্ করে পড়ল জাহাজের ডেকে। আরেকবার চিৎকার করল জুডি। প্রচণ্ড-গতি করাত সোহেলকে ছিটকে পিছিয়ে দিল। ডেকে পড়বার সময় নিখুঁত শোল্ডার রোল করল ও, একবার গড়ান দিয়ে উঠে বসল। খপ্ করে কাটা কনুই ধরল, গোপন কমপার্টমেণ্ট থেকে টেনে বের করে নিল মডিফায়েড কেল-টেক পিস্তলটা।

কেল-টেক দুনিয়ার অন্যতম ছোট হ্যাণ্ডগান, বুলেট না থাকলে ওজন মাত্র পাঁচ আউন্স। তবে এই পিস্তলটা অন্য ধরনের, সাধারণ .২২ বা .২৫ ক্যালিবারের গুলি ছোঁড়ে না, এটা পি-রেটেড .৩৮০ কার্ট্রিজ ফায়ার করে—এর গুলিতে অনায়াসে তেড়ে আসা ষাঁড়ও ঠেকানো যায়।

পিস্তলের ম্যাগাজিন ও চেম্বারে থাকে মাত্র সাতটা বুলেট। সোহেলের ইচ্ছে ছিল প্রথম বুলেট ঢুকিয়ে দেবে মুদাস্সর আলী খানের করজের ভিতর। কিন্তু গার্ডদের কাছে রাইফেল আছে বলে তাদের দিকেই তাক করল। রানার দু'পাশের

দুই গার্ড প্রায় একইসঙ্গে কপালে গুলি খেল। ঘুরে বসল সোহেল, একটু আগে ওকে ধরে রাখা গার্ডদের একজন বুকে গুলি খেয়ে করাতের মধ্যে পড়ল। রক্ত ছিটকে উঠল, মনে হলো লাল রঙের কোনও ফোয়ারা। কাটা মাথা ও ডান উরু ফিরে এল ডেকে।

ওদিকে রানা মুহূর্তে এক মৃত গার্ডের একে-ফোরটিসেভেন তুলে নিয়েছে, সোহেলকে আটকে রাখা দ্বিতীয় সেই গার্ড কাঁধে রাইফেল তুলছে এখন—তিনটে বুলেটের আঘাতে লোকটার মুখ ছিন্নভিন্ন হলো। ধড়াস্ করে পড়ল লাশটা। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা, জুডিকে বন্দি করা গার্ডদের দিকে রাইফেল তুলল। সোহেলও ওর পিস্তল তাক করল। ওই দুই গার্ড জুডির আড়াল নিয়েছে। ডান দিকের লোকটার বাম হাঁটু একটু বেরিয়ে আছে, ওখানে গুলি করল সোহেল। পিশাচটা তীক্ষ্ণ সুরেলা চিৎকার ছাড়ল, দু'হাতে হাঁটু ধরে করাতকে হার মানিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে শুয়ে পড়ল। দ্বিতীয়জনের মুঠো থেকে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল জুডি, লাফ দিয়ে সরে গেল। পরের সেকেণ্ডে রানার গুলিতে লোকটার বুক ঝাঁঝরা হলো। এইবার একসঙ্গে ফিরল দুই বন্ধু পাঞ্জাবি পিশাচটার দিকে।

নেই! গায়েব হয়ে গেছে মুদাস্‌সর আলী খান! তার সঙ্গে আসা দুই গার্ডও উধাও। ক্যাটওয়াকে উঠে আরও উপরে চলে যাচ্ছে ওরা। তাদের একজন সাহস ফিরে পেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে একে-ফোরটিসেভেন দিয়ে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল। পাল্টা গুলি করল রানা, চিৎকার করে জুডিকে ডাকল। উড়ে এল মেয়েটা।

'রেইলিং! জলদি!' বলল রানা, আরও দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল গার্ডের দিকে। লোকটা লুকিয়ে পড়েছে।

জুডি, সোহেল ও রানা প্রায় একইসঙ্গে দৌড়ে রেইলিঙের পাশে পৌঁছে গেল, দৌড়ের গতি কাজে লাগিয়ে রেইলিং টপকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা—রওনা হয়ে গেল নীচের পানির দিকে। মাথা তাক করে রেখেছে ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে। কিন্তু উচ্চতা আঁচ করতে না পারায় পড়ল বিশ্রী ভাবে, প্রচুর পানি ছিটিয়ে। মুহূর্তে ডুবে গেল ওরা নোংরা পানিতে।

ডুব-সাঁতার কেটে ইমপ্যাক্ট ওয়েভের বাইরে সরে যেতে চাইল। শুনতে পেল কেউ জাহাজের করাতের মোটর বন্ধ করেছে। ছাউনির ভিতরে এখন আর প্রচণ্ড আওয়াজ নেই। সোহেল ধীরে ধীরে দশ গুনল, জানে দম নিতে হবে, তবে আরও বিশ সেকেণ্ড গুনে তারপর উঠতে শুরু করল। সবার আগে দম নিতে উঠল জুডি, পাঁচ সেকেণ্ড এদিক-ওদিকে উঠল সোহেল ও রানাও। জাহাজের গায়ের কাছে ভেসে উঠেছে ওরা। ফুসফুসে ঘুসি-খাওয়া জায়গাটা দব্-দব্ করছে, পাত্তা দিল না রানা। 'সোহেল, সোজা ড্রেইগারের দিকে চল্, ডানহাতে ছেমড়ির হাত ধর্, বাম হাত ধরছি আমি।'

দম নিয়ে আবারও ডুব দিল ওরা। যে-কোনও সময় ওদের দিকে গুলি ছুটে আসবে। দ্বিতীয়বার উঠল ড্রেইগার যেখানে রেখে গেছে, তার বিশ ফুট আগে। পানিতে একের পর এক গুলি এসে পড়ছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল ওদের। অন্ধকারে পানি ছিটকে উঠছে, সাদা ফেনা তৈরি হচ্ছে। দ্বিতীয়বার শ্বাস নেওয়ার সাহস পেল না ওরা, ডুব দিল আবারও। ওদের মনে হলো কোনও দিন গন্তব্যে

পৌঁছুনো যাবে না, তবে তিরিশ সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল। সোহেলকে ওর গিয়ারটা পরে নিতে বলল রানা, নিজেরটা পিঠে ঝুলানোর ফাঁকে বলল, 'সোহেল, তুই বেরিয়ে যা। আমি জুডিকে নিয়ে দশ ফুট তলা দিয়ে আসছি। সবাই মিলে বিপদে পড়ার মানে হয় না।'

'ওকে আমারটা দিচ্ছি,' বিনা দ্বিধায় বলল সোহেল। 'ও বেরিয়ে যাক। চল্ আমরা দু'জন একসঙ্গে যাই।' ড্রেইগার বাড়িয়ে দিল ও জুডির দিকে।

আপত্তির সুরে শুরু করল জুডি, 'কিন্তু আমি কেন...'

আর কোনও তর্কে গেল না রানা, 'জুডি, ও ঠিকই বলেছে, ড্রেইগার পরে নাও। আমরা পরে আসছি।'

'কিন্তু...'

'পরে নিন তো,' প্রায় ধমকে উঠল সোহেল। 'যে-কোনও সময় বুলেট ওটার বারোটা বাজাবে!'

জাহাজ থেকে পশলা পশলা গুলি আসছে। আশা করছে যে-কারও গায়ে গুলি লাগবে। লোকগুলো রাগে অন্ধ হয়ে গেছে। সঙ্গীদের লাশ পড়ে আছে ডেকে। নিজেরা কিছুই করতে পারেনি।

দ্রুত হাতে ড্রেইগার পিঠে তুলল জুডি, সোহেল স্ট্র্যাপ আটকে দিয়ে ফিন দিল। পরে নিয়ে একবার রানা ও সোহেলকে দেখল জুডি, নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডুবে গেল। ভাবছে, এরা দুই বন্ধু অদ্ভুত, বিনা দ্বিধায় ঝুঁকি নিল একটা মেয়েকে সাহায্য করতে গিয়ে! এমন মানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে!

'বোকা ছেমড়ি গেছে,' স্বস্তির শ্বাস ফেলল সোহেল, 'আয় এবার আমরা পালাই!'

সোহেলকে একটা ফিন বাড়িয়ে দিল রানা। 'নে শালা, তোর বোন আর বলতে পারবে না নিজেই সব নিয়েছি।'

প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। থমকে গেল সোহেল, চমকে গেছে রানাও। এটা অযোগ্য গার্ডদের সাধারণ গোলাগুলি না, থেমে থেমে এই গোলা-বর্ষণের আওয়াজ ওরা ভাল করেই চেনে। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর হাসল রানা। মৃদু মাথা দোলাল সোহেল। মুদাস্‌সর আলী খানের লোকজন মার্ভেলে উঠতে চেষ্টা করছে। অনিল বসে আছে ওখানে ভিডিও স্ক্রিনের সামনে, জাহাজের বোফোর্স ফোরটি এমএম অটোক্যাননন চালু করেছে ও!

টায়ে-টায়ের ডেক থেকে যারা গুলি করছে, তাদের কেউ পানিতে ওদের নড়াচড়া খেয়াল করেছে। হঠাৎ বাকিরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। রানা-সোহেলের চারপাশে এসে গুলি পড়ছে, পানিতে সরু সরু নালা তৈরি হলো!

দুই বন্ধু একটা করে ফিন পরে নিল। সোহেলের মুখে রেগুলেটর গুঁজে দিয়ে নিজেও ডুব দিল রানা। অর্ধেক বাতাসে চালিয়ে নিতে হবে ওদের, নইলে ড্রেইগারের বাতাস বিষাক্ত হয়ে যাবে! ফলাফল—ভালো না!

সাত

ওয়্যারহাউজের ভিতরে জাহাজের করাত চালু হতেই কমাণ্ডোদের নিয়ে জোডিয়াকে উঠেছে উর্বশী, রওনা হয়ে গেছে। এদিকে অনিল, গগল ও আতাসি অপেক্ষা করছে অপারেশন্স সেন্টারে, নিজেদের সিটে। ঘরে জ্বলছে এখন ব্যাটল লাইট, কম্পিউটারের নীল স্ক্রিন থেকে বেগুনী আলো উৎসারিত হলো।

ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে এত রাতে কেন খানের করাত চালু হয়েছে। ওদের দুই সঙ্গী নিশ্চয়ই এখন বন্দি! হেলম-এ দাঁড়িয়ে আছে গগল, উইপন্স-এ বসে অনিল, আতাসি দেখছে থ্রেট বোর্ড।

'উর্বশী ম্যাডাম, আপনারা নেটওয়ার্কে আছেন তো?' জানতে চাইল আতাসি।

'আছি, মার্ভেল,' বলল উর্বশী। 'এগিয়ে চলেছি স্টেল্থ্ মোডে। ইটিএ সাত মিনিট।'

উর্বশীরা জোডিয়াক নিয়ে দ্রুত যেতে পারে, করাতের আওয়াজ ওদের এগিয়ে যাওয়ার শব্দ ঢেকে দেবে—কিন্তু আকাশে চাঁদ মামা হাসছে, জোডিয়াকটা কালো সাগরে ফেনা তুললে পরিষ্কার দেখা যাবে।

'মার্ভেল, সৈকতের কাছে অনেক লোক,' বলল উর্বশী। 'ওদের সঙ্গে চারটে ইউটিলিটি বোট। রিপিট করছি, চারটে বোট। থারমাল স্ক্যান বলছে, ওগুলোর গানেল-এ অনেক লোক বসে আছে।'

'পেয়েছি ওদের,' উইপন্স স্টেশন থেকে জানাল অনিল। থারমাল/আইআর/লো-লাইট ক্যামেরাটা মার্ভেলের প্রধান মাস্তুলে বসানো আছে, ওটা স্ক্রিনে সব দেখাচ্ছে। 'আন্দাজ পঞ্চাশজন। সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেল আর রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড।' কি-বোর্ডে কমাণ্ড টাইপ করল ও, সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে জাহাজের বিপুল অস্ত্রের তালিকা বেরিয়ে এল। স্ক্রিনটা চার ভাগ করে নিল অনিল। প্রতিটা চল্লিশফুটি বোটকে এখন আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যাচ্ছে ভাগগুলোয়। একটা সুইচ টিপতেই চারটে সাইট রেটিক্ল্ দেখা দিল স্ক্রিনে, স্থির হলো কালো রং করা বোটগুলোর উপর। এখন মার্ভেলের বোফোর্স ব্যবহার করলে জোডিয়াক বিপদে পড়বে কি না জানতে চাইল ও।

উত্তর দিল আতাসি, 'কোনাকুনি ভাবে যাচ্ছে জোডিয়াক, তবে খুবই ধীর গতিতে।'

জোডিয়াকটা আছে মার্ভেলের স্টার-বোর্ডে, ধীরে চলেছে। ওদিকে খানের লোকজন সরাসরি জাহাজের দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু উর্বশী এখন গতি বাড়াতে পারবে না, সাগরে ফেনা দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু করবে ওরা।

অপারেশন্স সেন্টারের বিরাট স্ক্রিনে দেখছে ওরা। লাইন অভ সাইট থেকে জোডিয়াকটা সরে যাবার অপেক্ষা করছে অনিল। অস্থির বোধ করছে ইউটিলিটি বোটগুলোকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে দেখে।

'সৈকত থেকে মিসাইল!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ফারা।

থমকে গেল অনিল সবাই।

কথাটা শেষ হতে না হতে প্রচণ্ড শব্দে একটা আরপিজি এসে পড়ল জাহাজে। পাঁচ পাউণ্ডের সোভিয়েত রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড মার্ভেলের বো-এর উপরের অংশে আঘাত হেনেছে। মুহূর্তে স্টিলের প্লেটিং উড়ে গেল, ডেকে বড়সড় একটা গর্ত তৈরি হলো। অবশ্য নোঙরের শিকল বা যন্ত্রপাতি নষ্ট করেনি।

'আরও! বেশ কয়েকটা!'

সৈকতের অনেক কাছে নোঙর ফেলেছে মার্ভেল, ফলে জাহাজের অটোমেটেড ডিফেন্সিভ সিস্টেমগুলো আরপিজিগুলোকে উড়ন্ত অবস্থায় ধ্বংস করতে পারবে না। বাধ্য হয়ে অনিল বলল, 'গগল পিছিয়ে যান! ফুল ব্যাক!'

গগলও একই কথা ভেবেছে, ইতিমধ্যে ডুয়াল থ্রটল নিয়ে কাজ করছে। মার্ভেলের বুকের মধ্যে বসে থাকা চারটে প্রকাণ্ড ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিনগুলো জেগে উঠল। বাতি যেমন দপ্ করে জ্বলে, তেমনি মুহূর্তে পুরো শক্তি পেয়ে গেল। ইঞ্জিনগুলো সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ড্রাইভ টিউবের ভিতরে প্রচণ্ড ঢেউ তুলল।

মার্ভেলের পিছিয়ে যাওয়ার গতি এত দ্রুত যে গ্যালিতে রাখা সমস্ত ডিশ ঝনঝন করে পড়ল। তবে এই গতিও যথেষ্ট নয়। একের পর এক আরপিজি আসছে, আসতেই থাকল।

ওগুলোর ছয়টা টার্গেট মিস করে সাগরে গিয়ে পড়ল, একটা লাগল মার্ভেলের নকল কার্গো ডেরিকে—ওটা সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ল। স্টিলের ভারী মাস্তুল পুরো জাহাজটাকে কাঁপিয়ে দিল। অষ্টম মিসাইল এসে পড়ল ব্রিজের ঠিক নীচের সুপারস্ট্রাকচারে। হাই এক্সপ্লোসিভ ওয়ারহেডগুলো তৈরি হয়েছে ট্যাঙ্কের পুরু আর্মার উড়াতে, কাজেই ওটা আধ ইঞ্চি স্টিল ভাঙবার পরেও অনেক শক্তি রাখে। বিস্ফোরণটা পাশের দুটো কেবিন শুইয়ে দিল। ড্যামেজ কন্ট্রোল কম্পিউটার মুহূর্তে আগুন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কাজে লাগাল—দেরি না করে ড্যামেজ কন্ট্রোল টিমকে জানিয়ে দিল কোথায় যেতে হবে।

জাহাজের ইমার্জেন্সি চ্যানেলে কথা বলল অনিল, 'টিম লিডার, আধ মিনিটের মধ্যে রিপোর্ট দাও।'

গগল জিপিএস ডিসপ্লে দেখে নিয়ে স্পিড ইণ্ডিকেটর দেখল। ওরা ব্রেকার্সের ইয়ার্ড ছেড়ে পিছিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে বিশ নট, তবে প্রতি ক্ষণে গতি আরও বাড়ছে। আরও কিছুক্ষণ, তারপর চলে যাবে ওরা খানের আরপিজি'র রেঞ্জের বাইরে। তবে লোকগুলোর কাছে যদি স্টিংগার মিসাইলের মত সফেসটিকেটেড কিছু থাকে, তা হলে আরও দূরত্ব দরকার, নইলে রকেট আকাশ থেকে ফেলা যাবে না।

'উর্বশী, আপনাদের কী খবর?' জানতে চাইল অনিল।

'ধাওয়া করছে,' শান্ত স্বরে বলল উর্বশী। ওর কথার উপর দিয়ে ভেসে এল জোডিয়াকের ইঞ্জিনের গর্জন ও মেশিনগানের গুলির আওয়াজ। 'একটা বোট আসছে আমাদের দিকে। বাকি তিনটে আপনাদের দিকে ছুটছে।'

'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে আরও এক মিনিট লাগবে আমাদের,' জানাল গগল।

'তারপর আমরা আপনাদের কাভার দিতে পারব,' বলল অনিল।

'ঠিক আছে,' চুপ হয়ে গেল উর্বশী।

নেটওয়ার্কে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ যোগ দিলেন, 'আমি এখন আমাদের দুইনম্বর ইউএভি আকাশে তুলছি, তিন মিনিট পর আপনারা রণক্ষেত্রের পরিষ্কার ছবি দেখতে পাবেন।'

জোডিয়াক এখন চল্লিশ নট গতিবেগ তুলে সরে যাচ্ছে। উর্বশীর পক্ষে এই অবস্থায় এম-ফোরএওয়ান দিয়ে ইউটিলিটি বোটে গোলা-লাগানো সম্ভব নয়, তবে ওদের কিছুটা নিরুৎসাহিত করতে থেমে থেমে তিন রাউণ্ডের বার্স্ট চালিয়ে যাচ্ছে ও। ফলে ইউটিলিটি বোটের লোকগুলো তাদের অস্ত্র গানেলের উপরে রেখে আন্দাজের উপর গুলি করছে অনর্গল।

উর্বশী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, ভালবেসে ফেলা কারোর বা কিছুর ক্ষতি দেখলে কেমন লাগে—নিজের চোখ বিশ্বাস করতে পারছে না ও। মার্ভেল সত্যিই রকেটের আঘাত নিচ্ছে! মনে হচ্ছে ওর নিজের পাঁজর ভাঙছে কেউ। তবে এটাও জানে, মিস্টার চ্যাটার্জি স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়েছেন এরকম হতেই পারে। জানে তো ও-ও, কিন্তু মন মানে? আরও বড় চিন্তা ওই পাগল মানুষটাকে নিয়ে—ওদিকের ওই ওয়্যারহাউসে বন্দি হয়েছে ও। ওখানে কী হচ্ছে কে জানে! রানা আর মিস্টার আহমেদকে উদ্ধার করতে হবে, ওদের নিয়ে এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। অথচ ওরা নিজেরাই এখনও তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!

এইমাত্র জাহাজের করাত থেমে গেছে। উর্বশী বুঝতে পারছে না এটা ভাল, নাকি ভয়ঙ্কর কিছু। মার্ভেল ওদের পিছনের তেড়ে আসা বোটটাকে সরিয়ে না দিলে ওরা ওয়্যারহাউজে ঢুকতে পারবে না। ...নাকি পারবে?

কমাণ্ডো আবু কাশেম আছে জোডিয়াকের হেলম-এ, উর্বশী হাত নেড়ে তাকে বুঝিয়ে দিল কী চায়। কাশেম নীরবে মাথা দোলাল—হালকা জোডিয়াকটা দ্রুত ঘুরিয়ে নেবে সে, তারপর উড়িয়ে নিয়ে যাবে ওয়্যারহাউজের মুখের কাছে।

ওদের নৌযান ঘুরিয়ে নেয়ায় ইউটিলিটি বোট অনেক কাছে চলে এসেছে। ওটার জলদস্যুরা সুযোগটা টের পেয়ে সাহসী হয়ে উঠল—জোডিয়াকের আরোহীদের শেষ করতে গর্জে উঠল অন্তত বারোটা রাইফেল। রাবারের খোলে অসংখ্য ফুটো হতো, উর্বশী দলবল নিয়ে থেমে গিয়ে মরত, কিন্তু কাশেম ফিরতি পথে খরগোশের মত এঁকে-বেঁকে ছুটছে!

কমাণ্ডোরা বোটের উপরে পাল্টা গুলি বর্ষণ করল। এমন কী কাশেমও, এক হাতে থ্রটল, অন্য হাতে পিস্তল। ইউটিলিটি বোটের এক ডাকাত রাইফেল ফেলে দু'হাতে গলা চেপে ধরল, পড়ে গেল রেইলিং টপকে। বো-র ঢেউ তাকে টেনে নিল, পরমুহূর্তে লোকটা বোটের নীচে তলিয়ে গেল। গলার আঘাতটা গুরুতর না হলেও বোটের প্রপেলার তাকে কিমা করবে।

বোটের হুইল-হাউজে বসা লোকটা মাথা নিচু করে রেখেছে, নৌযানটা দ্রুত জোডিয়াককে পেরিয়ে গেল। সুযোগটা নিল কাশেম, ওয়্যারহাউজের মুখে পৌঁছে

গতি কমিয়ে দিল। ঠিক তখনই করাত আবারও হুঙ্কার ছাড়ল—তবে এখন ওটার আওয়াজ কমেছে, জাহাজের লোহা কাটছে না।

ডানহাতে **M-4A1** ধরল উর্বশী, জোডিয়াকের নরম পাশে চলে এসে আস্তে করে পানিতে নেমে পড়ল। কাশেম সঙ্গে সঙ্গে জোডিয়াক নিয়ে সরে গেল, দ্রুতগতিতে সৈকতের পাশ দিয়ে ছুটল।

ছাউনির গেটে পৌঁছে দম নিল উর্বশী, ডুব দিল। এক মিনিট পর ভেসে উঠল ভিতরের পানিতে। চারপাশে আলোর অভাব নেই। জাহাজটার পোর্ট-সাইডে এখন কোনও নাম নেই। করাতটা খ্যাস-খ্যাস করে ঘুরছে, আর কোনও আওয়াজ নেই। এখানে কী হচ্ছে বুঝবার উপায় নেই।

উর্বশী রেডিয়ো করল, 'মার্ভেল, আমি অ্যাসল্ট ওয়ান, এখন ছাউনির ভেতরে। মাসুদ রানা আর মিস্টার আহমেদকে খুঁজব এখন।'

'আমরা এক মিনিটের মধ্যে এনগেজ করব,' জানাল অনিল। 'আপনারা ফেরার সময় কোনও বাধা পাবেন না। অ্যাণ্ড... গুড লাক।'

রেডিয়ো অফ করল উর্বশী, সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল জাহাজের পাশে—ভাবছে ডেকে উঠবে কী করে। তারপর নাক কাটা বো-র দিকে পিস্তল ও রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেল। কয়েক সেকেণ্ড পর তিনটে দেহ রেইলিং টপকে খসে পড়ল। দু'জনের পরনে ওয়েট স্যুট, বাকি জন কমব্যাট ইউনিফর্ম পরা। প্রথম দু'জন বোধহয় রানা ও মিস্টার আহমেদ, ভাবল উর্বশী। কিন্তু তৃতীয়জন কে? বুক-কোমর-নিতম্বের বাঁক দেখে মনে হলো কোনও মেয়ে! ঠোঁট বাঁকাল উর্বশী, রানা দেখছি এই বিপদেও সঙ্গিনী যোগাড় করে নিয়েছে!

দেহ তিনটে পানিতে পড়বার একটু পরেই রেইলিঙে এসে থামল দু'জন গার্ড, পলাতকদের খুঁজছে। লোকগুলো আছে উর্বশীর রেঞ্জের বাইরে, কাজেই নিঃশব্দে তাদের দিকে সাঁতার কেটে এগোল ও। নীচের দিকে একটা ক্যাটওয়াক ছাউনি প্রায় ঘিরে রেখেছে, ওটা জোয়ারের স্রোতের একটু উপরে—ওটার তলা দিয়ে এগিয়ে চলল উর্বশী। দু'বার রানাদের ভেসে উঠতে দেখল। মেয়েটাকে কেন যেন চেনা-চেনা লাগল! ওরা একটা খোলা স্টেয়ারওয়েলের দিকে চলেছে। উর্বশী বুঝল, রানা ও সোহেল রিব্রিদারগুলো ওদিকেই রেখেছে।

গার্ডরা পানিতে গুলি করছে, কিন্তু আসলে জানে না পলাতকরা কোথায়। উর্বশী জানে, রানারা ডুব দেওয়ার পর অন্তত এক মিনিট পার হয়ে গেছে। রানা দু'মিনিটের বেশি দম রাখতে পারে। মিস্টার আহমেদ বা মেয়েটা? এতক্ষণে রানার ড্রেইগার সেটের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কোথায় ও?

রেডিয়োতে মিস্টার চ্যাটার্জির কণ্ঠ শুনতে পেল উর্বশী। তিনি জানিয়ে দিলেন এনগেজ করছেন। পরমুহূর্তে মার্ভেলের ফোর কোয়ার্টার থেকে চল্লিশ এমএম অটোমেটিক ক্যাননগর্জে উঠল।

ছাউনির গার্ডরা কামানের শব্দ খেয়াল করেনি, সম্পূর্ণ মনোযোগ রেখেছে স্টেয়ারকেসের নীচের দশ ফুট বৃত্তে, নিয়মিত পানি ফুটো করছে। ওখানে কিছু একটা দেখেছে তারা। উর্বশী কমব্যাট বুট পরে আছে, সুইম ফিন নেই, কিন্তু দু'পায়ের জোরে দেহ প্রায় কোমর পর্যন্ত তুলে ফেলল, এক টানে কাঁধে **M-4A1**

তুলে নিল। মাধ্যাকর্ষণের টানে পানিতে ডুবে যাওয়ার আগেই তিন রাউণ্ড গোলা পাঠিয়ে দিল ও। এক গার্ডের একে-ফোরটিসেভেন ছিটকে পড়ল, দ্বিতীয় গার্ডের মাথা লালচে কুয়াশা হয়ে গেল।

ভারী অস্ত্র নিয়ে ঝুপ্ করে ডুবে গেল উর্বশী, অপেক্ষা করল। জাহাজের ডেকে আরও গার্ড থাকতে পারে, পানিতে গুলি ছুঁড়বে হয়তো। কিন্তু তার বদলে চমকে গেল, কেউ ওর এক গোড়ালি খপ্ করে ধরেছে! পা ছুঁড়ে ভেসে উঠতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু জোর করে নিজের মন নিয়ন্ত্রণ করল।

সম্ভবত রানাই, ওর মুখে রেগুলেটর মাউথপিস গুঁজে দিল! দু'বার দম নিল উর্বশী, কৃতজ্ঞ বোধ করল। অক্সিজেনটুকু ওর দরকার ছিল—রেগুলেটর ফিরিয়ে দিল ও। ওটার মালিক আরও কাউকে দিল! একটা ধাতব হাত স্পর্শ করল উর্বশী। চট্ করে বুঝে গেল রানা ও মিস্টার আহমেদ একসঙ্গে আছে। মেয়েটা কোথায়? হাত ধরে কে যেন ইঙ্গিত করছে, বুঝিয়ে দিল এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। তিনজনের এই অদ্ভুত দল পাশাপাশি এগোল, কেউ এখন নিয়মিত ভাবে সাঁতার কাটছে না। একটু পরপর রেগুলেটর পরস্পরকে দিচ্ছে। ওরা মিনিট পাঁচেক সাঁতার কেটে জাহাজের স্টার্নের কাছে চলে এল। এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

আরও দশ মিনিট পর ওরা ছাউনির দরজার কাছে চলে এল, ক্যাটওয়াকের তলায় ভেসে উঠল। মিস্টার সোহেলের কাটা হাত ও কপালের অবস্থা দেখে থমকে গেল উর্বশী।

'একেবারে ঠিক সময় এসেছেন, উর্বশী,' বলল সোহেল। 'মনে হয় গার্ডরা আমার ফিন দেখে ফেলেছে, নইলে টের পেত না কোথায় আছি।'

'আরও গার্ড আছে?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী।

'না বোধহয়,' বলল রানা। 'মুদাস্সর খান পালিয়েছে, ওর সঙ্গে ওই দু'গার্ড ছিল। তুমি ওদের ঠেকিয়েছ।'

আরেকটা নারী কণ্ঠ বলল, 'কিন্তু মুদাস্সর আলী খানের কী হবে?' ক্যাটওয়াকের নীচে এগিয়ে এসেছে জুডি, অপেক্ষা করছিল সঙ্গীদের জন্য। 'এবার আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। এদের আরও লোক আসতে পারে।'

মেয়েটা সুযোগ পেয়েও পালিয়ে যায়নি। উর্বশী মনে মনে ওর প্রশংসা করল। সাহস আছে! ট্যাকটিকাল রেডিয়োতে বলল ও, 'মার্ভেল, অ্যাসল্ট ওয়ান বলছি। রানা, মিস্টার আহমেদ আর সঙ্গে এক মেয়ে আছে, যাকে আমরা অ্যাভালাঞ্চ থেকে উদ্ধার করেছি। জোডিয়াক আমাদের তুলে নিলে ভাল হয়।'

'অপেক্ষা করতে হবে। এখনও একটা ইউটিলিটি বোট রয়ে গেছে। আমরা ওটাকে আকাশ থেকে ট্র্যাক করছি এখন, তবে খতম করতে খানিক সময় লাগবে।'

উর্বশীর কাছ থেকে হেডসেট নিল রানা। 'নেগেটিভ, মার্ভেল। মুদাস্সর আলী খান পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ওকে দরকার।'

'বেশ, রানা,' বলল অনিল। 'তোদের জন্য জোডিয়াক পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আড়াই মিনিট পর ওয়্যারহাউজের ফটক পেরল ওরা, বেরিয়ে এল সাগরে। রিব্রিদার ফেলে রেখে এসেছে। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর জোডিয়াক হাজির হলো—ইঞ্জিন মৃদু মৃদু গর্জন করছে। কমাণ্ডোরা ওদের জোডিয়াকে টেনে তুলল। রানা পুরোপুরি উঠে বসবার আগেই থ্রটল খুলল কাশেম, গতি তুলে ঢেউয়ের উপর দিয়ে দ্রুত এগোল।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পেল, তারপরই সৈকত থেকে ওদের দিকে শুরু হলো গুলি—অন্ধকারে মনে হলো ওদিকে জোনাকি জ্বলছে। সৈকতের দিক থেকে সরে গেল কাশেম, উল্টোদিকে ছুটল। ওদিকে আছে মার্ভেল, ওটা শেষ বোট খুঁজে বের করবে। অন্য তিনটে বোট এখন জ্বলন্ত ধ্বংস-স্তূপ, একটু পরে সাগরে ডুবে যাবে। চতুর্থ বোট সম্ভবত জং-ধরা জাহাজগুলোর মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে।

জোডিয়াকের বো-এ চলে এল রানা, হাতের ইশারায় কাশেমকে দেখিয়ে দিল কোন্ পথে পরিত্যক্ত জাহাজগুলোর মধ্য দিয়ে এসেছে। এক কমাণ্ডোর কাছ থেকে নাইট ভিশন গগলস্ ধার নিল রানা। দু'পাশে অসংখ্য জাহাজ, ওগুলোর গায়ে আউটবোর্ড ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। চারপাশে এত জাহাজ যে মনে হলো ওরা একটা গোলকধাঁধায় ঢুকেছে। দ্রুত গতির কারণে দৃশ্যটা অদ্ভুত লাগছে। কাশেম মাসুদ ভাইয়ের দেখানো হাত অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। ডানে পড়ল একটা সুপারট্যাঙ্কার, ওটা দৈর্ঘ্যে অন্তত এক হাজার ফুট। বামে আছে দুটো গাড়ি পার করবার ফেরি—যে-কোম্পানি ওগুলো দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করত, সেই কোম্পানির নাম এখনও লেখা।

দ্বিতীয় ফেরির বো-র কাছে পৌঁছে গেল ওরা। বামে অর্ধেক ডুবে যাওয়া একটা টাগ-বোট ও কন্টেইনার শিপ। এবার বাঁক নিতে যাবে, এমনসময় শেষ ইউটিলিটি বোট আরেকটা জাহাজের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কমাণ্ডোরা সুযোগ নিল, বোটের সারাদেহে গুলি বর্ষণ করল।

দ্রুত ঘুরিয়ে নেয়া হলো বোট, জোডিয়াকের পিছু নিয়ে তেড়ে আসছে এবার। উপসাগরে জোয়ার আসছে, ঢেউগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। দুই নৌযান নাচছে স্রোতে, কারও পক্ষেই নিখুঁত ভাবে গুলি করা সম্ভব নয়। শান্ত সাগরে জোডিয়াক অনায়াসে ভারী ওয়ার্ক বোটকে অনেক পিছনে ফেলে দেবে, কিন্তু জোয়ারের খ্যাপা ঢেউ এখন দুই নৌযানকেই সমান সুযোগ করে দিল।

বারবার কাশেম পরিত্যক্ত জাহাজের আড়াল থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়তে চাইছে, কিন্তু ইউটিলিটি বোট বারম্বার এগিয়ে এসে বাধা দিচ্ছে। জোডিয়াকটা জাহাজগুলোর কোনও ফাঁক খুঁজে নিয়ে মার্ভেলে পৌঁছে গেলে আর কোনও সমস্যা হবে না।

হঠাৎ আউটবোর্ড ইঞ্জিন কেশে উঠল। মুহূর্তের জন্য গতি কমল, তারপর আবারও সিলিণ্ডারগুলোর কাজ শুরু হলো। কাশেম ঘুরে ইঞ্জিনের কাউলিঙে হাত রাখল, বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিল। ওর হাত একটা বুলেটের গর্ত খুঁজে পেয়েছে। আঙুলে কী যেন লাগল। দু' আঙুলে জিনিসটা মেখে দেখল। ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মাসুদ ভাই, গ্যাস ট্যাঙ্ক ফুটো করে

দিয়েছে। ইঞ্জিন কতক্ষণ চলবে জানি না। ইঁদুর-বিড়াল খেলা বোধহয় শেষ!'

ওরা আবারও বাঁক ঘুরল। আপাতত ইউটিলিটি বোট তেড়ে আসছে না। কিন্তু কখন কোনদিক থেকে আবারও ধেয়ে আসবে বলা যায় না। খানের লোক ওদের মার্ভেলের দিক থেকে তাড়িয়ে সরিয়ে দিয়েছে। অসংখ্য জাহাজের গোলকধাঁধায় ঘুরছে ওরা।

'ওরা কি তীরের দিকে গেছে?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

'মনে হয় না,' বলল রানা। পরমুহূর্তে বোটটা বিরাট একটা কমার্শিয়াল ফিশিংম্যানের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।

জোডিয়াকের দিকে অসংখ্য গুলি ছুটে এল। বুলেটগুলো চারপাশের সাগরে গাঁথছে। কাশেম ইঞ্জিনের কাছ থেকে আরও আধ নট আদায় করতে ব্যস্ত। নাকে পোড়া গন্ধ পেল, কাউলিঙের ভিতরে ফিউল পুড়ছে। শয়তানদের বুলেট গ্যাস ট্যাঙ্ক তো ফুটো করেছেই, আরও কোনও ক্ষতি করে দিয়েছে। এঁকেবেঁকে ফেরিবোটগুলো আবারও পার হলো ওরা।

ঠিক তখন একটা জিনিস খেয়াল করল রানা। 'কাশেম, ওই অর্ধেক ডোবা টাগ-বোটের কাছে নিয়ে চলো তো! একটা বুদ্ধি এসেছে!'

জোডিয়াক লাফাতে লাফাতে ছুটল অন্ধকার জাহাজের দিকে। টাগ-বোট যেখানে আছে সেখানে সাগরের তলায় কিছু আছে, যে-কারণে ওটার বো নাক তুলে আছে। জাহাজের পিছনের ডেক ডুবে গেছে পানিতে। ওখানে আছে একটা ভাঙা, পড়ি-পড়ি ক্রেন। চাঁদের আলোয় ওটা প্রায় দেখাই যায় না।

রানা বলে দিল কোনদিক দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, নিজেও খেয়াল করছে জায়গাটা। দুনিয়ার আর সব ভুলে গেছে। বোটের গুলির কথাও মনে নেই। বুঝতে পারছে, ওরা মাত্র একবার সুযোগ পাবে। দু'হাত দু'পাশে প্রসারিত করল রানা, শেষ কয়েক সেকেণ্ডে সামান্য কোর্স পাল্টাতে বলল। কাশেম সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করল। হালকা হাতে জোডিয়াকের হুইল নিয়ন্ত্রণ করল ও।

'ঠিক আছে, গতি কমিয়ে দাও,' বলল রানা। 'ওরা তেড়ে আসুক।'

পাগলাটে নির্দেশটা শুনল সবাই, ভুরু কুঁচকে গেল জুডির, তবে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলল না। জোডিয়াকের গতি মন্থর হয়ে গেল। বোট ছিল সত্তর ফুট পিছনে, কিন্তু দ্রুত এগিয়ে আসছে। লোকগুলো কী করে যেন টের পেয়েছে বিজয় পাওয়ার সময় হয়ে গেছে। বোটের পাইলট থ্রটল খুলে দিল, এবার তারা শিকার হাতে পেয়ে গেছে, জোডিয়াক ডুবিয়ে দেবে!

রানা প্রতিমুহূর্তে কাশেমকে গতিপথ বলছে। আর কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ওরা ভাঙা টাগ-বোটের পিছনে পৌঁছে যাবে। কাঁধ ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল রানা। ইউটিলিটি বোট ছুটে আসছে, লোকগুলো শেষ মুহূর্তের জন্য তৈরি হচ্ছে—এর পরেই হাঙরের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, মনে মনে বলল রানা। আরেকবার ঘুরে বোট দেখল। আর দু'সেকেণ্ড। এবার! হাতের ইশারা করল ও, 'কাশেম, পোর্টে ঘুরে যাও!'

জোডিয়াক দ্রুত ছুটল টাগের ভাঙা ক্রেনের তলা দিয়ে। অপেক্ষাকৃত অনেক

বড় ইউটিলিটি বোট, তেড়ে এল জোডিয়াকের দিকে। ওটার পাইলট বোঝেনি তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

'এবার সবাই মাথা নিচু করে বসে পড়ো!' চিৎকার করে বলল রানা। ওদের জোডিয়াক ডুবে থাকা টাগের রেইলিং পেরিয়ে গেল, ছুটল নষ্ট ক্রেন-বুমের তলা দিয়ে। বুমটা তিন ফুট উপরে রইল, মাথা নিচু না করলে ইস্পাতের ডেরিক ওদের মাথা ফাটিয়ে দিত।

তলা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা। ঘুরে তাকাল রানা। ইউটিলিটি বোট তেড়ে আসছে এখনও, তবে শেষ মুহূর্তে হেলম্‌স ম্যান ক্রেনটা দেখতে পেল। বনবন করে হুইল ঘোরাল সে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। বোট অনেক বেশি জোরে চলছে। নৌযানটা সরাসরি ক্রেনের উপর আছড়ে পড়ল—ইস্পাতের বুম ফাইবার-গ্লাসের খোল চুরমার করল। বোটের মাথা থেকে শুরু করে লেজ পর্যন্ত চিরে গেল। বড়সড় ট্যাঙ্কের একটা মাউন্ট থেকে উপড়ে এল।

চুরমার হওয়া বোটের লোকরা বুঝতে পারেনি কী ঘটছে, হঠাৎ দ্রুতগতি থেমে যাওয়ায় তারা বো থেকে ছিটকে গিয়ে সাগরে পড়ল। তবে একজনের কপাল মন্দ, ক্রেনের বুমে মাথা দিয়ে পড়েছে সে, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

প্রচণ্ড আঘাতে বোটের একটা ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে, ওটার ডিজেল পড়ছে খোলের ভিতরে। ওগুলো সাগরের পানিতে মিশে যাওয়ার আগেই নষ্ট ইলেক্ট্রিকাল সিস্টেম থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ বের হলো। সঙ্গে সঙ্গে ডিজেল বিস্ফোরিত হলো, বোট একটা কমলা রঙের গোলাকার আগুনে পরিণত হলো। কালো ধোঁয়া বোটের চারপাশ ঘিরে নিল।

'শেষ ইউটিলিটি বোট আর নেই, মার্ভেল,' ট্যাকটিকাল রেডিয়োতে বলল রানা। 'আমরা বাড়ি ফিরছি।'

পাঁচ মিনিট পর পরিত্যক্ত জাহাজের কবর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের জোডিয়াক মার্ভেলের একশো ফুট দূরে থেমেই গেল, বাকি পথ বৈঠা বাইতে হলো। জোডিয়াকের মোটর থেমে যাওয়ায় ওরা সৈকত থেকে খানের লোকজনের অস্ত্রের আওয়াজ পেল। তারা বোকার মত খামোকা অন্ধকার সাগরে গুলি ছুঁড়ছে।

গ্যারাজের পাশে পৌঁছে গেল জোডিয়াক, এক ডেক-হ্যাণ্ডের দিকে দড়ি ছুঁড়ে দিল রানা। বাহন ছেড়ে নেমে পড়ল ওরা, ওটা র‍্যাম্পে তোলা হলো। কমাণ্ডোরা অপেক্ষা করছে, ওরা জানে ওদের কাজ শেষ হয়নি।

গ্যারাজে ঢুকল ডক্টর ফারা, সঙ্গে একটা নতুন হাত। নষ্টটা খুলে ওটা আটকে দিল সোহেলের কাঁধে। আসবার পথে সোহেল রেডিয়ো করেছে, যেন আরেকটা দেয়া হয়। কাঁধ পরীক্ষা করে দেখল ফারা। কোথাও জখম হয়নি, তবে পেশি প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে, লাল হয়ে গেছে চামড়া। দেখা শেষে ফারা জানাল কাঁধের ব্যথা কয়েকদিন থাকবে, আর কিছু না। এবার ও পড়ল সোহেলের কপাল নিয়ে, কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে হয়েছে?' পেনলাইট দিয়ে ক্ষতটা দেখছে।

'ওরা রাইফেল দিয়ে মেরেছে!' শিশুর মত কাঁদো কাঁদো গলায় বলল সোহেল।

হেসে ফেলল ফারা। চোখে আলো ফেলে দেখল কংকাশন হয়েছে কি না।

মনে হলো অবাক হয়েছে সোহেলকে স্বাভাবিক ভাবে পলক ফেলতে দেখে। শেষে বিরক্ত স্বরে বলল, 'তোমার মাথাটা কামানের গোলার মত। শরীর কেমন লাগছে? ঝিমঝিমানি? চিন্তাগুলো উল্টোপাল্টা লাগছে? বমি-বমি ভাব, বা মাথা ঘোরা?'

'কিছুই না। তবে লবণপানি লেগে কপাল জ্বলছে।'

'আচ্ছা? আর কিছুই না?' ফারা বুঝতে পারছে আর সব পুরুষের মত সোহেলও চুপচাপ ব্যথা সহ্য করছে, মুখে কিছুই বলবে না। ওর কনুইয়ে ও কপালে আচ্ছামত অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মেখে দিল ফারা। এবার জ্বলুনি সহ্য করতে দু' ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সোহেল। ব্যাণ্ডেজ শেষে বলল ফারা, 'ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্রাম নাও গিয়ে।'

'আমার কাজ শেষ হয়নি,' বলল সোহেল। চট্ করে রানাকে দেখল, আশা করছে বন্ধু ওকে উদ্ধার করবে।

'যা শুয়ে পড় গিয়ে, ডাক্তারের কথা মানতে হয়,' নিষ্ঠুরের মত বলল রানা।

'কিন্তু আমি...' সোহেলকে থামতে হলো, চোখ পাকিয়ে রানাকে দেখল।

সোহেলের কথা পাত্তাও দেয়নি ফারা, হাতের ইশারায় দরজা দেখিয়ে দিল। সাফ কথা, সোজা কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম করো, যাও!

মনে মনে রানাকে জোরে কানমলা দিয়ে নিজের কেবিনের দিকে রওনা হয়ে গেল সোহেল।

জুডির দিকে তাকাল ফারা, 'বলো তো তুমি এখানে কেন, মিস স্টিভেনসন! নাকি প্রশ্ন করা উচিত হবে না?'

'ও লণ্ডনের লয়েডস-এ আছে,' বলল রানা, 'জাহাজ চুরির রহস্য উদ্ধার করতে এসেছে। ইনশিওরেন্স বাবদ প্রচুর টাকা গচ্চা যাচ্ছে ওদের।'

হাত বাড়িয়ে দিল জুডি। হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ফারা, মৃদু হেসে বলল, 'আর আমি ভেবেছিলাম তুমি গুরুতর অসুস্থ!' তোয়ালে বাড়িয়ে দিল ও। 'এখন কি ডাক্তার দরকার?'

তোয়ালে নিয়ে চুল মুছল জুডি। 'থ্যাঙ্কস্, না, ডক্টর। একটু আগে খুব ভয় পেয়েছিলাম, এখন পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছি।'

উর্বশী কখন যেন চলে গেছে, এইমাত্র আবারও গ্যারাজে এসে ঢুকল। পোশাক পাল্টেছে, ঘুরে এসেছে অপারেশন্স সেন্টার থেকে। ও কিছু বলবার আগেই রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী করছে ওরা?'

'বিচ থেকে গুলি ছুঁড়ছে এখনও,' কাঁধ ঝাঁকাল উর্বশী। 'সব ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র। সঙ্গে আরপিজি নেই। ...ক্যাপ্টেন সিরাজ ইউএভি দিয়ে কম্পাউণ্ডে চোখ রেখেছেন। করাত থামার পর এক লোক ওয়্যারহাউজ থেকে বেরিয়ে গেছে, একটা জিপে উঠে দ্রুত চলে গেছে এক মাইল দূরের বাংলোগুলোতে। ওগুলোর একটার পাশে হেলিপ্যাডে চপার আছে; তবে রওনা হয়নি ওটা।'

'আর আমাদের হেলিকপ্টার? ওটা তৈরি?'

'ক্রুরা রেডি,' বলল উর্বশী। 'নির্দেশ পাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে রবিনসন উড়বে।'

'তা হলে ক্যাপ্টেন সিরাজকে জানিয়ে দাও উনি যেন ইউএভিটা নামিয়ে আনেন। ওঁকে আমাদের দরকার। রওনা হবো। মুদাস্‌সর খানকে জ্যান্ত ধরতে পারলে অনেক ইনফরমেশন্ পাওয়া যাবে।'

'তা তো বটেই,' বলল উর্বশী। 'তোমরা ফিরলে সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুম থেকে তুলব আমি। খানের সঙ্গে কারা এসবে ছিল সব বেরিয়ে আসবে। ব্রেকার্স ইয়ার্ডে এখন নেভি বা কোস্ট গার্ডের রেইড দরকার।'

'বস্‌,' খোলা সার্কিটে হঠাৎ আতাসির কণ্ঠ শোনা গেল। একটু কাঁপছে ওর গলা। 'বস্‌, আল্লাহর কসম, শুনুন! আমরা মিস্টার ফু-চুঙের ট্র্যান্সপণ্ডার থেকে সিগনাল পেয়েছি!'

'কখন?'

'এইমাত্র, বস! দুই সেকেণ্ড আগে!'

'ও কোথায়?'

'ভাবতে অবাক লাগছে,' একটু ইতস্তত করল আতাসি। 'রাশা, বস্‌! কামচাটকা পেনিনসুলার পশ্চিম তীরে! আল্লাহ্‌ জানেন ওখানে কী করে গেলেন উনি! আমি তো জানতাম আদম-ব্যাপারিরা ইউএসএ বা জাপানে লোক পাঠায়।'

অপেক্ষা করছে আতাসি, কিন্তু কোনও কথা বলছে না রানা। আশপাশের কারও দিকে তাকিয়ে নেই ও। মনে হলো চিন্তায় হারিয়ে গেছে। পরিকল্পনা আঁটছে, মার্ভেলের গতি নিয়ে চিন্তা করছে, কামচাটকার দূরত্বটাও জরুরি—সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ওদের মিশনে কোন্‌টার পর কোন্‌টার গুরুত্ব।

ফু-চুংকে দ্রুত উদ্ধার করতে হবে, আবার মুদাস্‌সর আলী খানকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

দুটোই জরুরি।

ফু-চুং নিশ্চয়ই ওখানে একা নেই, আরও বহু মানুষ আটকা পড়েছে। তাদের উদ্ধার করতে হবে। ওখানে খারাপ কিছু ঘটছে। সেটার সঙ্গে মুদাস্‌সর আলীর সম্পর্ক? ওই ইবলিশটা মানুষ যোগাড় করছে, ট্র্যান্সপোর্টেশনও ধার দিয়েছে। তার ড্রাই-ডকগুলো মানব-পাচারের কাজে ব্যস্ত। কোনও জাহাজ থেকে সেটা দেখা গেলেই তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। শয়তানটা যা খুশি তা-ই করছে! এতদিনে একটু আন্দাজ করা যাচ্ছে হারানো মানুষগুলো যাচ্ছে কোথায়। তাদের কি কামচাটকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কোনও একটা বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে সেখানে। মুদাস্‌সর আলীর বিরাট নেটওঅর্ক রয়েছে। তারা সহজেই সস্তা শ্রমিক যোগাড় করছে। এদের ঠেকাতে না পারলে আরও হাজার হাজার মানুষ ফাঁদে পড়বে, হারিয়ে যাবে চিরতরে।

'সস্তা শ্রম,' আনমনে বলল রানা।

'কিছু বললে?' জানতে চাইল জুডি। ভেজা জ্যাকেট খুলে ফেলল ও, তলায় পাতলা একটা টি-শার্ট, কাঁধে একটা তোয়ালে। ওটা মেয়েটির স্তন যুগল মোটেই ঢাকেনি, কিন্তু সে-ব্যাপারে সচেতন নয় মোটেও। চারপাশ দেখছে জুডি, বুঝতে পারছে এই জাহাজ কোনও গোপন অপারেশনে ব্যবহৃত হচ্ছে। আশপাশের এই মানুষগুলো সাধারণ কেউ নয়।

'ওখানে ওরা সস্তা শ্রম সংগ্রহ করে, মানুষগুলো আসলে ক্রীতদাস,' বলল রানা। 'যে-রাতে আমরা তোমাকে উদ্ধার করি, সে-রাতে একদল জলদস্যু আমাদের উপর হামলা করেছিল। ট্রলারটা ডুবিয়ে দিই আমরা। ওদের ট্রলারে একটা কন্টেইনার ছিল। ভেতরে অনেক মানুষ ছিল। তাদের সময়মত উদ্ধার করতে পারিনি, ডুবে মারা গিয়েছিল। কন্টেইনার তুলে আনি আমরা। একজনের কাছ থেকে একটা ডায়ারি পাওয়া যায়। সেই সূত্র ধরে আমার এক বন্ধু চিনে যায়। নিজেকে ও আদম-ব্যাপারিদের হাতে তুলে দেয়। এখন জানা যাচ্ছে ওকে কামচাটকা পেনিনসুলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'লয়েড্স্-এর আমরা ধারণা করছিলাম মুদাস্সর আলী খান এদিকের সাগর থেকে জাহাজ সরিয়ে নিচ্ছে,' বলল জুডি। 'তদন্ত করে আমার মনে হয়েছে এখানকার ফ্যাসিলিটি বেআইনী কাজে ব্যবহার করা হয়। আজ রাতে গিয়ে প্রমাণ পেলাম।'

'মুদাস্সর আলী আরও বড় ব্যাপারে জড়িত,' বলল রানা। 'ওরা দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে লোভ দেখিয়ে অনেক মানুষ নিয়ে গেছে কামচাটকা পেনিনসুলায়। দ্য চুহার মত প্রকাণ্ড জাহাজ যাদের লাগে তারা কত মানুষ নিয়েছে বোঝা যায়।'

'ধরে নিলাম মানুষগুলো এখন ক্রীতদাস। কিন্তু এরা এত লোক নিয়ে কী করবে?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

'যে-কোনও কিছু হতে পারে,' ইন্টারকমের পাশে থামল রানা, বাটন টিপল। 'গগল, একটু পর তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। মার্ভেলের ফুলস্পিড তুলবে। কামচাটকা পেনিনসুলায় গিয়ে ফু-চুংকে খুঁজে বের করবে। এদিকে কাশেম আর জলিলকে নিয়ে আমি মুদাস্সর আলী খানের পেছনে যাব।' একমুহূর্ত থামল রানা, তারপর বলল, 'তোমরা পৌঁছে যাও, আমরা প্লেনে আসছি পেদ্রোপাভ্লোভস্ক-এ।'

'সম্ভব নয়, রানা,' খোলা সার্কিটে অনিলের কণ্ঠ ভেসে এল। 'ফু-চুং কোথায় আছে জানার পর ইন্টারনেটে ঢুকেছি আমি। রাশান গভার্নমেন্ট থেকে জানানো হয়েছে ওরা ওখানে মেজর ভলকানিক ইভেন্টের আশংকা করছে। ওখানে এত ছাই পড়ছে যে ওরা এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছে।'

চেপে রাখা শ্বাস ফেলল রানা। 'ঠিক আছে, কিন্তু বসে থাকব না আমরা। তোরা রওনা হয়ে যা।'

'মুদাস্সর আলী খানের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল সোহেল। ও অপারেশন্স সেন্টারে হাজির হয়ে গেছে।

'পারলে ধরে আনব,' বলল রানা। 'তোরা মার্ভেলের পুরো গতি তুললে আধঘণ্টায় রবিনসনের রেঞ্জের বাইরে চলে যাবি। তার আগেই আমরা ফিরে আসব।'

'একটা কথা বলব?' পাশ থেকে বলল জুডি।

ঘুরে তাকাল রানা।

'আমি ওই ফ্যাসিলিটি ভালমত ঘুরে দেখেছি। খানের জায়গাটা বিশাল। গত এক সপ্তাহ ধরে ওটার ওপরে চোখ রেখেছি, কিন্তু পুরোটা দেখা হয়ে ওঠেনি।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'তুমি মাত্র তিরিশ মিনিটে মুদাস্‌সর আলীকে খুঁজে পাবে না। তবে আমি সঙ্গে গেলে দেখিয়ে দিতে পারব খানের বাড়ি কোনটা।'

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল রানা। জুডি স্টিভেনসন প্রায় অপরিচিত একজন, কিন্তু মেয়েটার চোখে অনড় আত্মবিশ্বাস ও নির্ভেজাল সততা আছে, যেন নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে রানা মেয়েটির চোখে। কিছুক্ষণ আগে বিপদে পড়েছে জুডি, জানে আবারও বিপদে পড়তে পারে—কিন্তু সাহস হারাবে না। ডুবে যাওয়া অ্যাভালাঞ্চে হাল ছাড়েনি। ওকে সঙ্গে নেয়া যায়।

'চলো তা হলে,' বলল রানা।

জুডি ভেবেছিল রানা আপত্তি করবে। ওর নীল চোখে বজ্র-মেঘ লুকিয়ে ছিল, কিন্তু রানা রাজি হয়ে যাওয়ায় একটু থতমত খেল, দু'ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে গেল।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাপড় পাল্টে অস্ত্র নিয়ে তৈরি হতে হবে,' বলল রানা। 'এসো আমার সঙ্গে। কাশেম, তুমিও এসো। স্নাইপার হিসেবে থাকবে সঙ্গে।'

রবিনসন আর-ফোরটিফোর হাইড্রোলিক প্যাড থেকে আকাশে উঠে যেতেই বাঁক নিল মার্ভেল। গগলের নির্দেশে চারটে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিন প্রায় বিমানের গতি তুলল। তার আগেই অনিল ওদের হেলিকপ্টারকে কাভার দেওয়ার জন্য সৈকতে গ্যাটলিং গান দাগল। কয়েক সেকেণ্ডে খানের লোকজন জান-প্রাণ নিয়ে পালাল।

ক্যাপ্টেন সিরাজ রবিনসনের বাম পাশের সিটে বসেছে। পাশে রানা। পিছনের বেঞ্চ সিটে জুডি ও কাশেম। প্রত্যেকে দরকারি ইকুইপমেণ্ট নিয়েছে, সঙ্গে যার-যার পছন্দের অস্ত্র। কাশেমের কোলে একটা .৫০ ক্যালিবারের বেরেটা স্নাইপার রাইফেল। ছোট্ট হেলিকপ্টারে ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে ওরা। ক্যাপ্টেন সাগর বেড় দিয়ে থাকা সৈকতের দিকে গেলেন না, ইয়ার্ডের অনেকখানি জায়গা এড়িয়ে উত্তর দিকে চললেন।

'সৈকতের এক মাইল পরে আছে একটা কম্পাউণ্ড,' হেলোর ইন্টারকমে বলল জুডি। 'কর্তৃপক্ষ ওখানে বাস করে। গত এক সপ্তাহ ওখানে চোখ রেখেছি। অন্য বাংলোগুলোর চেয়ে অনেক বড় একটা বাংলো আছে—ওটাই মুদাস্‌সর আলী খানের।'

'কতজন গার্ড থাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অন্তত দশজন। তবে রাত বারোটার পর ওখানে কম গার্ড থাকে। আমরা এখন হামলা করলে ওরা সুবিধে করতে পারবে না।'

রানা বুঝতে পারছে আজ রাতে ওরা সতর্ক থাকবে। 'ওই বাংলোতে যাওয়ার পথ কোনটা?'

'উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে একটা রাস্তা, মুদাস্‌সর আলীর বাংলো তার বামে।'

'রাস্তায় গাড়ি চলাচল কেমন?'

'লরি যায়-আসে, ওগুলো জাহাজের প্লেট নিয়ে স্টিল প্ল্যান্টে পৌঁছে দেয়।

তবে সন্ধ্যার পর ওগুলো কমই চলে।'

'ঠিক আছে, আমরা চলে এসেছি,' বললেন সিরাজ। রবিনসনের নাকে বসে থাকা নাইট ভিশন ক্যামেরার সঙ্গে সংযুক্ত আছে তাঁর হেলমেট। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। 'মিস স্টিভেনসন যে জায়গার কথা বলেছে, সেটা সামনেই। প্রচুর বাতি জ্বলছে। লোকজন গিজগিজ করছে। প্রায় সবার হাতে অস্ত্র।'

'ওদের রেঞ্জের বাইরে থাকুন। দেখতে চাই কী করে।'

'কম্পাউন্ডের ওপাশে একটা প্যাড আছে,' বললেন সিরাজ। 'ওখানে একটা জেটরেঞ্জার বসে আছে। এইমাত্র ওটার রোটর ঘুরতে শুরু করল।'

'আমরা ওটার পিছু নিতে পারব?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

'জেটরেঞ্জারের গতি আমাদের চেয়ে অন্তত চল্লিশ নট বেশি,' বলল রানা। 'রেঞ্জও বেশি, আমাদের চেয়ে একশো মাইল দূরে যাবে।' ঘাড় ফিরিয়ে কাশেমকে দেখল। 'কী মনে হয়, কাশেম?'

স্নাইপার হিসেবে এসেছে আবু কাশেম। লাজুক হাসল। 'মাসুদ ভাই, পারব। আমি না পারলে আপনি তো আছেনই!'

'এটুকু জায়গায় বসে? পারব না!'

'লজ্জা দেবেন না, মাসুদ ভাই।' গম্ভীর হয়ে গেল কাশেম, কাঁধ থেকে হার্নেস খুলে ফেলল। 'ক্যাপ্টেন, আমাকে স্থির রাখুন।' দরজা খুলে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে কেবিনের সবাই রোটর থেকে ছুটে আসা প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা খেল।

বেরেটা রাইফেলটা দেখতে বিশ্রী, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট। ওজনটা অতিরিক্ত, তবে এক্সপার্টের হাতে পড়লে ওটা জাদু দেখাতে পারে। .৫০ ক্যালিবারের আধ ইঞ্চি ব্যাসের বুলেটগুলো একমাইল দূরে ঠিক জায়গায় আঘাত হানতে সক্ষম।

সিরাজ রবিনসন ঘুরিয়ে নিলেন। এবার দরজা থেকে সরাসরি জেটরেঞ্জার দেখা যাবে। দু'চারজন গার্ড ঝুলন্ত রবিনসনকে গুলি করল, কিন্তু তারাও জানে দূরত্ব অনেক বেশি। কাশেম বিরাট রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল, নাইট ভিশন স্কোপের সাইটে চোখ রাখল। অপটিক্স-এ দুনিয়াটা সবুজ লাগল, মনে হলো খুব কাছ থেকে সব দেখা যাচ্ছে। গার্ডদের চেহারায় অসন্তোষ, চপারের দিকে গুলি করছে তারা, কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে এত দূর থেকে গুলি করে কোনও লাভ নেই। চারপাশ দেখল কাশেম, তারপর মনোযোগ দিল বসে থাকা জেটরেঞ্জারের উপর। পরিষ্কার দেখা গেল, ওটার টারবাইন থেকে এক্সজস্ট বেরিয়ে আসছে, তপ্ত বাতাস সরে যাচ্ছে।

কাশেমের রাইফেল কামানের মত গর্জন ছাড়ল। কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করল ও, কিন্তু সাইট থেকে চোখ সরাল না। গার্ডরা রাইফেলের গর্জন শুনবার আগেই বুলেট পৌঁছল, তারা টের পাওয়ার আগেই ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। বিস্মিত হওয়ার আগেই তাদের সর্বনাশ হলো। জেটরেঞ্জারের রোটর দণ্ডটা হেলিকপ্টারের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা, বুলেট ওখানে গিয়ে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে ঘুরন্ত দণ্ড থেকে খসে গেল রোটর। প্রকাণ্ড দুটো কাঁচির মত ছিটকে গেল রোটরগুলো। একদল গার্ড শোল্ডার-ফায়ার্ড মিসাইল নিয়ে কাজ করছিল, এক জোড়া রোটর তাদের উপরে গিয়ে পড়ল, লোকগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দৃশ্যটা দেখে কাশেমের মত

দক্ষ কমাণ্ডোও ভ্রূ কুঁচকে ফেলল।

দ্বিতীয় রোটর মাউন্টে বসে থাকা বিরাট ফিউল ট্যাঙ্কে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এভিয়েশন গ্যাস বিস্ফোরিত হলো। স্কোপের লাইটের ফিল্টার কাশেমকে পুরোপুরি রক্ষা করল না। চোখ সরিয়ে রাইফেলের উপর দিয়ে তাকাল ও। জেটরেঞ্জার যেখানে আছে তার একটু দূরেই এখন আগুনের বিরাট একটা ছাতা গজিয়েছে, ওটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের গোলকটা দ্রুত উপরে উঠছে। ট্যাঙ্কের একশো ফুটের মধ্যে যারা ছিল, প্রচণ্ড কংকাশনে ছিটকে পড়ল। পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে যারা ছিল ঝলসে মারা গেল।

'কয়েকজনের মুভমেণ্ট দেখছি,' বললেন সিরাজ। 'জেট-রেঞ্জারের পেছনের দরজা খুলে গেছে। এক লোক দৌড়ে সরে যাচ্ছে। লম্বা দাড়ি আছে।'

'সম্ভবত ওইটাই মুদাস্‌সর আলী খান,' বলল জুডি। 'কোনদিকে যায়?'

'একটু অপেক্ষা করুন।' সিরাজ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দেখলেন। 'একটা গাড়ির দিকে ছুটছে এখন। ওটা বড়সড় একটা মার্সিডিজ সেডান। পিছনের সিটে উঠছে। সে ছাড়া শুধু ড্রাইভার আছে গাড়িতে।'

'আমি কি লোকটাকে গুলি করব, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল কাশেম। রাইফেলটা আবারও কাঁধে তুলে নিয়েছে।

'এখনই না,' বলল রানা। 'রাস্তায় বেরিয়ে যাক, তখন ওর গার্ডরা ওকে বাঁচাতে পারবে না। লোকটাকে হাতে পেতে চাই।'

'সে কাউকে রেডিয়ো করেছে,' বললেন সিরাজ। 'একটা গাড়ি রেসিডেন্সিয়াল কম্পাউণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ওটার ভিতরে অন্তত তিনজন লোক। মুদাস্‌সর খানকে সহজে পাওয়া যাবে না।'

চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা। তিরিশ মিনিটের তিন ভাগের এক ভাগ শেষ হয়ে গেছে এরইমধ্যে। মার্ভেল প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

দুই গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠল। ওরা দ্রুত গতি তুলে রওনা হলো। বাঁক নিয়ে পিছনের গেটে চলে গেল, তারপর প্রধান সড়কে পড়ে দক্ষিণে ছুটল। অন্ধকার জঙ্গল যেন রাস্তাটা ঘিরে রেখেছে। দূর থেকে মনে হলো ছুটন্ত গাড়িগুলো সুড়ঙ্গে ঢুকেছে। মাঝে মাঝে হেডলাইটের প্রভা দেখা গেল। ক্যাপ্টেন সিরাজ রবিনসন নিয়ে পিছু নিলেন, আড়াই মিনিট পর গাড়ি দুটো পিছনে ফেললেন।

দ্বিতীয় ড্রাইভার সামনের গাড়ির পঞ্চাশ ফুট পিছনে ছুটছে। গাড়ি দুটো বড় কাছাকাছি, হিসাব কষল রানা। কাঁধে ঝুলন্ত ওয়েব হার্নেস থেকে একটা গ্রেনেড তুলে নিল। চপারের ডানপাশের দরজায় ছোট্ট একটা জানালা আছে, ওটা খুলে ফেলল। সাধারণত গ্রেনেডের ফিউজ হয় পাঁচ সেকেণ্ডের, এর ফলে কোনও ফক্সহোলে ফেললে বা ট্রুপস্ এগিয়ে এলে কোনও সমস্যা হয় না। তবে ওই গাড়ি দুটো নব্বুই মাইল গতিতে ছুটছে, ঘড়ির কাঁটা এক সেকেণ্ড পার হতে না হতে চলে যাচ্ছে একশো ফুট দূরে।

গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলল রানা, সতর্কতার সঙ্গে শক্ত করে স্পুন ধরে রাখল। হাত বের করে দিল জানালা দিয়ে। হাতের আন্দাজে গ্রেনেডটা ঠিক জায়গায় ফেলতে হবে। অঙ্কের হিসাব কষে লাভ হবে না। গ্রেনেডের স্পুন রিলিজ

করল রানা, একমুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর বোমাটা ছেড়ে দিল।

মুহূর্তে গ্রেনেডটা অন্ধকারে হারিয়ে গেল, যেন গপ করে গিলে নিল কেউ। আরও এক সেকেণ্ড পর মার্সিডিজের ড্রাইভার এঁকেবেঁকে সরে গেল। সে গাড়ির ট্রাঙ্কে ভারী কিছু পড়তে শুনেছে। জিনিসটা পিছনের রাস্তায় গিয়ে পড়ল, ড্রপ খেয়ে অ্যাসফল্টের উপর দিয়ে ছুটল। পিছনের গাড়ির চালক জানে না সামনে কী পড়েছে, দেখবার কথাও নয়—তার গাড়ি ওটার উপর দিয়ে ছুটল। মিলি সেকেন্ড পার হলো। রানা আন্দাজ করল গ্রেনেডটা ভুল জায়গায় ফেলেছে। পিছনে হাত বাড়িয়ে থলি থেকে আরেকটা গ্রেনেড তুলে নেবে, এমনসময় নীচেরটা গাড়ির গ্যাস ট্যাঙ্কির নীচে ফাটল।

আধ সেকেণ্ড এদিক-ওদিকে দুটো বিস্ফোরণ ঘটল। গ্রেনেডের চাপা আওয়াজটার সঙ্গে মিশে গেল গ্যাসোলিনের বিস্ফোরণ। গাড়ির পিছনের দিকটা রাস্তা থেকে উঠে গেল, পরমুহূর্তে গাড়ি নাক উঁচু করল, দাঁড়িয়ে গেল নাকের উপর, উল্টে পড়ল। ওটার ছাদ এখন মেঝে হয়ে গেছে। ঘসটে এগিয়ে গেল, কয়েকবার উল্টোপাল্টা ডিগবাজি খেল। জ্বলন্ত পেট্রল ওটাকে গিলে নিল। ধ্বংসস্তূপটা রাস্তার ধারে একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে থামল।

মুদাস্সর আলী খানের ড্রাইভার রিয়ারভিউ মিররে দেখেছে কী ঘটেছে। অজান্তেই গতি কমিয়ে ফেলেছে সে। সুযোগটা নিল কাশেম। এদিকে ক্যাপ্টেন সিরাজ হেলিকপ্টার নামিয়ে এনেছেন অনেক নীচে, এখন মার্সিডিজের পঞ্চাশ ফুট ডানে চলেছেন। গাছগুলো না থাকলে নেমেই পড়া যেত। কাশেম কাঁধে রাইফেল তুলে নিয়েছে, দেরি না করে গুলি ছুঁড়ল। সাধারণ বুলেট শুধু টায়ার ফুটো করত, কিন্তু .৫০ ক্যালিবারের বুলেট ফ্রন্ট অ্যাক্সেলের কাছে স্প্লাইন চুরমার করে দিল। আটকে গেল হুইল আর হাব। সঙ্গে সঙ্গে টায়ার গাড়ি থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। ভারী মার্সিডিজের অ্যাক্সেল ছুটন্ত অবস্থায় চুরমার হলো। গাড়িটা রাস্তা ঘষে এগিয়ে চলল। চারপাশের রাস্তা স্ফুলিঙ্গে ভরে উঠল। গাড়ির গতি দ্রুত কমে এল। ড্রাইভার রাস্তায় টিকে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কাশেম সামনের হুডের ভিতরে দুটো বুলেট পাঠিয়ে দিল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আর যাবে না কোথাও।' নষ্ট হয়ে যাওয়া রেডিয়েটার থেকে তপ্ত বাষ্প ছিটকে বেরল।

ক্যাপ্টেন সিরাজ মার্সিডিজের পঁচিশ ফুট সামনে রাস্তায় নামলেন। গাড়িটা তখনও ধীরে এগিয়ে আসছে। তারপর ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল। তার আগেই হেলিকপ্টার থেকে নেমে পড়েছে রানা, কাশেম ও জুডি—ছুটল ওরা গাড়ির দিকে। রানা ও কাশেমের হাতে এখন **M-4A2** অ্যাসল্ট রাইফেল। জুডি মার্ভেলের আর্মারি থেকে একটা বেরেটা সেমি-অটোমেটিক পিস্তল নিয়েছে।

ওরা দশ ফুট পেরতেই গাড়ির সামনের দরজা খুলে গেল, ড্রাইভার বেরিয়ে এল, শত্রুদের দেখে মুহূর্তে দরজার আড়াল নিল। লোকটার হাতে মেশিন-পিস্তল, ব্রাশ ফায়ার করল। ভয়ে অস্থির হয়ে আছে সে, বুলেটগুলো কারও দিকে গেল না। তার আগেই রাস্তায় শুয়ে পড়েছে রানা, কাশেম ও জুডি। এম-ফোর দিয়ে গুলি করল কাশেম। গাড়ির দরজা দিয়ে ৫.৫৬ এমএম বুলেটগুলো ঢুকল, ভিতরে

ভ্রমরের মত ছোটাছুটি করল। বুলেট-প্রুফ গ্লাস আঘাতে আঘাতে ঘোলা হয়ে গেল।

রানা আন্দাজ করছে, মার্সিডিজটা আর্মার্ড। দরজার তলা দিয়ে গুলি করল ও। প্রথম বুলেট ড্রাইভারকে ছুঁলো না, দ্বিতীয় বর্ষণে লোকটার এক হাঁটু চুরমার হলো। ডানপায়ের গোড়ালি ফুটো হয়ে গেল। আর্তনাদ বের হলো হাঁ করা মুখ থেকে, দরজা ধরে রাখতে চাইল ড্রাইভার, কিন্তু ভিতর থেকে তাকে ধাক্কা দেয়া হলো—দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ড্রাইভার আবার অস্ত্র তাক করতে গিয়ে বুকে জুড়ির গুলি খেল, ছিটকে ফেণ্ডারে গিয়ে পড়ল। ওখান থেকে নামল রাস্তায়, একটা স্তূপের মত পড়ে থাকল।

ক্রল করে মার্সিডিজের পিছন দরজার কাছে চলে এল রানা, হ্যাণ্ডেল টানল। লক করা। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গ্লাসে বেশ কয়েকবার গুলি করল ও। ল্যামিনেট করা শক্ত গ্লাস চ্যাপটা বুলেটগুলোকে ফিরিয়ে দিল। জানালাতে ব্যারেলের মাযল দিয়ে গুঁতো মারল রানা, কয়েকবার আঘাত করবার পর ছোট্ট একটা গর্ত তৈরি হলো। সরে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন পাল্টে নিল। কাশেম সেই সুযোগে গুঁতিয়ে গর্তটা আরও বড় করল। কাঁচগুলো চারপাশে ছিটকে পড়ল, চপারের আলোয় মনে হলো ওগুলো জ্বলজ্বলে হীরার খণ্ড।

রিলোড হয়ে গেছে রানার, কাশেমের কাঁধে টোকা দিয়ে বুঝিয়ে দিল, ওরা আপাতত গুলি করবে না।

'মুদাস্‌সর, তোমাকে তিন সেকেণ্ড সময় দেব আমি,' বলল রানা। 'এরইমধ্যে দু'হাত বাইরে রাখবে তুমি।' গাড়ির ভিতর থেকে কথা শোনা গেল না। 'ওয়ান... টু... থ্রি!'

রানা ও কাশেম একইসঙ্গে গুলি ছুঁড়ল। গর্তের মধ্যে গুলি ঢুকছে, বুলেটগুলো উল্টো দিকের জানালায় গিয়ে আঘাত হানছে। কয়েকটা বুলেট পিছনের সিটে গিয়ে গাঁথল। কিছু লাগল আর্মার্ড প্লেটিঙে। বুলেট তীক্ষ্ণ খটাখট আওয়াজ তুলে ঘুরছে ভিতরে। গতি কমলে কোথাও না কোথাও ঢুকছে। রাইফেলের গর্জনের উপর দিয়ে কর্কশ একটা চিৎকার শোনা গেল। একটা একটা করে গুলি করছে রানা ও কাশেম, থামছে না।

'মুদাস্‌সর?' ডাক দিল রানা।

চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'গুলি লেগেছে আমার! হায় রে আল্লাহ্, আমি মারা যাচ্ছি!'

'জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দাও,' বলল রানা। 'নইলে ভেতরে গ্রেনেড ফেলব।'

'আমি নড়তে পারছি না! তুমি আমার দু'পা প্যারালাইজ করে দিয়েছ!'

রানা-কাশেম ভাল করেই জানে, লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু শয়তানটাকে হাতে পেতে হবে। গাড়ির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, হ্যাণ্ডেলে চাপ দিল। কাশেম রাইফেল হাতে তৈরি থাকল। ফোকরের ভিতর দিয়ে চারপাশ দেখা যায় না, কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দরজা খুলে যাওয়ায় ইন্টেরিয়ার লাইট জ্বলে উঠল। মুদাস্‌সর মেঝেতে বসে, একটা টার্গেট পেতেই মেশিন-পিস্তল

তুলে গুলি করল। তার নিশানা ড্রাইভারের চেয়েও খারাপ। বুলেটগুলো আর্মার্ড দরজায় বিঁধল। অল্পের জন্য বেঁচে গেল কাশেম, ছিটকে সরে গেছে। হাজারো ঘণ্টার ট্রেইনিং ওকে বলে দিল, এখনই গুলি করতে হবে। রাইফেল তুলল কাশেম, কিন্তু তার আগেই রানার ওয়ালথারের প্রথম বুলেটটা ঢুকল খানের মুখ গহ্বরে। দ্বিতীয়টা বাম চোখে ঢুকে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল। হলদেটে মগজ ছিটকে গিয়ে ওপাশে পড়ল।

রাইফেল নামিয়ে নিল কাশেম। ওর দিকে তাকাল রানা, কাঁধ ঝাঁকাল। 'লোকটা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।'

ওদের মাঝখান দিয়ে এগোল জুডি, গাড়ির ভিতরে উঁকি দিল। শ্বাস আটকে ফেলল করডাইটের কটু গন্ধে। মগজ, রক্তের আঁশটে ঘ্রাণটা বিশ্রী। মুদাস্‌সর আলী খান চওড়া সিটের পায়ের কাছে পড়ে আছে। জুডি ভিতরে ঢুকল, দু'হাতে লাশটা সরাল। খানের বুকের তলা থেকে একটা চামড়ার বিলফোল্ড বের করে নিল, মানিব্যাগটাও। ওগুলো রানার হাতে দিল। সিটের কুশনের নীচে একটা ব্রিফকেস পাওয়া গেল। আরও কিছু থাকতে পারে। চারপাশ ভাল করে দেখল। তবে আর কিছু নেই।

পিছিয়ে বেরিয়ে এল জুডি, প্যান্টের পায়ে দু'হাত মুছল। 'কানাগলিতে আটকে গেলাম আমরা, তা-ই না, রানা?' রবিনসনকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন সিরাজ। ওদিকে দেখাল জুডি। 'খানের লোকজন দ্রুতই সামলে নেবে, মালিকের পেছন পেছন আসবে। আমার মনে হয় আমাদের চলে যাওয়া উচিত। রানা, তুমি কী বলো?'

'চলো, ফিরব আমরা,' ঘুরে দাঁড়াল রানা, চপারের দিকে পা বাড়াল।

সিরাজ ওদের আসতে দেখে রোটরের গতি বাড়ালেন, টেকঅফের জন্য তৈরি হচ্ছেন। খুদে খুদে কাঁকর চারপাশে ছিটকে পড়ছে। ধুলো উড়ছে। সবাই কুঁজো হয়ে কেবিনের দিকে চলল। তার ফাঁকে একবার মার্সিডিজ দেখল রানা, জুডির কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জুডি, তুমি তা হলে লয়েড্‌স্-এর ইনভেস্টিগেটর?'

প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলল জুডি। কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি লয়েড্‌সে যোগ দেয়ার আগে হার ম্যাজেস্টি'জ সার্ভিসে কাজ করতাম। আর কিছু না!'

'কী কাজ করতে?'

হোলস্টারে চাপড় দিল জুডি। 'সামান্য ট্রাবল-শ্যুটিং।'

হেলিকপ্টারে উঠে পড়ল ওরা। সিরাজ টেকঅফ করলেন। ছুটে চললেন মার্ভেলের দিকে।

রানা বলল, 'সামান্য ট্রাবল-শ্যুটিং, জুডি?'

'আর কী?' জুডি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

আট

খালি গায়ে ট্রাউজার্স পরে নকল ব্রিজে বসে আছে রানা। প্রায় উড়ে চলেছে মার্ভেল। পোর্টে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে এখন নানা রঙের খেলা। অনেক উত্তরে কামচাটকা পেনিনসুলায় অসংখ্য পর্বত-চূড়া, ওগুলো থেকে আগ্নেয় ছাই ও ধুলো উঠছে আকাশে। আজকের দিন প্রায় পেরিয়ে গেল, কিন্তু ব্রিজে এখনও গরম লাগছে। ও শুনেছে, এদিকের সাগরে এরকম আবহাওয়া হলে প্রচণ্ড ঝড় আসে।

পুব চিন সাগর ও জাপান সাগরের চিহ্নিত নৌপথ এড়িয়ে যাচ্ছে গগল। ওখানে প্রচুর জাহাজের ভিড়। কাজেই ফিলিপাইনস দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়েই মার্ভেল নিয়ে পুবে সরে গেছে ও, জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ঘেঁষে চলেছে এখন।

এদিক দিয়ে যাওয়ার পরেও কেউ যদি মার্ভেলকে প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ নট গতিতে ছুটতে দেখে, তো কিছু করবার নেই। ওরা অবশ্য মার্ভেলের ইকুইপমেন্ট দিয়ে চারপাশের রেইডার জ্যাম করেছে। তবে কেউ দেখে ফেললে হৈ-চৈ উঠবেই। দু' ঘণ্টা পর মার্ভেল টোকিয়ো শিপিং লেন পেরিয়ে যাবে, তারপর থেকে সাগরে অল্প জাহাজই থাকবে। তখন আর গাড়ি বহনকারী ক্যারিয়ার বা কণ্টেইনার শিপ নিয়ে চিন্তা নেই, বারবার ঘুরে এগোনোর ঝামেলা থাকবে না।

মাঝে মাঝে পথ বদলে নিতে হচ্ছে, তবে তা কয়েক মিনিটের জন্য। ওরা জানে, হাতে বাড়তি সময় নেই। ফু-চুং এখনও দু'দিনের পথ দূরে। এদিকে পেদ্রোপাভ্লোভস্ক-এ আটকা পড়া রাশান ভলকানোলজিস্টরা জানিয়েছেন, যে-কোনও সময় ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। কামচাটকা পেনিনসুলায় বারবার প্রবল ভূমিকম্প হচ্ছে। একই চেইনের তিনটি আগ্নেয়গিরি ছাই ও বিষাক্ত গ্যাস ছুঁড়ছে। এখনও কোনও মানুষ মারা যাওয়ার খবর পাওয়া যায়নি, তবে কামচাটকায় জনবসতি কম থাকায় সম্পূর্ণ খবর এসে পৌঁছেনি।

নানান খারাপ খবরের মধ্যে একমাত্র ভাল খবর, ফু-চুঙের ট্র্যান্সমিটার এখনও কাজ করছে। তবে তাতেও সমস্যা রয়েছে। স্যাটালাইটের ডেটা অনুযায়ী, ফু-চুং আছে একটা সৈকতে, ওটার উত্তরে মাথা তুলেছে একটা আগ্নেয়গিরি—যে-কোনও সময় ওটা অগ্ন্যুৎপাত করবে। ডক্টর ফারাকে জিজ্ঞেস করেছিল রানা, ট্র্যান্সমিটারের বাহক মারা গেলে কতক্ষণ পর্যন্ত ট্র্যান্সমিশন চলবে। জবাবটা এখন জানে ও। এমনও হতে পারে ফু-চুং এক সপ্তাহ আগেই মারা গেছে, কিন্তু ট্র্যান্সমিটারটা এখনও কাজ করছে।

'এত কী ভাবছ, রানা?'

ব্রিজে বসে চুপচাপ ভাবছিল রানা, চমকে ঘুরে তাকাল। কণ্ঠটা চেনে ও। এক সেকেণ্ডের জন্য বিরক্ত হলো।

'দুঃখিত, চমকে দিতে চাইনি,' বলল জুডি।

'ঠিক আছে, অসুবিধে নেই,' বলল রানা। সামনের দিগন্তে চোখ রাখল। যদি কোনও ভাবে এই দূরের পথ কাছিয়ে আনা যেত!

'মনে হলো তুমি এটা পেলে খুশি হবে,' বলল জুডি। হাতে ফিলিপাইনের বিখ্যাত স্যান মিগুয়েল বিয়ার।

জুডি স্টিভেনসনের পরনে একটা সাদা লিনেনের স্কার্ট ও সবুজ পোলো শার্ট। পায়ে চটি স্যাণ্ডেল। পাগলা হাওয়া ওর চুলগুলো মুখের উপর নিয়ে এসেছে, এক হাতে ওগুলো সরিয়ে দিল। মেয়েটির দিকে তাকাল রানা। জুডির চোখ ওর চওড়া কাঁধ, কিলবিল করা পেটের পেশি, শক্তিশালী উরু দেখছে। তারপর সরে গেল দৃষ্টি।

দু'পা জানালার নীচের রেইলে রেখেছে রানা, নামিয়ে নিল, সোজা হয়ে বসল। নিজের উপরে একটু বিরক্ত। মেয়েটার উপস্থিতি ওকে সচেতন করে তুলেছে। মন বলছে, এই মেয়ের সামনে ওর অনেক বেশি স্মার্ট থাকা উচিত। নিজেকে চোখ রাঙাল। তুই চিনিস এই মেয়েকে, যে এর সামনে হিরোর মত আচরণ করতে হবে!

হাতের ইশারায় জুডিকে কাছের চেয়ারে বসতে বলল রানা। বিয়ারের বোতলটা নিয়ে দু'বার চুমুক দিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কস্। আসলে চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলাম।'

আরামদায়ক চেয়ারে অর্ধেক ডেবে গেল জুডি। 'বন্ধুর কথা ভাবছিলে? ওঁর নাম বোধহয় ফু-চুং?'

'লিউ ফু-চুং। ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'মিস্টার আহমেদের কাছে তোমাদের সবার ব্যাপারে খানিকটা শুনেছি,' বলল জুডি। 'তোমরা একদল লোক, খুনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছ।'

'তোমাকে জাহাজ ঘুরিয়ে দেখাইনি বলে দুঃখিত,' বলল রানা। 'উচিত ছিল সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া।'

'জানি তুমি ব্যস্ত ছিলে। মিস উর্বশী দাশা আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।' শার্টে হাত বোলাল জুডি। 'আমাকে তোমাদের ম্যাজিক শপ থেকে পোশাক ধার দেয়া হয়েছে।'

'আর তোমার কেবিন? ওটা পছন্দ হয়েছে?'

জুডির দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'শুধু পছন্দ? লণ্ডনে আমার ফ্ল্যাট যতটা, কেবিনটা তার চেয়েও বড়!' হেসে ফেলল জুডি। 'আমি চলে যাবার পর ওই বাথরুমের মার্বেল টাবটা খুঁজে না পেলে আমাকে দোষ দিয়ো না! তোমাদের জাহাজের বাবুর্চি দুর্দান্ত রান্না করে, কুনার্ডকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি ওর কাছ থেকে কয়েকটা নতুন পদ শিখেছি।'

'তা হলে মার্ভেলে খুব খারাপ লাগছে না?'

মাথা দোলাল জুডি। প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'আসলে কী ঘটছে, রানা? তোমার ধারণা কী? মানুষগুলো নিয়ে কী করা হচ্ছে?'

'এ-মুহূর্তে আমরা শুধু আন্দাজ করতে পারি, আসলে কী ঘটছে আমরা জানি না,' বলল রানা। 'মনে নানান প্রশ্ন জাগছে, কিন্তু কোনও উত্তর জানা নেই।

মুদাস্‌সর আলী খান মারা যাওয়ায় আমরা লিঙ্কটা হারিয়েছি।'

'কিন্তু ফু-চুং বলতে পারবেন।'

চট্ করে চেয়ার ছাড়ল রানা, সামনের কাউন্টার থেকে পোর্টফোলিওটা নিয়ে জুডির হাতে দিল। 'এক ঘণ্টা আগে আমাদের কম্পিউটার ওটা পরীক্ষা করেছে। তুমি হয়তো ইন্টারেস্টিং কিছু পেয়ে যাবে।'

'জিনিসটা কী?' জিজ্ঞেস করল জুডি। পোর্টফোলিও মোলায়েম চামড়া দিয়ে মোড়া। খুলল।

'ওটা তুমি নিয়ে এসেছ। মুদাস্‌সর আলী খানের গাড়ির ভিতরে ছিল। দলবল নিয়ে যত জাহাজ হাইজ্যাক করেছে তার লিস্ট। কয়েক বছর হলো এরা প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ হাইজ্যাক করছে। লিস্ট দেখে বেশ কিছু কেস বন্ধ করে দিতে পারবে। বেশির ভাগ জাহাজ খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে ভাঙা হয়ে গেছে। কিছু আছে, নতুন নামে সাগরে নেমেছে। ওগুলো বিভিন্ন দেশের পতাকা বহন করছে। মুদাস্‌সর খানের কোম্পানিগুলো ওসব চালায়।'

'আচ্ছা?' চোখ তুলে তাকাল জুডি।

'কপাল খারাপ যে দ্য চুহার সিস্টার শিপ দ্য চুহি সম্বন্ধে কিছু নেই ওখানে,' বলল রানা। 'মুদাস্‌সর খান ওটা নিয়ে কী করেছে জানতে পারলে ভাল হতো। আমার ধারণা ওটাও অনেক জাহাজ সরিয়েছে। খান ওটার হিসাব অন্য কোনও লেজারে রেখেছে।'

রানার চোখে তাকাল জুডি। 'আলাদা লেজারে রাখবে কেন?'

'জানি না কেন, কিন্তু মনে হচ্ছে তা-ই করেছে।'

'হয়তো দ্য চুহির উপরে তার নিয়ন্ত্রণ নেই।'

চেয়ারে বসল রানা, জুডির দিকে একটু ঝুঁকল। 'তুমি ভাবছ ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ওটা নিয়ে অন্য কিছু করছে?'

'এই জাহাজে এসে লোকটার নাম শুনেছি আমি,' বলল জুডি। 'মিস্টার আহমেদ, মিস্টার চ্যাটার্জি ও মিস দাশা আলাপ করছিল। আমি আগে কখনও ওই লোকের নাম শুনিনি।'

'আমরা জানি সে সোভিয়েত ব্যুরো অভ ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এর কর্মকর্তা ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার পর রাশা সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছে। সে কী করে জলদস্যু মুদাস্‌সর আলী খানের সঙ্গে জড়িয়ে গেল আমাদের জানা নেই।'

'কামচাটকায় কোনও মূল্যবান খনিজ আছে? সে যখন ব্যুরোর কাজ করত তখন কোনও রিপোর্ট দেখে থাকতে পারে। হতে পারে না? ওগুলো হীরা, অন্য রত্ন বা কোনও দামি ধাতু?'

'অনিল ডেটাবেজে খুঁজে দেখেছে। কামচাটকায় দামি কিছু নেই।'

জ্বলজ্বল করে উঠল জুডির চোখ। 'এমন যদি হয় জিনিসটা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি? সরোকিন যখন সোভিয়েতদের কাজ করত তখন হয়তো রিপোর্টটা তার ডেস্কে আসে, সে বুঝতে পারে ওই দামি জিনিস প্রচুর পরিমাণে আছে, কাজেই সে আবিষ্কারের রিপোর্টটা কবর দিয়ে ফেলল?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'অসম্ভব নয়। কামচাটকায় অনেক মানুষ নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমরা জানি। এমন হতেই পারে, ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন হয়তো তাদের নিয়ে গিয়ে কোনও খনিতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করাচ্ছে।' চট্ করে মোবাইলটা বের করল রানা, ডায়াল করবার পর তৃতীয় রিঙে মার্ভেলের প্রাইভেট সেলুলার সিস্টেমে অনিলকে পাওয়া গেল। 'অনিল। তুই এখন কোথায়?'

'ম্যাজিক শপে, আমার ভাঙা রিস্টওয়াচ মেরামত করিয়ে নিচ্ছি,' বলল অনিল।

'এক কাজ কর্, দোস্ত। একটা কম্পিউটার টার্মিনালের কাছে চলে যা, জরুরি,' বলল রানা। 'আমাদের জানা দরকার মারকিউরি কোন্ ধরনের খনির কাজে লাগে।'

'টার্মিনাল কাছেই আছে, একটু দাঁড়া,' বলে ফোন রেখে দিল অনিল।

'মারকিউরি নিয়ে কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

ট্রলার নিয়ে জলদস্যুরা আমাদের আক্রমণ করেছিল, তোমাকে বলেছি,' বলল রানা। 'ডক্টর ফারা তাদের লাশ অটোপসি করেছে। ওসব দেহে প্রচুর মারকিউরি পাওয়া গেছে। সবাই ছিল ওই বিষে আক্রান্ত।'

'তোমার ধারণা কামচাটকায় ওরা পারদ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল?'

'মৃত ইমিগ্র্যান্টদের দেহে কিন্তু পারদের বিষ পাওয়া যায়নি,' বলল রানা। 'জলদস্যুদের দেহে ছিল। এরা হয়তো নিয়মিত কামচাটকায় ইমিগ্র্যান্ট নিয়ে যেত। তখন তাদের গার্ডের ডিউটি দেয়া হতো। যে-কারণেই হোক, এদের দেহে বিষ ঢুকে গেছে।'

ওরা দু'জন চুপ হয়ে গেল। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর রানার ফোন মিষ্টি সুরে বাজল। রিসিভ করেই জিজ্ঞেস করল রানা, 'কী পেলি, অনিল?'

'সোনা হচ্ছে একমাত্র ধাতু যেটার সঙ্গে পারদ মিশে থাকতে পারে,' বলল অনিল। 'পারদ সোনার "ওর" থেকে খাঁটি সোনা সরিয়ে নিতে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশ ও মানুষের দেহে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে বলে বহু দেশে পারদ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে এখনও দক্ষিণ আমেরিকায় এভাবে সোনা পরিশুদ্ধ করা হয়। ...আর কিছু, দোস্তো?'

'চলবে, অনিল, থ্যাঙ্কস্!' বলল রানা। 'রাখি।' ফোন রেখে দিয়ে জুডির দিকে তাকাল। 'কামচাটকায় সোনার খনিতে কাজ চলছে।'

'ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ওই মানুষগুলোকে ক্রীতদাসের মত খাটিয়ে নিচ্ছে, আর মুদাস্‌স্‌র আলীর কোম্পানি মানুষ যোগাড় করে দেয়ার দায়িত্বে ছিল,' বলল জুডি। 'এরা রাশান গভর্নমেন্টের নাকের ডগায় বসে নিজেদের কুকীর্তি চালাচ্ছে!'

'তা-ই তো মনে হয়।'

'আমরা এখন জানি কারা কী করছে,' বলল জুডি। 'কিন্তু এবার জানতে হবে কেন করছে।'

'হ্যাঁ, সেটা জানতে হবে,' কর্কশ হয়ে গেল রানার কণ্ঠ।

ওর কণ্ঠে এমন কিছু আছে, যার কারণে জুডি বলল, 'কী ভাবছ তুমি, রানা?'

'মুদাসসর আলী খানের জলদস্যুতার দিন শেষ, তোমার কাজ এখন শেষ,' বলল রানা। 'কিন্তু আমাদের কাজ মাত্র শুরু। জানি না কামচাটকা পেনিনসুলায় পৌঁছে কী দেখব, তবে মনে হচ্ছে ওখানে আমাদের রীতিমত লড়াই করতে হবে। মুদাস্সরের চেয়ে বড় মাপের শয়তানের সঙ্গে টক্কর লাগবে ওখানে।'

'তুমি আরও কিছু বলতে চাও,' বলল জুডি। খানিকটা ভয় পাচ্ছে ও, আন্দাজ করছে রানা কী বলবে।

'আর এসবের সঙ্গে তোমার না জড়ানোই ভাল। আমরা জাপানের উত্তর প্রান্তে থামতে পারি, তোমাকে কপ্টারে তুলে পৌঁছে দিতে পারি। তাতে বড়জোর একটা ঘণ্টা সময় হারাব।'

রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল জুডি, চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে এল রানার নাকের এক ইঞ্চি দূরে। 'আমি গত ছ'মাস ধরে তদন্ত করছি, মিস্টার রানা! জাগ্রত প্রতিমুহূর্তে এই তদন্ত নিয়ে ভেবেছি। অনেক লড়াই করে রয়েল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটির এক্সপিডিশনে এসেছি। জলদস্যুদের ঠেকাতে পারিনি। অ্যাভালাঞ্চে আমার বন্ধুরা ছিল। এই দানবগুলো ওদের খুন করেছে। আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি বাঁচি তো প্রতিশোধ নেব। এই পিশাচগুলোকে ছাড়ব না! মিস্টার রানা, তুমি ভেবেছ তুমি চাইলেই তোমার কথা মত সুড়সুড় করে চলে যাব আমি, তা-ই না? তা-ই ভেবেছ? না?'

কয়েক সেকেণ্ড পরস্পরের দিকে দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। কড়া চোখে পরস্পরকে দেখছে। কেউ কাউকে ছাড় দিল না। রানা জানে এই মেয়ের দুঃসাহসী একটা মন আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও রাখে। ও জানে, এই মেয়ে কিছুতেই প্রতিজ্ঞা থেকে সরবে না।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, নরম স্বরে বলল, 'তুমি এখন জানো ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারো। আমরা কামচাটকায় চাইলেও তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারব না।'

রানার কণ্ঠ শুনে আঁচ করল জুডি, ওকে চলে যেতে বাধ্য করা হবে না। মুহূর্তে ওর রাগ দূর হয়ে গেল, মৃদু হাসল। দু'জনের মুখ এক ইঞ্চি দূরে, কিন্তু ওদের মনে হলো ওরা আছে হাজারো মাইল দূরে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুডি, 'আমি আশা করছি না তোমরা নিরাপত্তা দেবে। তোমরা যখন ওই ক্রিমিনালগুলোকে ধরবে, তখন আমি ওখানে থাকতে চাই।' কেন যেন রানার ঠোঁটে চুমু দিতে ইচ্ছে হলো ওর, কিন্তু অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। বিয়ারে চুমুক দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'বেশ!'

নয়

ফু-চুং মনে মনে স্বীকার করেছে, যারা ওদের আটকে রেখেছে, তারা নিজেদের কাজ বোঝে—পালাবার কোনও পথ রাখেনি। টিলার ওপাশের পর্বতটা মাথার উপরে ঝুলে আছে। সর্বক্ষণ ছাই ছুঁড়ছে। ছাইগুলো কয়লার মত কালো, মৃত্যু-সৈকতে নেমে আসছে। কিছুক্ষণ পর পর থর-থর করে কাঁপছে জমি। তাল মিলিয়েছে পাগলা হাওয়া। সমুদ্র সীসার মত ধূসর হয়ে গেছে, উন্মত্ত হয়ে উঠছে। প্রহরীদল ওদের কোনও ছুটি দেয়নি, প্রতিনিয়ত খাটিয়ে নিচ্ছে। নিজেদের জন্য প্রহরীদের আলাদা পরিকল্পনা আছে। লাভা উদ্গিরণ হলে জাহাজ নিয়ে সরে যাবে। বয়লারগুলো প্ল্যান্ট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে বয়লারে এখনও আগুন জ্বলছে। যতক্ষণ সম্ভব সোনার বিশোধন চলবে। শ্রমিকরা চাবুক বা মুগুরের মুখে কাজ করে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ক্রীতদাসরা একের পর এক বাস্কেট কাদা দিয়ে ভরছে, নীচে এনে স্লুইস বক্সে ফেলছে মানুষের রক্তের বিনিময়ে সোনার কণা উদ্ধার চলছে। সন্ধ্যা হওয়ার পর ক্রীতদাসদের বন্দিশালায় নামিয়ে এনে তালা মেরে আটকে রাখা হচ্ছে। ভোর হলেই আবারও রক্ত-পানি করা পরিশ্রম, সেই সঙ্গে নির্মম নির্যাতন।

ড্রাই-ডকটা উপসাগরে ভাসছে। টাগ-বোটের ক্রুরা ওখানে কাজ করছে। ডকের পেট থেকে আরেকটা জাহাজ খালাস হচ্ছে। কাজটা শেষ হলে ড্রাই-ডকের ওজন অনেক কমে যাবে। পাগলা সমুদ্র নানাভাবে বাধা দিচ্ছে, নইলে অনেক আগেই জাহাজটা সরিয়ে নেওয়া হতো। ফু-চুং এক দাড়িওয়ালা যুবককে দেখেছে, প্রকাণ্ডদেহী লোকটা ছিল সরোকিন নামের এক রাশানের সঙ্গে। দু'জন তর্ক করছিল। দাড়িওয়ালা বলছিল সে লাভা উদ্গিরণের আগেই ড্রাই-ডকটা সরিয়ে নেবে। ওটার ভিতরের জাহাজটা সরিয়ে ফেললে আর হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রমাণ থাকবে না।

সৈকতে যেসব পুরোনো জাহাজ আছে, সেগুলো অর্ধ ডুবন্ত—কিন্তু ওই জাহাজটা একটা ক্রুজ লাইনার, একদম নতুন। দৈর্ঘ্যে চারশো ফুট। দেখতে অপূর্ব। শ্যাম্পেনের গ্লাসের মত ক্লাসিক স্টার্ন। প্রায় প্রতিটি কেবিনের সঙ্গে ব্যালকনি। সাধারণত বিত্তশালী মানুষ এসব জাহাজে ওঠে, গ্যালাপ্যাগোস বা অ্যান্টার্কটিকা ঘুরে দেখে।

কিন্তু এখন ওটা পরিত্যক্ত। যাত্রীদের অনেক আগেই খুন করা হয়েছে। রেইলিঙের পিছনে এখন দাঁড়িয়ে আছে দুশো ইমিগ্র্যান্ট। ড্রাই-ডক ওদের সহ জাহাজ উগরে দিল। লোকগুলো উপসাগরে ভাসছে। জাহাজের ইঞ্জিনগুলো আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এখন আর ব্যালাস্ট পুরোপুরি ঠিক নেই। অনেক বেশি ভেসে আছে, ওয়াটার-লাইনের উপরে অ্যান্টিফাউলিং পেইন্ট দেখা গেল। মৃদু ঢেউ জাহাজটাকে দুলিয়ে দিচ্ছে। এইমাত্র বড় একটা ঢেউ দেখল ফু-চুং।

জাহাজটাকে নিয়ে লোফালুফি করল ওটা। ওটার ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলো ভয়ে আর্তচিৎকার করল।

তাদের কপাল ভাল, মাত্র জোয়ার আসছে। জাহাজটা সৈকতের দিকে এগিয়ে এল। কিছুক্ষণ পর ওটা সৈকতে গেঁথে গেল। একদল গার্ড শ'খানেক মজুর নিয়ে ওখানে কাজ শুরু করল। ক্রেন দিয়ে জাহাজটা বালুকাবেলার আরও উপরে টেনে তোলা হচ্ছে। সমুদ্র থেকে শীতল হাওয়া ধেয়ে আসছে, ফু-চুং আন্দাজ করল, তুমুল ঝড় আসছে। নিশ্চয়ই ঝড় আসবার আগেই জাহাজটা সৈকতে আটকে দেওয়া হবে? না হলে সাগর আবারও ওটাকে টেনে নিয়ে যাবে, মানুষগুলো মুহূর্তে জাহাজ সহ ডুবে যাবে। জাহাজে কোনও লাইফ-বোট দেখা যাচ্ছে না।

ড্রাই-ডকের দিকে তাকাল। ওটার প্রকাণ্ড বো-গেট আবারও বন্ধ হয়ে গেছে। পাম্পগুলো পানি বের করছে। কাজটা শেষ করতে আরও কয়েক ঘণ্টা লাগবে। তখন একটা টাগ-বোটও ড্রাই-ডক টেনে নিয়ে যেতে পারবে। দ্বিতীয় বোট "ওর" প্রসেসিং বিল্ডিঙের একশো গজ দূরে এসে থেমেছে।

আগেও খেয়াল করেছে ফু-চুং, প্রসেসিং প্ল্যান্টটা একটা সমতল বার্জের উপরে। ওটাকে টেনে সরিয়ে নেওয়া হবে, সে ব্যবস্থা হচ্ছে। বার্জের চারপাশের সৈকতে অনেক পাথর জমেছে, শ্রমিকরা এখন ওগুলো সরিয়ে ফেলছে। সৈকতে মোবিলের ড্রাম এনে রাখা হয়েছে, মোবিল দিয়ে চারপাশ ভিজানো হবে। কিছুক্ষণ পর ওই টাগ-বোট এসে বার্জ টেনে সাগরে নামাবে। দক্ষিণ আফ্রিকান ম্যানেজার গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক নির্দেশ দিয়েছে, বাড়তি পারদ প্রসেসিং প্ল্যান্টের এলাকার বাইরে নিয়ে ফেলে দেওয়া হবে। পারদের চকচকে পুকুরগুলো বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে সাগরে গিয়ে পড়বে। এখনই মিশে গেছে অন্তত একশো গ্যালন পারদ।

ইতিমধ্যে যারা পারদের বিষাক্ত বাষ্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের দিয়ে প্ল্যান্টের কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ওই মানুষগুলো যোম্বির মত নড়ছে, ধীরে ধীরে কাজ করে চলেছে—তাদের মগজ আর নড়ে না। ফু-চুং চারপাশ দেখল। ওর মত যারা রয়েছে, তারাও ভাল নেই। একটু পর পর ভূমিকম্প হচ্ছে, কাঁপছে ধরণী। দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন। ওরা আগামী ক'দিন যদি টিকেও থাকে, পারদের বিষ ওদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে দেবে। শেষে যদি বেঁচেও থাকে, ভবিষ্যৎ বংশধররা চিরদিনের জন্য খুঁতগ্রস্ত হবে, পঙ্গু হয়ে জন্ম নেবে।

সব ভুলে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ফু-চুং, হঠাৎ খেয়াল করল ওর পাশের শ্রমিক কাদা দিয়ে নিজের বালতি ভরে ফেলেছে। লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বলতে চাইল, বিপদে পড়ে যাবে তুমি! কিন্তু তার আগেই এক গার্ড খেয়াল করেছে ও কাজ থামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা চাবুক তুলে দু'বার নামিয়ে আনল ওর পিঠে। ফু-চুঙের পা পিছলে গেল, কিন্তু কোনওমতে সামলে নিল। গার্ডের দিকে ভুলেও চোখ তুলে তাকাল না। লোকটা সুযোগ পেলে বেধড়ক পেটাবে ওকে। শরীরের এই বেহাল অবস্থায় মার খেলে না-ও বাঁচতে পারে ও।

পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের বালতিটা কাঁধে তুলে নিল ফু-চুং, নীচের দিকে রওনা

হয়ে গেল। জাহাজে ওর পাশের ম্যাট্রেসে থাকে হুয়েং, সে খেয়াল করেছে ফু-চুং কখন নীচের দিকে যায়—ফু-চুঙের পাশে চলে এল সে। তাদের কেবিনে দশজনকে থাকতে দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত টিকে আছে শুধু সে ও ফু-চুং।

'ওদের মুখে শুনেছি আজকে চলে যাবে,' নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে হুয়েং।

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে,' বলল ফু-চুং। 'কয়েক ঘণ্টা পর ড্রাই-ডক খালি হয়ে যাবে। প্রসেসিং প্ল্যাণ্ট সাগরে নামাতে বেশি সময় লাগবে না। এটা খেয়াল করেছ, অনেকক্ষণ হলো মাছধরা ট্রলারগুলো ফিরছে না।'

'না খেয়াল করে পারি?' তিক্ত স্বরে বলল হুয়েং। 'আঁশ সহ মাছের ভর্তার চেয়ে খারাপ আছে শুধু একটা জিনিস—সেটা তিনদিনের বাসী মাছের ভর্তা।' সামনে একটা পিচ্ছিল কাদা-ভরা জায়গা আছে, সেটা সাবধানে পার হলো ওরা, তারপর হুয়েং বলল, 'গার্ডদের ডরমিটরিতে কী ঘটছে জানো? যেসব জাহাজে ওরা থাকে?'

গত কয়েকদিন হলো একটা বোট গার্ডদের ডরমিটরি থেকে টাগ-বোটে কিছু সরিয়ে নিচ্ছে। ডরমিটরির চারপাশে গার্ডদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তাদের বেশিরভাগই পাকিস্তানি, তবে কিছু আছে ইউরোপিয়ান—তারা পাকিস্তানি দাড়িওয়ালা লোকটার আদেশে চলে না। তাদের নির্দেশ আসে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনের কাছ থেকে। এই গার্ডদের শৃঙ্খলা দেখে মনে হয় এরা রাশার এলিট স্পেৎস্ন্যাজের সদস্য। অস্ত্রধারী লোকগুলো শ্রমিকদের বিশ্বাস করে না, পাকিস্তানি গার্ডদেরও ভাল চোখে দেখে না।

সবাই বুঝতে পারছে, এরা আসলে সোনা সরিয়ে নিচ্ছে। তিরিশ ফুটি বোট যখন টাগ-বোটের সঙ্গে মিলিত হয়, সেই সময়টা খেয়াল করে দেখেছে ফু-চুং। আন্দাজ করছে, ওই বোট প্রতিবারে একশো টন সোনা সরায়। যে টাগ-বোট ড্রাই-ডকের গায়ের কাছে ভাসছে, ওটার ডেকে বেঁধে রাখা হয়েছে দুটো শিপিং কণ্টেইনার। সম্ভবত ম্যানেজারের ক্রুজ লাইনার থেকে হাজার হাজার টন সোনা তোলা হয়েছে ড্রাই-ডকেও।

'তোমার কী মনে হয়, আমাদের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল হুয়েং।

'ওয়ালজ্যাক আলাপ করছিল সরোকিনের সঙ্গে, তখন কথাগুলো শুনে ফেলেছি,' বলল ফু-চুং। 'ওরা আমাদের এখানে ফেলে রেখে চলে যাবে।'

'মানে এই দোজখে আমরা মরব, আর ওরা হাসতে হাসতে টা-টা করে সোনা নিয়ে চলে যাবে?'

হুয়েঙের কণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ পেল। যুবক আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে, কিছুটা হলেও মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। টিকে থাকতে হলে সবসময় পজিটিভ মানসিকতা লাগে। ফু-চুং গত এক সপ্তাহ মানুষের সহ্য করবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখেছে, অনেকে মুখ বন্ধ রেখে কাজ করে যাচ্ছে, অন্তরে আশা জাগিয়ে রেখেছে। আবার অনেকে কয়েকদিনে শেষ হয়ে গেছে, যেন ইচ্ছে করে মৃত্যু কামনা করেছে—তারা দ্রুতই মারা গেছে। ফু-চুং বুঝতে পারছে, হুয়েং যদি এখন বাঁচবার আশা ছাড়ে, দু'দিনের মধ্যেই মারা পড়বে।

'কথাটা খেয়াল করে শোনো, হুয়েং। আমরা এভাবে মরব না। বেঁচে থাকার কোনও একটা পথ পাব।'

ক্লান্ত হাসল হুয়েং। 'সাহস দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। তবে তোমার কথার মধ্যে কোনও সত্যতা নেই।'

'আমি কোনও ইমিগ্র্যান্ট নই,' বলল ফু-চুং। 'খেয়াল করে শোনো, হুয়েং, আমি একটা তদন্তকারী সংস্থার হয়ে কাজ করি। আমরা চিন থেকে মানুষ-পাচার ঠেকাতে কাজ করছি। ওরা এখন আমাকে খুঁজে বের করবে। একদল লোক যে-কোনও সময় এখানে হাজির হয়ে যাবে।'

'সত্যিই? মিথ্যে বলছ না তো?'

'না, ওরা যে-কোনও সময় হাজির হবে। একটা জাহাজে করে আসবে ওরা।'

হুয়েং চট্ করে ছাই উদ্গিরণ করা পর্বতটা দেখল। ওটা সৈকত থেকে কয়েক মাইল ভিতরে, কিন্তু দেখলে মনে হয় উত্তরদিকের পুরো দিগন্ত জুড়ে আছে। কিছুক্ষণ হলো জ্বালামুখ ছাই ছুঁড়ছে না। তবে এখনও সাইটে ছাই এসে পড়ছে। সাগরের দিকে তাকাল সে।

'জানি, কী বলবে,' হুয়েঙের না-বলা কথাটা বলল ফু-চুং।

হাত তুলে দেখাল হুয়েং। 'ওরা আবারও মাছ নিয়ে আসছে! রাতে মাছের ভর্তা পাবে!'

জোড়া ট্রলার সৈকতের দিকে ফিরছে আবারও। মোটাসোটা ট্রলারগুলো একমুহূর্ত দেখল ফু-চুং। একদল গাল ও-দুটোর পিছু নিয়ে আসছে। ট্রলারগুলো ফিরে আসবার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। সরোকিন ঠিক করেছে ক্রীতদাসদের জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে ফেলে যাবে। তা হলে মানুষগুলোকে কেন খেতে দেবে? মনোযোগ দিয়ে দেখল ফু-চুং, ট্রলারগুলো স্বাভাবিক গতির চেয়ে জোরে ছুটে আসছে। ওগুলোর বো-এর ধাক্কায় ফেনা তৈরি হচ্ছে। মাছ পাওয়ার জন্য গালগুলো ডানা ঝাপটে পিছু নিয়েছে। এবার ফু-চুং বুঝতে পারল, দুই বোটের হোল্ড এখন খালি। ওগুলো আড়াআড়ি ভাবে জেটির দিকে আসছে না, যে টাগ-বোট প্রসেসিং প্ল্যান্ট নিয়ে যেতে অপেক্ষা করছে, সেটার দিকে চলেছে।

সতর্ক হয়ে উঠল ফু-চুং, চমকে গেল। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল ও নিজে অতি ক্লান্ত। রাশান গার্ডরা হঠাৎই সতর্ক হয়ে উঠেছে। তারা আগের চেয়ে শক্ত করে অস্ত্র ধরল, দ্রুত পায়ে কাভার খুঁজল।

'হুয়েং, জলদি আমার সঙ্গে এসো,' নির্দেশ দিল ফু-চুং।

ওরা স্লুইস বক্সের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেপারেটিং প্ল্যান্ট থেকে বিশ গজ দূরে। একদম খোলা জায়গায়। দ্রুত এখান থেকে সরে যেতে হবে। হুয়েংকে নিয়ে লম্বা টেবিলের ওপাশ দিয়ে ঘুরে টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করল। যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে, নইলে ওরা ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়বে।

পিছু নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছে হুয়েং। 'হয়েছে কী, সেটা তো বলবে?' জিজ্ঞেস করল।

ফু-চুং কোনও জবাব দেবার আগেই কাছের ট্রলার থেকে অস্ত্রের গর্জন ভেসে এল। অন্তত বারোজন স্প্যাৎসন্যাজ ইতিমধ্যে ভাল আড়াল খুঁজে নিয়েছে। তাদের

দিকে গুলি ছুটে আসছে, কিন্তু তারা কাভার পেয়ে যাওয়ায় গুলি তাদের গায়ে লাগবে না। লোকগুলো উল্টো পাকিস্তানি গার্ডদের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। এখন তারা জানে, পাকিস্তানিরা তাদের দিকে গুলি করছে। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর দু'দলের মধ্যে বিরামহীন গোলাগুলি শুরু হলো। কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে ট্রেসার বুলেট লেজার বিমের মত ছুটোছুটি করছে। হতক্লান্ত শ্রমিকরা অনেক ধীর গতিতে নড়ছে, অনেকে এটাও জানে না যে শুয়ে পড়তে হবে। প্রথম ধাক্কায় অন্তত পনেরোজন শ্রমিক গুলি খেয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ল।

অন্তত পঞ্চাশজন গার্ড ট্রলারের আততায়ীদের সঙ্গে মিলে গুলি ছুঁড়ছে। তারা শত্রুদের একমুহূর্তে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রাশানদের আধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ তাদের বাঁচিয়ে দিল। দ্রুতই নিজেদের উপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল তারা। আগ্নেয়াস্ত্রের লড়াই শুরু হলো। রাশানরা কেউ অ্যাম্বুশে পড়েনি, বরং তাদের গুলিতে পাকিস্তানিরা একজন দু'জন করে মারা পড়ছে।

গার্ডরা প্রায় একই সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সরোকিন আছে এখন ওয়ালজ্যাকের সঙ্গে, তাদের ক্রুজ শিপে। সোনার মজুদ ওখানে রাখা হয়েছিল। এখন চলে গেছে ড্রাই-ডক ও টাগ-বোটে।

বিশ্বাসঘাতক খান এরইমধ্যে কয়েকজন গার্ডকে নিয়ে উঠে পড়েছে কন্টেইনার ভরা টাগ-বোটে। ওদিকে দ্বিতীয় টাগ-বোটের সঙ্গে বার্জটা আটকে দেয়া হয়েছে। টাগের ক্যাপ্টেন চাইলেই পালাতে পারবে না। এক ইঞ্চি মোটা কেবল কাটতে অনেক সময় লাগবে।

ড্রাই-ডকের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে টাগ-বোটকে। ওটার চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া বেরোল। বোটের স্টার্নের পিছনে কালো পানি ছিটকে উঠছে। প্রচণ্ড টানে আইসোপোডের স্ক্রুগুলো ভেঙে যেতে চাইল। ড্রাই-ডকের সমস্ত পানি দূর হওয়ার আগেই টাগ-বোট সরে যেতে চাইছে।

ফু-চুং ও হুয়েং দ্রুত পায়ে টিলা বাইছে। কয়েকজন গার্ড ওদের পাশ কাটাল, দৌড়ে নীচে চলে গেল। তারা ওয়াটার ক্যাননের কাজ দেখাশোনা করছিল। উপর থেকে আরও গার্ড আসছে। একটা বোল্ডারের আড়াল নিল ফু-চুং, অপেক্ষা করল। গার্ডরা ছুটে নেমে যাচ্ছে। তাদের একজন বোল্ডারের কাছ দিয়ে ছুটছে। এই অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল ফু-চুং, চট্ করে বেরিয়ে এল ও, লোকটার নাকের উপরে প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল। পিছলে গেল লোকটা, কাদার মধ্যে পড়ল। একটানে তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিল ফু-চুং, কুঁদোটা গায়ের জোরে নামিয়ে আনল লোকটার কপালে। ঠাস্ করে ফাটল কপালের হাড়, ডেবে গেল মগজে। লোকটা কিছু বুঝবার আগেই মারা গেছে।

রাইফেল হাতে চারপাশ দেখল ফু-চুং। কী ঘটেছে কেউ দেখেনি। একে-ফোরটিসেভেন কক্ করাই আছে। হুয়েঙের দিকে তাকাল ফু-চুং, নিচু স্বরে বলল, 'এবার প্রতিশোধ!'

গত পঁচিশ বছরে সি অভ ওখোটস্ক-এ এরকম তুমুল ঝড় আসেনি। খ্যাপা ঝড়ের মাঝখানে পড়েছে মার্ভেল। দুটো নিম্ন-চাপ মিলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যেদিকে

যতদূর চোখ যায়, সমুদ্র ফুঁসছে। প্রকাণ্ড ঢেউগুলো ছুটে চলেছে কোথায় কে জানে! তীব্র হাওয়া সাগর ছিন্নভিন্ন করতে চাইছে, শোঁ-শোঁ আওয়াজে ঢেউয়ের মাথা ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কালো-ধূসর মেঘের গায়ে নীলচে বিদ্যুৎশিখা খেলছে, কড়াৎ করে চাবুক কষছে সাগরের বুকে নেমে এসে। তাপমাত্রা অনেক কমে গেছে। বরফ-ঠাণ্ডা বৃষ্টি কাত হয়ে ধেয়ে এসে ঝমাঝম পড়ছে মার্ভেলের ডেকে।

ঢেউগুলো পাহাড়ের মত উঠছে, মার্ভেল ওগুলোর পিঠে চড়ছে। বো-টা কালচে মেঘের দিকে মাথা তুলছে, তারপর ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ছে আরেক ঢেউয়ের মাথায়। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ হচ্ছে এর ফলে। ছিটকে ওঠা ফেনাগুলো মার্ভেলের চিমনি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মার্ভেল সারাজীবনই বুঝি এই ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার মধ্যে ছিল। স্টার্ন দ্রুত উঠছে, বো ঢেউয়ের সঙ্গে নেমে যাচ্ছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলো তখন আর পানি কাটছে না। মার্ভেল যখন দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের খোড়লে থাকছে, তখন বাতাসের গর্জন একদম থামছে—জাহাজে নৈঃশব্দ্য নামছে। ব্রিজে দাঁড়ালে মনে হয় নীচের কালো সাগর গপ্ করে গিলে নেবে জাহাজটাকে।

এসব ক্ষণে মনে হচ্ছে মার্ভেল পাতালের দিকে নেমে চলেছে। বড় ঢেউগুলো সামনের সমস্ত হ্যাচ ডুবিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে সবাই ওজন-শূন্য হয়ে গেছে, যে-কোনও সময় ধপ্ করে পড়বে। রেডিয়োর তারগুলো ছাদে গিয়ে ছিটকে লাগছে। ইঞ্জিনগুলো কর্কশ গর্জন ছাড়ছে, উন্মত্ত ঢেউ কেটে জাহাজ নিয়ে উপরে উঠছে। আবার নীচের দিকে মাথা নামিয়ে নিচ্ছে বো। ডেকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঢেউয়ের পর ঢেউ, ডেরিক ও সুপারস্ট্রাকচারে গিয়ে বাড়ি মারছে। থরথর করে কাঁপছে জাহাজ। রেইলিঙের উপর দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে। বাড়তি পানি হড়হড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে স্ক্যাপারগুলো দিয়ে।

সমস্ত পানি বেরিয়ে গেলে বো আবারও মাথা তুলছে, পরবর্তী ঢেউয়ের গায়ে চড়ছে। এ-ই চলছে বারংবার।

দুটো কারণে মার্ভেল এখনও ভেসে আছে, এগিয়ে চলেছে—প্রথম কারণ ওটার অসাধারণ ম্যাগনেটোহাইড্রো-ডাইনামিক ইঞ্জিনগুলো। মার্ভেলের টিকে থাকবার দ্বিতীয় কারণ, ওটার ক্যাপ্টেন। মার্ভেলের সবাই জানে, গগল না থাকলে এই ঝড়ে নিঃসন্দেহে ওরা ডুবে মরত।

ঝড় শুরু হওয়ার পর ব্রিজের সিনিয়র স্টাফরা সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকছে। সবার রুটিন নষ্ট হয়ে গেছে। এখন টিনের খাবার খেয়ে যে-যার কাজ করে চলেছে। রানা বসে আছে ওর চেয়ারে। দু'দিন হলো ওরা ঘুমাতে পারেনি। সবাই সিট-বেল্ট আটকে চেয়ারে বসে আছে, শুধু হেলম-এ দাঁড়িয়ে আছে গগল। মার্ভেলের সফিসটিকেটেড অটোপাইলট সিস্টেমকে বিশ্বাস করছে না ও। জিনিসটা এখনও গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। ফ্ল্যাট-স্ক্রিন ডিসপ্লেতে জাহাজের চারপাশ দেখছে গগল। বড় ঢেউগুলো খেয়ালে রেখে এগিয়ে চলেছে। রেইডার ও থ্রটল নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। গগল বারবার সেন্ট্রাল ডিসপ্লেতে স্পিড ইণ্ডিকেটর দেখছে। মার্ভেলের এগোনোর গতি, তলের গতি, চারপাশের পানির

ধাক্কা ইত্যাদি হিসাবে রাখছে। ঝড়টা একশো পনেরো মাইল গতিবেগ তুলে উত্তর-পুবে ছুটছে। জেদি গগল ওটাকে এড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে যেতে চাইছে।

নিজে রানা বহুবার জাহাজ চালিয়েছে, ও জানে গগল যা করছে নিজে হলেও সে-চেষ্টাই করত। এমনিতেই ফু-চুঙের বাঁচবার সুযোগ অনেক কমে গেছে। কামচাটকার ওই এলাকায় অগ্ন্যুৎপাত হলে একটা মানুষও বাঁচবে না। লাভা উদ্গিরণ হওয়ার আগেই সবাইকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে।

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস হয়তো প্রকৃতিকে হারিয়ে জিতেই যাবে। মিটিওরলজিকাল ইনর্ফমেশন বলছে ওরা ঝড়ের বাইরের মুখে চলে এসেছে। ব্যারোমিটারের কাঁটা দ্রুত উঠছে। বৃষ্টি একটু হলেও কমেছে, এখন তীরের মত এসে পড়ছে না। ঢেউ আসবার গতি আগের চেয়ে কম। একেকটা এখনও পাহাড়ের মত উঁচু, কিন্তু অনেকটা সময় নিয়ে আসছে।

জিপিএস দেখল রানা, বুঝে নিল মার্ভেল এখন কোথায় আছে। মনে মনে হিসাব কষল। ফু-চুং এখনও ষাট মাইল দূরে। মার্ভেল ঝড় থেকে বেরিয়ে গেলে চল্লিশ নট গতিতে এগিয়ে যেতে পারবে। আন্দাজ দেড় ঘণ্টা পর উপকূল দেখা যাবে। ওরা ছয় ঘণ্টা হাতে পাবে, তারপর আবারও পড়তে হবে ধেয়ে আসা ঝড়ের কবলে। কামচাটকার ওই সৈকতে কয়েক হাজার মানুষ আছে। তাদের উদ্ধার করবার জন্য বেশি সময় পাবে না ওরা। মার্ভেলে মাত্র আড়াইশো লোক তোলা যাবে। ওরা কপ্টার ও সাবমারসিবলগুলো সরিয়ে ফেললে সব মিলে এক হাজার মানুষ নিতে পারবে। কিন্তু ঝড়ের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হলে মানুষ উদ্ধার করা যাবে না। সেক্ষেত্রে বহু মানুষ মরবে।

'রানা, আমি একটা কনট্যাক্ট পাচ্ছি,' রেইডার রিপিটার দেখছে উর্বশী, সোজা হয়ে বসল।

'জিনিসটা কী?'

'ঝড়ের কারণে ভাল বোঝা যাচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে ওটা দ্য চুহার বোন। চল্লিশ মাইল দূরে একইসঙ্গে দুটো হিট পাচ্ছি, দুটোই কাছাকাছি। একটা অন্যটার চেয়ে অনেক বড়। সম্ভবত দ্য চুহি আর ওটার একটা টাগ-বোট।'

'কোর্স আর স্পিড?'

'মিস্টার ফু-চুঙের ট্র্যান্সপণ্ডার যেখান থেকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে, ওগুলো সেখানেই আছে। দক্ষিণে এগিয়ে আসছে। ঘণ্টায় বড়জোর ছয় নট। আমাদের স্টার-বোর্ডে পড়বে, বাধা না দিলে দশ মাইল দূর দিয়ে যাবে।'

কমিউনিকেশন স্টেশনে বসে আছে আতাসি, তার দিকে তাকাল রানা। 'ফু-চুঙের সিগনাল কি সরে গেছে?'

'আট ঘণ্টা আগে সাড়া পাওয়া গেছে। পরে সরে গিয়ে থাকলে পারে।'

ফু-চুং এখন দ্য চুহির ডেকে থাকতে পারে। তবে রানা ধারণা করছে, ও সঙ্গীদের ছেড়ে সরবে না। সম্ভবত এখনও সৈকতে রয়ে গেছে।

'দ্য চুহি যাক,' বলল রানা। 'পরে ওটাকে ধরা যাবে।'

'আগেরবার মুদাস্সর আলী খান আমাদের বোকা বানিয়েছে,' বলল উর্বশী। 'দ্য চুহিকে আগে ধরলে ভাল হতো না?'

'ওটা একবার ঝড়ের মধ্যে পড়লে চল্লিশ নট গতিবেগের হাওয়া ওটাকে ধরে বসবে,' বলল গগল। 'ড্রাই-ডকের ব্যালাস্ট কমিয়ে আনলেও শরীরটা পালের মত বাধা দেবে, টাগ-বোট চাইলেও এগোতে পারবে না। এমনও হতে পারে আবারও উত্তরদিকে চলতে বাধ্য হবে।'

'ওই সময়ে আমরা ফু-চুঙের কাছে চলে যাব,' বলল রানা। 'ওখানে সৈকতে অনেক মানুষ আটকা পড়েছে। ওদের উদ্ধার করতে পারব। ওখান থেকে সরে এসে দ্য চুহিকে ধরব। ...সম্ভবত ওটার রেইডার মার্ভেলের মতই আধুনিক। ওটাকে জ্যাম করা দরকার।' উর্বশীর দিকে তাকাল রানা। 'আমাদের তরফ থেকে কমপ্লিট রেইডার ব্ল্যাকআউট করো।'

নড়েচড়ে বসল উর্বশী। 'দ্য চুহিতে সফিসটিকেটেড রেইডার থাকলে ওরা জেনে যাবে আমরা জ্যাম করেছি।'

'আমরা এখনই হিট্ করলে টের পাবে না,' বলল রানা।

'বস্ ঠিক বলেছেন,' বলল আতাসি। 'ওদের রেইডার এখন ঝড়ের দিকে তাক করে রয়েছে। বিশাল সব ঢেউয়ের ব্যাকস্ক্যাটার তো আছেই, সঙ্গে আছে একটু পর পর বজ্রপাত—ওরা আমাদের দেখবে না। এখন জ্যামার্স কাজে লাগালে কী হয়েছে টেরও পাবে না।'

'রেইডার, রেডিয়ো, সমস্ত স্যাটালাইট আপলিঙ্কস বন্ধ করে দিচ্ছি,' বলল উর্বশী। ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'গগল, আমরা দ্য চুহিকে এড়িয়ে এগোব,' বলল রানা। 'কোর্স পাল্টে নাও। অন্তত বিশ মাইল দূরত্ব রেখে এগিয়ে চলো।'

'সেটাই ভাল,' কম্পিউটারের বাটন টিপে কোর্স নির্ধারণ করল গগল।

তিরিশ মিনিট পর রেইডারে প্রথমবারের মত সৈকত ধরা পড়ল। ছ'টা ধাতব কনট্যাক্ট একইসঙ্গে পাওয়া গেল। পাঁচটি সৈকতে গেঁথে আছে, অন্যটি হয়তো কোনও টাগ-বোট—ওটা আছে গভীর পানিতে, তীর থেকে একশো গজ দূরে।

এঅ্যারিয়াল ড্রোন পাঠিয়ে এলাকাটা দেখতে চাইল রানা। কিন্তু ক্যাপ্টেন সিরাজ বললেন এই ঝোড়ো বাতাসে ওটা দশ সেকেণ্ডও টিকবে না। উনি জানতে চাইলেন চট্ করে রবিনসন নিয়ে চারপাশ দেখে আসবেন কি না। ট্যাকটিকাল ডেটা পেলে ওদের জন্য হামলা করা অনেক সহজ হতো, কিন্তু বারণ করল রানা। কপ্টার নিয়ে উড়লে শত্রুদের চমকে দেওয়া যাবে না। আরও সমস্যা আছে, ওটার এয়ার ফিলটারেশন সিস্টেম ভারী ছাই ঠেকাতে পারবে না, যে-কোনও সময় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে খসে পড়বে কপ্টার।

ক্যাপ্টেন সিরাজ প্রস্তুত অবস্থায় হ্যাঙারে অপেক্ষা করছেন। ছটফট করছেন কিছু একটা করবার জন্য।

পিন মাইক হেডসেটে রানা বলল, 'ক্যাপ্টেন সিরাজ, আপনি রিজার্ভে থাকুন, দরকার পড়লে আপনাকে ডাকব আমরা। পাঁচ মিনিটের অ্যালার্টে উড়তে হবে।'

পাঁচ মিনিটের অ্যালার্ট মানে হোল্ডের হ্যাচ খোলা মাত্র রবিনসন তৈরি থাকবে। আগে থেকেই ইঞ্জিন চালু থাকবে, টেমপারেচার উপরে তুলে রাখা হবে। ডেকে উঠে এলেই রওনা হওয়া যাবে।

'অপেক্ষায় থাকলাম, মিস্টার রানা,' জানিয়ে দিলেন সিরাজ।
এবার সবাই স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিল।
অনিল উইপন্স স্টেশনে বসে আছে, গ্যাটলিং গান ও চল্লিশ এমএম অটোক্যাননের উপর থেকে কাভার সরিয়ে দিল। ডেকের .৫০ ক্যালিবারের গিম্বল মেশিনগান লোড করা শেষে লক করা হলো। জোড়া টিউবের মধ্যে ঢুকে গেল টর্পেডো, আউটার হাল ডোর বন্ধ হলো। অনিল প্রতিটি ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখল, সব ঠিক আছে। আতাসি দ্বিতীয়বার কমিউনিকেশন ও রেইডার সিস্টেম দেখে নিল। উর্বশী অ্যাসল্ট টিম নিয়ে তৈরি। ড্যামেজ কণ্ট্রোল টিম যার যার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। সোহেল সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কমাণ্ডোরা চলে গেছে বোট-গ্যারাজে। তিন মিনিট পর ওখানে হাজির হলো উর্বশী। ডক্টর ফারা মেডিকেল বে-তে কিচেনের স্টাফদের নিয়ে অপেক্ষা করছে। কেউ আহত হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা দেবে।
জাহাজের ওয়াইড চ্যানেলে কথা বলল রানা, 'অ্যাটেনশান, অল হ্যাণ্ডস্। মাসুদ রানা বলছি। মন দিয়ে শোনো। সৈকতে আমাদের একজন আটকা পড়েছে। মিস্টার লিউ ফু-চুং। আমাদের প্রথম কাজ তাকে উদ্ধার করা। একইসঙ্গে আমাদের আরেকটা দায়িত্ব দ্রুত নিরীহ মানুষ সরিয়ে নেওয়া। ওখানে কত লোক আছে এখনও জানি না আমরা। ধরে নেওয়া যায় তাদের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। আবারও বলছি, এদের সরিয়ে নিতে হবে। যে-কোনও সময় পর্বত থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে, কাজেই দ্রুত কাজ করতে হবে। প্রত্যেকে মাথায় রেখো, আমরা মার্ভেলকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলব না।
'আমরা ওখানে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করব, কাজেই প্রত্যেকে পাশের জনের দিকে খেয়াল রাখবে। আমরা আর বড়জোর একঘণ্টা পর শত্রুদের মুখোমুখি হবো। আমাদের হেরে যাওয়া চলবে না। মনে রেখো হাজারো মানুষের ভাগ্য আমাদের উপর নির্ভর করছে। আমার আর কিছু বলার নেই। তোমরা মানসিক ভাবে তৈরি হয়ে নাও।'
রেডিয়ো বন্ধ করে দিল রানা।
নেট-এ কমাণ্ডোদের আলাপ শোনা গেল, 'মাসুদ ভাই রাজনৈতিক নেতাদের মত জমিয়ে বলতে পারেন না!'
'না পারুন, বিপদে পাশে পাওয়া যায়!'
চুপ হয়ে গেল সবাই।

দশ

অ্যাসল্ট টিমের সঙ্গে দেখা করবার আগে নিজের কেবিনের ফিরল রানা, পোশাক পাল্টে কালো ফেটিগ পরে নিল, সঙ্গে কেভলার ভেস্ট ও কমব্যাট হার্নেস। কিডনি হোলস্টারে পুরল একটা এফএন ফাইভ-সেভেনএন পিস্তল। শোল্ডার হোলস্টারে

থাকল প্রিয় ওয়ালথার। সঙ্গে নিল এম-ফোরএওয়ান অ্যাসল্ট রাইফেল। কোমরের পাউচে রাখল ছয়টা ম্যাগাজিন। চার ইঞ্চি ফলাওয়ালা গার্বারটা থাকল কাঁধের স্ট্র্যাপে। এবার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে বোট-গ্যারাজে চলে এল।

ভিতরের পরিবেশ শীতল, ভেজা-ভেজা। সবাই শেষ মুহূর্তে অস্ত্র ও নেটওয়ার্ক পরীক্ষা করছে। জোডিয়াক ব্যবহার করা হবে না। এখন গ্যারাজের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে রাবার-রিম্ড্ পলিকারবোনেট-হাল্ড্ অ্যাসল্ট বোট। ওটার মাঝখানে বসে আছে প্রায়-নিরাপদ হুইল-হাউজ। বোটে দুটো আউটবোর্ড ইঞ্জিন। এই বোট ক্ষিপ্ত সাগরে এগিয়ে চলতে সক্ষম, পঞ্চাশ নট গতি তুলে ছুটতে পারবে।

গ্যারাজের বাতিগুলো এখন বাইরের পরিবেশের সঙ্গে মিশে ম্লান ভাবে জ্বলছে। সবাইকে ফ্যাকাসে লাগল, যেন রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে। তবে চোখ জ্বলছে ওদের, নড়াচড়ায় চিতা-বাঘের ক্ষিপ্রতা। একজন আরেকজনের ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করছে। ম্যাগাজিনগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় ক্লিক করে বসে যাচ্ছে। কক্ করা হচ্ছে রাইফেল।

গ্যারাজের আরেক প্রান্তে জুডি স্টিভেনসনকে দেখতে পেল রানা। মেয়েটা অ্যাসল্ট ফোর্সের সঙ্গে যাবে। ধরে নেওয়া যায় সৈকতে মুখোমুখি লড়াই হবে, সেটার জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ লাগে, কাজেই রানা জানিয়ে দিয়েছে, সে বোটে থাকতে পারে, কিন্তু মাটিতে নামতে পারবে না। মার্ভেলের অ্যাসল্ট টিম বারংবার একসঙ্গে ট্রেনিং করেছে, পরস্পরের ইশারা জানে, আক্রমণের পদ্ধতি চেনে, কাজেই অন্য কেউ ইচ্ছে করলেই তাল মিলাতে পারবে না, বরং টিমের সবার মনোযোগ সরিয়ে দেবে।

অ্যাভালাঞ্চের সবাই মারা যাওয়ায় জুডি যেন নিজেকে দোষ দিচ্ছে। রানা জানে, কখনও কখনও মানুষ এমন ভাবেই ভেবে নেয়। জুডিকে বারবার বুঝিয়েছে ও, কিন্তু মেয়েটা যাবেই। জেদ দেখে শেষপর্যন্ত সম্মতি দিয়েছে ও, তবে বোটেই থাকতে হবে তাকে—ডাঙায় উঠবার জন্য জেদ করতে পারবে না। এর ফলে জুডি প্রতিশোধ নিতে না পারলেও, শত্রুদের মরতে দেখে শান্তি পাবে মনে।

রানার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল জুডি—সে যুদ্ধে যেতে তৈরি। জবাবে হাসল রানা। ওর হেডসেটে কড়কড় আওয়াজ হলো, সোহেলের কণ্ঠ ভেসে এল, 'কী করিস, রানা? অনিল বলেছে এক মিনিট পর সৈকতের ভিডিও দেখা যাবে। ছবি তোর কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে।'

অ্যাসল্ট বোটের গানেল টপকে ডেকে নেমে গেল রানা, ককপিটে চলে এল। ফ্ল্যাট-প্যানেল ডিসপ্লে অন করল। মার্ভেল ঢেউয়ের দোলায় নাচছে বলে ক্যামেরা নড়ছে, ছবি ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে সরছে। ক্যামেরাগুলো জুম করে সৈকতে তাক করেছে অনিল, একাগ্র দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে আছে। মার্ভেল এইমাত্র উপসাগরে ঢুকেছে, ছুটছে সৈকতের দিকে।

অনিল ক্যামেরায় প্রথমে একটা ভাসমান বার্জ দেখাল। ওটার উপরে একটা ধাতব বিল্ডিং। রাইফেলধারী লোকগুলো ওটা দখল করতে চাইছে। চারপাশে

গোলাগুলি চলছে। ওখানে যে-লোকগুলো, তাদের মত লোক চিন-সাগরে দেখেছে ওরা। গভীর রাতে, মার্ভেলে, যখন জলদস্যুরা ডেকের উপরে উঠে এসেছিল। এখন বার্জের সঙ্গে টো লাইন নিয়ে ভাসছে একটা টাগ-বোট, আরেকদল ওখানে আক্রমণ করেছে। ক্যামেরা ঘুরে গেল, সৈকতের দিকে অসংখ্য মানুষের দৌড়াদৌড়ি। কাদাভরা টিলা বেয়ে উঠছে তারা। অস্ত্রধারীরা টিলা ও সৈকতে, শত্রুদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। রানা বুঝতে পারল, ওরা রেইডারে সৈকতে যে জাহাজগুলো দেখেছে, সেগুলো আসলে পুরোনো ক্রুজ লাইনার। পাথুরে সৈকতে গেঁথে গেছে সব। কিন্তু মনে হলো ওগুলোর মধ্যে একটা কমবেশি নতুন জাহাজ। এবার অনিল চট্ করে বহুদূরের আগ্নেয়গিরির শট দেখাল। পর্বতের মাঝখানের চূড়া বাষ্প ছাড়ছে, ভলকে ভলকে কালো ধোঁয়া ছাড়ছে, সেই সঙ্গে বেরুচ্ছে ছাই।

রানা ট্যাকটিকাল সুবিধে ও পরিস্থিতি খেয়াল করছে, মনে মনে রণক্ষেত্র সাজিয়ে নিল, একের পর এক নির্দেশ দিল। কমাণ্ডোরা চুপচাপ শুনল, তারপর তাদের একদল জাহাজের করিডোর ধরে ছুটে চলে গেল, মার্ভেলকে রক্ষা করবে। সবাই লড়াইয়ের জন্য মানসিক ভাবে তৈরি, আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

পাঁচ মিনিটে মার্ভেল আরও এগোল। এবার ওরা সবাই কালো ইউনিফর্ম পরা একদল লোক দেখতে পেল। ককেশিয়ান লোকগুলো মার্ভেলকে পাত্তা দিল না। কিন্তু মুদাস্সর আলী খানের লোকজন জাহাজের দিকে গুলি করছে।

মার্ভেলের কয়েকজন ডেকহ্যাণ্ড অ্যাসল্ট বোটের গা থেকে শেকল সরিয়ে নিল। রানা ও সোহেলকে জানিয়ে দিল ওরা এখন রওনা হবে, মার্ভেলকে যেন তীর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। খানের লোকজন আস্ত একটা জাহাজ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে গুলি করছে, সেই সুযোগটা পেল রানা, বোট-গ্যারাজ খুলে দেয়া হলো।

গেট উপরের দিকে উঠে যেতেই কমাণ্ডোরা লাফ দিয়ে বোটে উঠল। টিমের মেম্বাররা নিজেদের নাম ডাকল, ওরা সবাই বোটে উঠেছে। কমাণ্ডো আবু কাশেম ইঞ্জিন চালু করতেই গ্যারাজ-বোট মাস্টারের উদ্দেশে মাথা দোলাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোলিক পুলিগুলো বোটকে গুলতির মত ছিটকে দিল। র‍্যাম্প বেয়ে সাগরে এসে পড়ল বোট। গতি যথেষ্ট, কাশেম সাগরে প্রপেলার নামিয়ে দেয়ায় আরও বাড়ল। বিশাল আউটবোর্ড ইঞ্জিনগুলো সাগর ছিঁড়ছে। পানি মার্ভেলের গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া সবার হাতে-মুখে কামড় বসাল। সাগরের পানির ছিটে লাগলে মনে হয় শরীরে আগুন ধরে গেছে। অ্যাসল্ট বোট বাঁক নিয়ে একটা জং ধরা ফ্রেইটারের দিকে ধেয়ে চলেছে। দেখতে না দেখতে গতিবেগ পঞ্চাশ নটে উঠে গেল। সৈকত থেকে কেউ আন্দাজে গুলি করতে পারে, কিন্তু দ্রুতগতির ফলে কারও গায়ে লাগানো প্রায় অসম্ভব।

কাশেম বোট নিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে, রানা ওকে বলেছে সৈকতের ঠিক কোথায় উঠতে চায়। ওরা একটা জাহাজের আড়ালে চলে যেতে চাইছে। জাহাজটা সৈকতের ওখানে এত দেবে গেছে যে শ্রমিকরা জাহাজের ডেকে উঠতে পাথরের সেতু বানিয়েছে। জাহাজের চারপাশে এত জঞ্জাল জমেছে যে, এখন আর জোয়ারের পানি ওগুলো সরিয়ে নেয় না।

অ্যাসল্ট বোট সৈকতের কাছের অগভীর পানিতে চলে এল, তীর মাত্র দু'গজ দূরে। কমাণ্ডোরা লাফ দিয়ে পানিতে নেমে পড়ল। সৈকতে ছোট-বড় বোল্ডারের অভাব নেই, আড়াল খুঁজে নিল ওরা। রানা ও উর্বশী দোতলা বাড়ির মত প্রকাণ্ড একটা বোল্ডারের পিছনে থামল। ইতিমধ্যে কাশেম বোট নিয়ে গভীর পানিতে চলে গেছে। রানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল, জুডি ওর নির্দেশের অন্যথা করেনি। সৈকতে নামার জন্য জেদ ধরেনি। মেয়েটার বুদ্ধি আছে, অভাব নেই সাহসেরও। এখন খোলা জায়গায় পাইলট-হাউজে কাশেম আর জলিলের পাশে দাঁড়িয়ে সৈকত দেখছে।

'কী করবে ভাবছ, রানা?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী।

'দুই দল লড়াই করছে, আমরা তার মধ্যে হাজির হয়েছি,' বলল রানা। 'সম্ভবত মুদাস্‌সর খানের ছেলে একদল লোককে নির্দেশ দিচ্ছে। ওপাশে আছে সরোকিনের লোক, কালো পোশাক পরা।'

তিক্ত হাসল উর্বশী। 'আমার শত্রুর শত্রু মানেই আমার বন্ধু নয়, কী বলো?'

'তা-ই আসলে!'

ওদের সঙ্গী কমাণ্ডোরা ক্রুজ লাইনারটা বামে রেখে ক্রল করে এগিয়ে চলেছে। ওপাশে খান ও সরোকিনের লোকজন তুমুল গোলাগুলি করছে। রানার দলের সবাই সৈকত পেরিয়ে টিলার পায়ের কাছে চলে গেল। টিলার গায়ে চুপচাপ পড়ে আছে অনেকে—চাইনিজ, বাঙালি, থাই, নানান দেশের মানুষ। অস্ত্রধারী কমাণ্ডোদের দেখে ভয়ে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল সবার। রানা মানুষগুলোকে বাংলা, হিন্দি, ম্যাণ্ডারিন ও থাই ভাষায় আরও দূরে গিয়ে আড়াল নিতে বলল। কিন্তু নিশ্চল চেয়ে রইল ওরা, যেন ভয়ে জমে গেছে, ধরে নিয়েছে মরতেই হবে।

রানা বুঝতে পারছে, এসব মানুষকে উদ্ধার করতে হলে আগে লড়াই বন্ধ করাতে হবে।

'রানা, আমরা তৈরি,' ট্যাকটিকাল নেট-এ সোহেলের কণ্ঠ শোনা গেল।

মার্ভেল ইতিমধ্যে অবস্থান পাল্টেছে, এখনও ওটার গ্যাটলিং গান ঢেকে রেখেছে, কিন্তু জাহাজ তাক করেছে মাছধরা ট্রলারগুলোর দিকে। দুই ট্রলার মোটা দড়ি দিয়ে টাগ-বোটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

'আমরাও প্রায় তৈরি,' বলল রানা। 'তোরা ফু-চুংকে দেখতে পেলি?'

'না। অনিল এখন উইপন্স নিয়ে ব্যস্ত। আতাসি ওর কাছ থেকে ক্যামেরা বুঝে নিয়েছে। ও ভাল ছবি পাচ্ছে, কিন্তু সৈকতে এত লোক যে আমাদের কম্পিউটারের ফেশাল রিকগনিশন সফট্‌ওয়্যার হিমশিম খাচ্ছে।'

'সৈকতের যেখানে লড়াই বেশি হচ্ছে, ওখানে ফু-চুংকে খুঁজতে বল্,' বলল রানা। 'সুস্থ থাকলে ও লড়াই করছে।'

'ভাল কথা বলেছিস। ...আতাসি?'

'শুনেছি, বস্,' বলল আতাসি। 'ক্যামেরা অন্যদিকে সরিয়ে নেব এখন।'

কমাণ্ডোদল নিয়ে কাদাভরা টিলা বেয়ে উঠছে রানা। ঝুঁকে ছুটল সবাই। আড়াই শো ফুট উপরে উঠে থামল ওরা। সৈকত এখন অনেক নীচে। ওদিকে আর তাকাল না কেউ। টিলার বুকে চোখ বোলাল। সাইটের এই এলাকায় প্রচুর

মাটি তোলা হয়েছে। ওয়াটার ক্যানন দিয়ে শক্ত মাটি ধসিয়ে দিয়েছে। নজলগুলো এখন আকাশে পানি ছুঁড়ছে। মাটিতে অসংখ্য কোদাল ও বালতি পড়ে। গোলাগুলি শুরু হওয়ায় ক্রীতদাসরা পালিয়ে গেছে। তাদের গার্ডরাও এখানে নেই, সৈকতে নেমে গিয়ে লড়াই করছে।

সবাইকে নিয়ে সাবধানে এগোল রানা। রাইফেল বাগিয়ে তৈরি হয়ে আছে সবাই। চোখ একই জায়গায় দ্বিতীয়বার শত্রু খুঁজছে না।

অনেক নীচে বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল ওরা। গ্রেনেড। বার্জের ওপাশে ফেটেছে। চট্ করে ওদিকটা দেখে নিল সবাই। সরোকিনের এক লোক, কালো ইউনিফর্ম পরা দেহটা অলস ভঙ্গিতে আকাশে ভেসে উঠল, উড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে সৈকতে পড়ল। এত উপর থেকে লাশটা ছোট্ট একটা স্তূপ মনে হলো। পরমুহূর্তে ওরা কানের কাছে একে-ফোরটিসেভেনের গর্জন শুনতে পেল।

মুহূর্তে মাটিতে শুয়ে পড়ল সবাই। চারপাশে কাদা ছিটকে গেল। রিফ্লেক্সের কারণে গুলি করল এক কমাণ্ডো, সামনের একটা ওয়াটার ক্যাননের চারপাশে বুলেট বিঁধল। মুহূর্তে তার অর্ধেক ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল। এটা ভাল ওয়ার ডিসিপ্লিন বলা যায় না, তবে আক্রমণকারী গুলির ভয়ে সরে গেছে। ওখান থেকে আর দ্বিতীয়বার গুলি এল না।

তবে লোকটাকে দেখেছে উর্বশী, তিন রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করল ও—বুকে গুলি খেল লোকটা, পিছিয়ে গিয়ে কাদা ভরা পুকুরের মধ্যে ঝপ করে পড়ল। লাশটা মুহূর্তে ডুবে গেল, কিন্তু পানিতে রক্ত ভেসে থাকল। রানার দলের সবাই ক্রল করে একটা নালার মধ্যে নেমে পড়ল। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর মনে হলো একদল রাইফেলধারী আকাশ থেকে পড়েছে। লোকগুলো পুকুর পাড়ের ঢালে ছিল, বেরিয়ে এসে একের পর এক গুলি করছে। প্রচণ্ড আওয়াজে চারপাশ কাঁপছে। আশপাশে একজন মজুরও নেই, আগেই পালিয়েছে।

কমাণ্ডোরা পাল্টা গুলি করল। লোকগুলো পিছু হটে পুকুরের ঢালে নেমে গেল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। উর্বশী বলল, 'এখানে এদের সঙ্গে লড়াই করার সময় নেই আমাদের।'

টিলার নীচের দিকে তাকাল রানা, সাগর দেখল। অ্যাসল্ট বোট নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেছে। এবার মার্ভেল গ্যাটলিং গান দিয়ে ওটাকে কাভার দেবে। পুকুরের পাড় দেখল রানা। ওপাশে মুদাস্সর আলী খানের পাকিস্তানিরা রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করছে, ওদের এগোতে দেবে না। লোকগুলো এরইমধ্যে আবারও পুকুরের পাড়ে উঠে এসেছে, মাঝে মাঝে গুলি করছে, ছড়িয়ে পড়ছে। এগোনো তো দূরের কথা, একটু পর পিছানোও যাবে না। এই নালায় আটকা পড়তে হবে।

থ্রোট মাইক্রোফোনে বোটের সঙ্গে কথা বলল রানা, 'কাশেম, তোমরা আমার কথা শুনছ?' কোনও জবাব এল না। আবারও ডাকল রানা, কিন্তু বোট এখনও পঞ্চাশ নট গতিতে ছুটে চলেছে, ওটার ইঞ্জিনের গর্জনে ক্রুরা কিছুই শুনবে না। বাধ্য হয়ে মার্ভেলে যোগাযোগ করল রানা। 'অনিল, তোকে দরকার। ক্যামেরায় আমাদের দ্যাখ্। উপরের টিলায় খানের অন্তত পঞ্চাশজন আছে, রাইফেলসহ। আমাদের গেঁথে ফেলেছে।'

'কাশেমরা টাগ-বোটে হামলা করবে এখন,' বলল অনিল। 'তোরা দশ মিনিট আটকে রাখতে পারবি?'

উপরের দিকে তাকাল রানা। লোকগুলো ক্রল করে দু'পাশের বোল্ডারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আড়াল পেলে এগিয়েও আসবে। 'না, ঠেকানো সম্ভব নয়,' স্পষ্ট বলল রানা। 'ওরা অনেক বেশি।'

'ঠিক আছে, রানা,' অনিলের অস্ফুট কথা শুনতে পেল রানা। 'ওদের দেখছি। ...সরি, কাশেম!'

অ্যাসল্ট টিম গানেল টপকে সৈকতে চলে যেতেই কাশেম বোট পিছিয়ে নিল। যথেষ্ট গভীরতা পাওয়ার পর বোট ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল ফিরতি পথে। খোলা সাগরে ফিরবে, তারপর পজিশন নেবে।

বোটের গতি ক্রমেই বাড়ছে। হেডসেট খুলে রাখল কাশেম, জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডাম, একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'তার আগে কথা দিতে হবে আপনি আমাকে আর কখনও ম্যাডাম বলে ডাকবেন না,' বলল জুডি। 'আপনার কী ধারণা আমি কোনও বুড়ি মেয়েলোক?'

'সরি,' হেসে ফেলল কাশেম। 'ব্রিটিশ মহিলা দেখে ম্যাডাম বলছিলাম।'

'কী জানতে চান?'

'আপনি কি বোট চালাতে পারেন?'

'লয়েডস্-এ চাকরি করি আমি, কাজেই নানান রকম বোটের চারপাশে থাকি। ক্যাপ্টেনের লাইসেন্স আছে আমার, বারো হাজার টন পর্যন্ত জাহাজ চালাতে পারি। আপনাদের দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসও।'

'আমাদের অ্যাসল্ট বোট?'

'স্পেনে ছুটিতে গিয়ে রিভা স্পিডবোট ভাড়া করে ঘুরেছি, মনে হচ্ছে এটা অনেকটা ওরকম। কেন?'

'জলিল আর আমার আরেকটা কাজ আছে, সেজন্য কাউকে তো হালটা ধরতে হবে?'

'আমরা মার্ভেল ছেড়ে চলে আসার আগে স্টিলের যে টুকরোটা এনেছেন, নিশ্চয়ই সেটা দিয়ে কিছু করবেন?'

'মাসুদ ভাইয়ের নির্দেশ,' বলল জলিল। 'উনি বলেছেন আমরা তো এই দোজখ থেকে মানুষগুলোকে সরিয়ে নেবই, একটু স্যালভেজের কাজও করব।'

দু'চোখ হেসে উঠল জুডির।

সাগরের দিকে ছুটে চলেছে বোট, তারপর বাঁক নিয়ে মার্ভেলের আড়ালে চলে এল। ছুটল এবার টাগ-বোটের দিকে। একটা ট্রলার টাগ-বোটের একপাশ থেকে সরে গেছে, কিন্তু অন্যটা এখনও দড়িতে আটকানো। টাগের ডেকে অনেকে দৌড়াদৌড়ি করছে। বেশিরভাগই জলদস্যু, কয়েকজন টাগ-বোটের ক্রু—তারা তাদের জাহাজ রক্ষা করতে চাইছে। জলদস্যুদের কিছু লোক নৃশংসতার চরম দেখাল, ম্যাশেটি দিয়ে ক্রুদের কুপিয়ে মারল।

অনিল অ্যাসল্ট বোটের উপরে চোখ রেখেছে, ওটা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে

চলেছে। ঠিক সময় বুঝে গ্যাটলিং গান চালু করতে হবে। টাগ-বোটের বিশ গজ দূরে চলে যাওয়ার পর কাশেম বুঝতে পারল, ও হেডসেট পরে নেই! সঙ্গে সঙ্গে ওটা মাথায় আটকে নিল। একইসময়ে খ্যাটখ্যাট আওয়াজে গ্যাটলিং গানের ছয় ব্যারেল জেগে উঠল। কাশেম থ্রটলের স্টিক সামনে বাড়িয়ে দিল, বোটের গতি কমিয়ে আনছে।

বিশ এমএম শেলগুলো জলদস্যুদের ট্রলারে এসে লাগল না, টাগ-বোটের ডেক ঝাড়ু চালানোর মত পরিষ্কার করে দেওয়ার কথা, কিন্তু গ্যাটলিং গানের বুলেট এদিকে এলোই না! উল্টো জলদস্যুরা টাগ-বোটের রেইলিঙের ওপাশে দাঁড়িয়ে গুলি শুরু করল! অ্যাসল্ট বোট হালকা ভাবে আর্মার্ড, ওটার চারপাশের ইনফ্লেটেবল পর্দার গায়ে অজস্র বুলেট বিঁধল, ডেক ফুটো হলো। বুলেটগুলো আউটবোর্ড ইঞ্জিনের গায়ে লেগে ছিটকে অন্যদিকে যাচ্ছে। জুডি, জলিল ও কাশেম এখনও গুলি খায়নি সেটা ওদের কপাল। কাশেম হুইল নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করল, যত দ্রুত সম্ভব টাগ-বোট এড়িয়ে সরে যেতে হবে। গোলাগুলির মধ্যে চিৎকার করে অনিলের কাছে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, সার? কাভার দেয়া গেল না?'

জবাব এল না।

এদিকে রানার দল ও পাকিস্তানি প্রহরীদের মাঝখানে জমি বিস্ফোরিত হলো। পাঁচশো তপ্ত ইউরেনিয়াম বুলেট মাটিতে গাঁথল। ওদিকে পুকুরের পাড়ের চার ফুট পুরু মাটি স্রেফ উধাও হলো। প্রহরীরা তাদের আড়াল হারিয়েছে আগেই, সবাইকে পরিষ্কার দেখা গেল। যারা সরাসরি আঘাত থেকে বেঁচেছে, তারা উড়ন্ত পাথরের আঘাতে মারা গেল। অন্তত বিশজনের বেশি লোক, মুহূর্তে লালচে কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

উর্বশী কয়েকজন কমাণ্ডো নিয়ে দেখতে গেল কেউ বেঁচে আছে কি না। নেই কেউ। থাকবার কথাও নয়। গুলি, না গোলা? ওগুলো নিজেদের কাজ শেষ করেছে। পুকুর ঘুরে এসে উর্বশী বলল, 'আমরা রওনা হতে পারি। পিছন থেকে বাধা দেয়ার কেউ নেই।'

দলের সবাইকে একত্র করল রানা, বলল, 'মনে রেখো আমরা এখন আর কাউকে চমকে দিতে পারব না। তবে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাব, মিস্টার ফু-চুংকে খুঁজে বের করব, শ্রমিকদের জড় করে সরে যাব।'

ওরা সবাই টিলা বেয়ে নামছে।

বোল্ডারের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল ফু-চুং, দেখতে চায় মার্ভেল তীরের দিকে ছুটে এলে প্রহরীরা কী করে। যা ভেবেছে, রাশানরা জাহাজের দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না, দক্ষতার সঙ্গে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখল। পরবর্তী পনেরো মিনিটে তারা খানের লোকবল চারভাগের একভাগ কমিয়ে দিল। কিন্তু পাকিস্তানি প্রহরীরা সংখ্যায় অনেক, মরিয়া হয়ে লড়াই করছে এখন। অ্যাম্বুশে পড়বার সময় রাশানরা বারোজন ছিল, তাদের চারজন ইতিমধ্যে মারা গেছে। তিনজন আহত, তবে এখনও নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারবে না, পাকিস্তানি

প্রহরীরা রাশানদের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে—সংখ্যায় তারা অনেক বেশি। যুদ্ধের ফলাফল কী হবে বুঝে গেছে রাশানরা, এখন আর জান বাঁচানোর জন্য লড়াই করছে না, যতটা পারা যায় বেশি শত্রু মারতে চাইছে।

প্রসেসিং বিল্ডিঙের ওপাশে কী যেন চোখে পড়ল ফু-চুঙের। মনে হলো খনির ম্যানেজার গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক। লোকটা ডরমিটরি জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ওয়ালজ্যাকই! সঙ্গে এক লোক! দু'জন ঢাল বেয়ে উঠে হেলি-প্যাডের দিকে চলেছে! ওখানে সরোকিনের হেলিকপ্টারটা বসে আছে। ওয়ালজ্যাকের হাতে পিস্তল, সঙ্গের লোকটার মাথায় ব্যারেল ঠেসে ধরেছে। ওই লোকটা সম্ভবত কপ্টারের পাইলট, তাকে দিয়ে জোর করে কপ্টার আকাশে তোলাবে ওয়ালজ্যাক, পালাবে। আশপাশে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনের কোনও চিহ্ন নেই। ফু-চুং আন্দাজ করল, দক্ষিণ-আফ্রিকান ম্যানেজার হয়তো সরোকিনকে খুন করে সরে পড়ছে।

ম্যানেজারের পিছু নেয়া ট্যাকটিকাল ভুল হবে, কিন্তু ফু-চুঙের বুকের মধ্যে প্রচণ্ড রাগ ফুঁসে উঠল। ভাবাবেগ কোনও যুক্তি গ্রহণ করে না। দিনের পর দিন খেটে মরেছে ও, পেট ভরে খেতে পায়নি, অপমান সহ্য করেছে, প্রচণ্ড মার তো ছিলই—এগুলো মন থেকে দূর হতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই পিশাচ ম্যানেজারটাকে খুন করলে মন কিছুটা শান্তি পাবে। সেটাই বা কম কী? ইতিমধ্যে ফু-চুং হুয়েংকে জানিয়েছে কী করতে হবে। হুয়েং যত লোক পাবে, সঙ্গে নিয়ে নতুন ওই জাহাজের দিকে যাবে। অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে, সৈকতে যেসব জাহাজ আছে, সেগুলোর চেয়ে নতুন জাহাজটার টিকে থাকবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ইতিমধ্যে রানা নিশ্চয়ই ওদের উদ্ধারের উপায় ভেবে বের করবে।

ফু-চুঙের শরীরের অবস্থা এমন নয় যে গিলবার্ট ওয়ালজ্যাকের পিছু নেবে, কিন্তু তবুও ছুটল লোকটাকে হাতে পাওয়ার আশায়। উৎসাহ ফিরে পেয়েছে ও, পায়ের পেশিতে জোর পেল, ফুসফুস ভরে বাতাস টেনে নিল। মন বলল, আরেকবার বেঁচে উঠেছে ও। ঢাল বেয়ে নেমে গেল ও, জং-ধরা কন্টেইনার ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট পেরিয়ে তীর বেগে ছুটল হেলি-প্যাডের দিকে। পাকিস্তানি প্রহরীদের যারা ওকে দেখল, প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত শ্রমিক ভেবে গুলি নষ্ট করল না। ফু-চুংও ওদের দিকে গুলি খরচ করল না। মৃত এক প্রহরীর শার্ট খুলে পরে নিয়েছে ও, একে-ফোরটিসেভেন ঢোলা শার্টের আড়ালে রেখে ছুটছে।

দু'মিনিটের মধ্যে গোলাগুলির জায়গাটা পেরিয়ে এলো ও। সামনে সাগর যেন সৈকত খেয়ে নিয়েছে। ডানে বাঁক নিয়ে টিলার পাশ দিয়ে ছুটল ও। কিছুটা জায়গা পেরিয়ে সৈকত আবারও চওড়া হয়েছে। দু'পাশে বড় বড় বোল্ডার। আরেকটু সামনে বামে ছোট্ট এক উপসাগর। ওখানে একটা মোটর লঞ্চ ভাসছে, ওটা দিয়ে টাগ-বোটে সোনা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘের দেয়া জায়গাটা যেন আলাদা একটা সৈকত। বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ফু-চুং। লঞ্চে আটজন প্রহরী উঠেছে, রওনা হবে, কিন্তু চাইনিজটাকে দেখে সবাই একইসঙ্গে চোখ তুলে তাকাল। পিছনের সৈকতে প্রহরীরা ফু-চুংকে পাত্তা দেয়নি, এদেরও তা-ই করা উচিত ছিল, কিন্তু একজন রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল। মুহূর্তে ডান দিকের

বোল্ডারের বাঁকে হারিয়ে গেল ফু-চুং। এক সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিল, সেখানে এসে লাগল এক ঝাঁক বুলেট। পাথরের কুচি ছিটকে লাগল ওর কাঁধে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল ফু-চুং। গোলাগুলি থেমে গেল। ইতিমধ্যে ও রাইফেলটা শার্টের ভিতর থেকে বের করে নিয়েছে, চট করে বাঁকের এপাশে বেরিয়ে এল।

রাইফেলধারী প্রহরী ঘুরে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, যেন খুব মজা করেছে সে। ফু-চুঙের প্রথম তিনটে বুলেট লোকটাকে একটা লাশ বানিয়ে দিল। মৃতদেহটা পাক খেয়ে সঙ্গীদের গায়ে গিয়ে পড়ল। পরবর্তী বুলেটের আঘাতে লাশটা সৈকতে এসে নামল। আরেকজনকে গেঁথে ফেলল ফু-চুং, কিন্তু অন্যরা ততক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে। দেরি না করে রাইফেল তুলেছে তারা, পাল্টা গুলি করল। কিন্তু তার আগেই পিছিয়ে গেছে ফু-চুং, বোল্ডারের আড়াল নিয়েছে। কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে পিছল বোল্ডারের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল।

পাথরটা মাত্র আট ফুট উঁচু, কিন্তু উঠতে শুরু করে মনে হলো, ওটুকু উৎরাই সমস্ত শক্তি শুষে নেবে। ওর হাতগুলো দেহের ওজন রাখতে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে। একে-ফোরটিসেভেনের ওজন যেন অন্তত একশো পাউণ্ড! বোল্ডারের মাথায় পৌঁছে গেল ও, ঠিক তখনই লঞ্চের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। পাথরের মাথাটা গোলাকৃতি, শরীর পিছলে দিয়ে সামনের অংশে পৌঁছে গেল ফু-চুং, কাঁধে রাইফেল ঠেকাল। লঞ্চের ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, প্রপেলার এখন পানি কাটছে।

জলদস্যুরা আন্দাজ করে নিয়েছে ওই চাইনিজ আবারও গুলি ছুঁড়বে। তাদের চারজন বোল্ডারের গায়ে গুলি-বর্ষণ করল। পাথরের কুচি চারপাশে ছিটকে গেল। দু'হাতে মাথা আড়াল করল ফু-চুং, পাথরের টুকরো চামড়া ছিঁড়ে দিল—ওর মনে হলো বোলতার চাকের মধ্যে পড়েছে। প্রহরীরা গুলি বন্ধ করল না, লঞ্চ দ্রুত দূরে সরে গেল। প্রহরীরা একটু পরে বোল্ডারটা সাইটে ভাল ভাবে দেখতে না পেয়ে বাধ্য হয়ে গুলি থামাল।

মাথা তুলে লঞ্চের দিকে তাকাল ফু-চুং। ওটা টাগ-বোটের দিকে চলেছে। ওদিকে মার্ভেলের অ্যাসল্ট বোট টাগ-বোট থেকে গুলি-বর্ষণের মুখে পড়েছে। রানা নিশ্চয়ই কোনও পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু শেষে বাস্তবে তা কাজে লাগেনি। অ্যাসল্ট বোটে মাত্র দু'তিনজন আছে। ওরা যদি টাগ-বোট আক্রমণ করতে চায়, তা হলে মার্ভেল থেকে ওদের কাভার দিতে হবে, কিন্তু গ্যাটলিং গান এখনও নিশ্চুপ!

আধ সেকেণ্ড পর গ্যাটলিং গানের ছয় ব্যারেল খ্যাট-খ্যাট-খ্যাট-খ্যাট শুরু করল! উইপন্স বে থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দশ ফুটি আগুনের শিখা। টিলার অনেক উপরে পুকুরগুলোর দিকে গোলা-বর্ষণ করা হচ্ছে। ওখানে মাটি-পাথর তিরিশ ফুট উপরে ছিটকে উঠল।

টিলা দেখে নিয়ে আবারও অ্যাসল্ট বোটের দিকে তাকাল ফু-চুং। বুঝল, ও বোটের কাউকে সাবধান করতে পারবে না। ওদিকে তাদের দিকে লঞ্চটা এগিয়ে চলেছে! বোল্ডার ছেড়ে নেমে এল ফু-চুং, গিলবার্ট ওয়ালজ্যাককে মুঠোয় পাওয়ার জন্য ছুটল।

লোকগুলো টাগ-বোটের রেইলিঙের ওপাশে দাঁড়িয়ে গুলি করছে। কাশেম একহাতে হুইল ধরে রেখেছে, আরেক হাতে পিস্তল—জলদস্যুদের দিকে পাল্টা গুলি করছে। জলিল আর জুডিও তা-ই করছে, বসে পড়েছে ফ্লোরবোর্ডে। নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করছে। বিশেষ করে জুডি, ওর তাক অলিম্পিকের মার্কস-ম্যানদের মত, ধৈর্যে স্নাইপারদের মত, গুলি ফস্কায় না।

পঞ্চমবারের মত গুলি করল ও। তার আগেই ওই লোক ধাতব রেইলিঙের আড়ালে বসে পড়েছে—অন্তত কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ ওখানে বসে থাকবে। তার আরেকটু দূরে হঠাৎ আরেকজন উঠে দাঁড়াল, তাক না করেই সাগরে গুলি করল। কয়েক সেকেণ্ড পর অ্যাসল্ট বোটের উপর তাক করল আবার। জুডি খুব সাবধানে লোকটার বুকে পিস্তল তাক করল। বহমান ঢেউ খেয়াল করে আস্তে করে ট্রিগার টিপল। ওর বুলেট রেইলিঙের উপরের অংশে পিছলে গেল, বিঁধল গিয়ে প্রহরীর বুকের হাড় স্টারনাম-এ—লোকটা উড়ে গিয়ে পিছনে পড়ল।

'আমরা সরছি!' চিৎকার করে জানিয়ে দিল কাশেম। 'সিজ ফায়ার!'

বনবন করে হুইল ঘোরাল সে, এমন এক পথে চলেছে যে মনে হলো টাগ-বোটের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে, কিন্তু শেষে খোলা পানিতে বেরিয়ে গেল। গুলি আসছে না দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে জলদস্যুরা, সুযোগ পেয়ে বোটের দিকে রাইফেল তাক করল।

'ঠিক আছে, কাশেম, সরে যাও,' এতক্ষণে রেডিয়োতে জানাল অনিল।

টিলার উপর থেকে গ্যাটলিং গান সরিয়ে নিয়েছে ও। যে-ট্রলারটা ঢেউয়ের ধাক্কায় দূরে সরছে, সেটার দিকে কয়েক সেকেণ্ড মেশিনগান চালাল ও। ডেকের কাঠগুলো ছিন্নভিন্ন হলো, উধাও হলো পাইলট-হাউজ। সিগালগুলো ডেকে পড়ে থাকা মাছগুলো খেতে নেমে এসেছিল, যে-কটা বাঁচল, দ্রুত আকাশে উঠে দূরে সরে গেল। ততক্ষণে ট্রলারের ইঞ্জিনরুম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। বিরাট ডিজেল ইঞ্জিনটা মাউণ্ট থেকে খসে পড়ল, ফিউএল ট্যাঙ্কে শতখানেক ফুটো তৈরি হয়েছে ততক্ষণে। পরমুহূর্তে ট্রলারের মাঝখানে একটা কালচে-কমলা আগুনের বড় ছাতা তৈরি হলো, শিখাগুলো আকাশ চাটল—ট্রলার মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো, সব কিছু শ্র্যাপনেলের মত ছিটকে গেল চারপাশের সাগরে।

এর পরেও যা থাকল, কয়েক সেকেণ্ড জ্বলল, তারপর ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল।

টাগ-বোট ওরকম নাটকীয় ভাবে উধাও হলো না। অনিল ওর গ্যাটলিং গানের ট্রিগারে কয়েক সেকেণ্ড আঙুল রাখল। দুই আঙুলে টিপে আঙুর ফাটালে যেমন দেখা যায়, ঠিক সেভাবে টাগ-বোটের চারপাশের রেইলিং ফেটে গেল—প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণে জলদস্যুরা টুকরো টুকরো হলো। টাগের ডেকে বেঁধে রাখা শিপিং কন্টেইনারের গায়ে অজস্র ফুটো তৈরি হলো। পিছনের দিকে মুখ করা দ্বিতীয় ব্রিজের কাঁচগুলো চুরমার হয়ে ছিটকে গেল। ক্রুরা ওখানে দাঁড়িয়ে দেখত কী টেনে নিয়ে চলেছে। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কাঁচগুলো সমস্ত লাশ কেটে-ছিঁড়ে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলল। অনিল অটোফায়ার দিয়ে ডেকে ঝাড়ু দিল,

নিশ্চিত হলো কেউ বেঁচে থাকবে না। রেডিয়োতে কাশেমকে জানিয়ে দিল, 'ওখানে আর কেউ নেই।'

কাশেম বোট ঘুরিয়ে নিল, ফিরে এসে টাগের রেইলিঙের পাশে থামল। এদিকের রেইলিং অনেকটা নিচু।

'জুডি, আপনি বোট সামলে রাখুন, আমরা এক মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি,' বলল কাশেম।

জলিল ও কাশেম মিলে ডেকের উপরে ভারী একটা গার্ডার তুলল। নিজেরাও রেইলিং টপকাল।

'ওটা দিয়ে কী করবেন?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

রেইলিঙে ঝুঁকে জুডির হাতে ট্যাকটিকাল রেডিয়ো ধরিয়ে দিল কাশেম। লাজুক হাসছে দুই কমাণ্ডো। জলিল বলল, 'মাসুদ ভাই বলেছেন এখানে কিছু জিনিস আছে, যেগুলো এখানে থাকার কথা নয়। ওগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।'

গ্যাটলিং গান আর জলদস্যুদের মানুষ রাখেনি, তারা লালচে রঙের থকথকে কাদা হয়ে গেছে। কাছে যেতেই রক্ত-মাংস-নাড়িভুঁড়ির আঁশটে গন্ধ পাওয়া গেল। ওরা নিয়ম অনুযায়ী খুঁজল কেউ বেঁচে আছে কি না। নেই।

দুই কমাণ্ডো রেইলিঙের কাছে ফিরে গার্ডারটা কাঁধে তুলে নিল, রক্ত মাড়িয়ে চলে গেল একটা কন্টেইনারের কাছে। ওটার দরজার সামনে থামল। কাশেম পিস্তল বের করে তালার মাঝখানে গুলি করল। প্যাডলক ভেঙে গেল। এদিকে জলিল বিমটা কন্টেইনারের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। কাশেম কন্টেইনারের দরজার এক পাল্লা খুলল, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ হলো। একমুহূর্ত ভিতরটা দেখল সে, তারপর ছিটকানি দিয়ে দরজা আটকে দিল।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল জলিল।

'মাসুদ ভাই ঠিকই বলেছেন।'

'সোনা?'

'সোনা।'

জলিল কুঁজো হয়ে দাঁড়াল, দু'হাতের আঙুলগুলো এক করে রাখল। ওর দেয়া মইয়ে এক পা রেখে উঠে দাঁড়াল কাশেম, দু'হাতের জোরে কন্টেইনারের ছাদে উঠে পড়ল। এবার দু'জন মিলে দুশো পাউণ্ড ওজনের বিমটা উপরে তুলল। শ্বাস ফেলে মাথা উঁচু করল কাশেম, তখনই প্রথমবারের মত লঞ্চটা দেখতে পেল। ওটা টাগ-বোটের দিকে আসছে। টাগের আড়ালে রয়েছে বলে মিস্টার চ্যাটার্জি ওটা দেখতে পাননি। অগভীর পানি ছেড়ে এসেছে লঞ্চ। গতি দ্রুত বাড়ছে। ওটার ডেকে ছ'জন লোক, সঙ্গে রাইফেল।

'যাস্‌সালা!' বলে উঠল কাশেম।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জলিল। বলে উঠল, 'সারছে!'

লঞ্চটা চলে আসতে বড়জোর তিন মিনিট লাগবে। কিন্তু বিমটা নিয়ে কাজ সারতে লাগবে অন্তত দু'মিনিট, নইলে জিনিসটা কন্টেইনারের সঙ্গে আটকে দেয়া যাবে না। কন্টেইনারের ভিতরে পুরস্কারের জিনিস, সেটা তো এভাবে ফেলে যাওয়া যায় না! কিন্তু তারপর? ওদের কী হবে?

জুডির দিকে ফিরল কাশেম, চেঁচিয়ে বলল, 'জলদস্যুরা একটা লঞ্চে করে আমাদের দিকে আসছে, আপনি বোট নিয়ে সরে যান!'

'আপনাদের ফেলে রেখে? অসম্ভব!'

'আমরা হিরো হওয়ার জন্য বলছি না,' বলল জলিল। 'আপনিই তো ওদের পিছনে টেনে নিয়ে যাবেন, নইলে মিস্টার চ্যাটার্জি ওদের ঘুম পাড়াবেন কী করে?'

জুডি যুক্তিটা বুঝতে পেরে থ্রটল পুরোপুরি খুলে দিল, অ্যাসল্ট বোট তীব্র গতিতে টাগের পিছনের অংশ পেরিয়ে বামে বাঁক নিল, এবার জুডি খোলা সাগরে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সে ভুলে গেছে বার্জ ও টাগ-বোট এখনও মোটা দুটো কেবল দিয়ে সংযুক্ত! ওগুলো আর দশ গজ দূরে। এখন আর এড়ানো সম্ভব নয় কিছুতেই। অ্যাসল্ট বোট কেবলের নীচে নাক ঢুকিয়ে দিল। শেষ-মুহূর্তে মাথা নিচু করে বসে পড়ল জুডি। মোটা স্টিলের তার এক সেকেণ্ডে ককপিটটা উপড়ে নিল।

ছুটন্ত বোট মুহূর্তে দ্বিতীয় কেবলের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক সামনেই পড়ল লঞ্চ। সবকিছু এত দ্রুত ঘটছে যে জলদস্যুরা মাত্র এক পলক দেখল—একটা বোট প্রচণ্ড জোরে ছুটে আসছে। বোট এসে তাদের লঞ্চের পেটে জোর গুঁতো মারল! ঝাঁকি খেয়ে এক জলদস্যু রেইলিং টপকে সাগরে গিয়ে পড়ল। অন্যরা বুঝে উঠবার আগেই বোট পিছলে সরল, মুহূর্তে বিশ গজ পেরিয়ে গেল। দ্রুত আরও দূরে চলে যাচ্ছে!

জুডির হাতে বোট এঁকে-বেঁকে ছুটছে। পিছন থেকে জলদস্যুরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ফ্লোরবোর্ডে বসে থেকে থরথর করে কাঁপছে জুডি, বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, জানি মেয়েরা ভাল ড্রাইভার হয় না, মানুষ চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু পারলে আমাকে ধরো তো দেখি! ধরতে পারলে তো!'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ও, চমকে গেল। লোকগুলো পিছু নেয়নি, টাগের দিকেই এগিয়ে চলেছে! কাশেমের দেয়া রেডিয়ো-সেট পরে নিল ও, দ্রুত বলল, 'জুডি বলছি। আমি মিস্টার কাশেম আর জলিলের সঙ্গে অ্যাসল্ট বোটে ছিলাম।'

'জুডি, আমি সোহেল আহমেদ। সমস্যাটা কোথায়?'

'ছ'জন জলদস্যু একটা লঞ্চ নিয়ে টাগ-বোটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের লোক দু'জন টাগ-বোটে আটকা পড়েছে। সঙ্গে শুধু পিস্তল। মারা পড়বে!'

'আপনি কোথায়?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল সোহেল। মেয়েটিকে নার্ভাস করতে চাইছে না।

'অ্যাসল্ট বোটে। মিস্টার কাশেম চেয়েছেন আমি ওই লঞ্চটা সরিয়ে নেব, কিন্তু লোকগুলো পেছনে এল না।'

'এক মিনিট অপেক্ষা করুন। জলিল? কাশেম? তোমরা কোথায়?'

মৃদু কণ্ঠে শোনা গেল, 'সোহেল ভাই, জলিল বলছি। আমরা টাগে, কন্টেইনারের ছাদে। আধ-মিনিট পর লোকগুলো ডেক টপকে চলে আসবে।'

'ওরা কি জানে তোমরা ওখানে আছ?'

'না। ওরা আসার আগেই কাশেম একটা তারপুলিন নিয়ে এসেছে। লোকগুলো কন্টেইনারের ছাদে আমাদের না খুঁজলে লুকিয়ে থাকতে পারব। মনে

হয় না পুরো জাহাজ খুঁজে দেখবে।'

'ওরা এখন কী করছে?'

'পালিয়ে যাবে বলে টো কেবলগুলো খুলতে চাইছে। আমাদের কী করতে বলেন, সোহেল ভাই?'

'ওদের সাহায্য করতে হবে,' খোলা কমিউনিকেশন চ্যানেলে বলে উঠল রানা।

'কী করতে?!' সোহেল ও জুডি একইসঙ্গে বলে উঠল।

'ওদের সাহায্য করতে হবে,' বলল রানা। 'জলিল, কাশেম, তোমরা আপাতত চুপচাপ বসে থাকো। সোহেল, টো কেবলগুলো কেটে দেয়ার ব্যবস্থা কর।' রেডিয়োর মাধ্যমে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেল। সৈকতে যুদ্ধ চলছে। রাইফেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, একে-ফোরটিসেভেনের ব্রাশ ফায়ার, মানুষের মৃত্যু-আর্তনাদ, সবই শোনা যাচ্ছে।

'গ্যাটলিং দিয়ে ওগুলো কেটে দেয়া যায়,' জানাল অনিল। 'টাগের স্টার্নে কেবলের মোটাসোটা ড্রাম আছে। ওখানে হিট করলে কেবল থাকবে না।'

'তাই করুন,' বলে উঠল সোহেল।

'কাজটা করে সৈকতে মন দে, এখানে বহু মানুষ আটকা পড়েছে, গুলি খেয়ে মরছে,' বলল রানা। 'রাশানরা এখনও ঘাঁটি আটকে রেখেছে, হয়তো কয়েক ঘণ্টা টিকে যাবে। জলদস্যু আর প্রহরীদের জন্য টাগ-বোট একমাত্র বাঁচার পথ। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এরা পালাতে পারলে বাঁচে।'

'রাশানদের কী করা যায়?' বলল সোহেল।

'আমরা সারেণ্ডার করার সুযোগ দেব, অস্ত্র না ফেললে অনিল কামান দিয়ে উড়িয়ে দেবে,' জানাল রানা।

ভয়ঙ্কর আওয়াজে চারপাশ কেঁপে উঠল। আগ্নেয়গিরির মাথায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। আকাশ কালো করে দিল ছাই, মনে হলো ওখানে নিউক্লিয়ার মাশরুম জন্মেছে। চূড়ার দিকে তাকাল রানা। হাতে সময় আছে তো? অগ্ন্যুৎপাত পাঁচ সেকেণ্ড পরেও আসতে পারে! এদিকে ফু-চুংকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সৈকতের লড়াই চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত দলের সবাইকে নিয়ে সরে যেতে হবে, খালি হাতে ফিরতে হবে মার্ভেলে—মানুষজন সরিয়ে নেওয়া যাবে না।

অস্বস্তি নিয়ে পর্বত চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, এমন সময় আতাসির উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পেল, 'বস্! মিস্টার ফু-চুংকে পেয়েছি! বার্জের ওদিকে! দু'জনের পিছনে ছুটছেন। ওই দু'জনের একজন আরেকজনের হাতে বন্দি।'

'ওরা কোনদিকে যায়?'

'সৈকত পেরিয়ে উঁচু জায়গায় উঠছে। আমাদের ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে প্রায়। ওখানে একটা হেলিকপ্টার আছে!'

'অনিল, ওটা উড়িয়ে দে,' বলল রানা। উর্বশীর দিকে তাকাল। ইন্দোনেশিয়ান কমাণ্ডার মাথা দোলাল, কমাণ্ডো দলের দায়িত্বে থাকবে ও।

দ্বিতীয়বার তাকাল না রানা, ঘুরেই ছুটল নীচের দিকে। মনে হলো উড়ে নেমে চলেছে। কিন্তু চল্লিশ গজ পার হতে না হতে একটা গোল পাথরে পা পড়ল,

পিছলে গেল রানা—ধড়াস্ করে আছাড় খেল। সেটাই ওকে বাঁচিয়ে দিল। ওর মাথার উপর দিয়ে গেল অটোমেটিক অস্ত্রের ব্রাশ ফায়ার। টিলার ঢালে শরীর গড়িয়ে দিল রানা, থামল পাথরের একটা স্তূপের পাশে—ক্রল করে ওটার পিছনে চলে গেল। একে-ফোরটিসেভেনের মালিক ঢালের নীচে। ওখানে পঞ্চান্ন গ্যালনের বেশ কিছু ড্রাম আছে, লোকটা রয়েছে ওগুলোর আড়ালে।

রানার এম-ফোরের ব্যারেলের নীচে আরেকটা ব্যারেল আছে, ওটা গ্রেনেড লঞ্চ করে—রাইফেলটা কাঁধে তুলল রানা, মাঝখানের ড্রামটার দিকে তাক করে ট্রিগার টিপল। গ্রেনেড লঞ্চার থ্যাপ্ করে ফাঁপা একটা আওয়াজ ছাড়ল, পরমুহূর্তে গ্রেনেড গিয়ে ড্রামের পেটে গুঁতো দিল। মুহূর্তে গ্রেনেডের প্রাইমারি এক্সপ্লোশন ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো ড্রামের ফিউল। বাকি ড্রামগুলো প্রায় একই সঙ্গে আকাশে উড়াল দিল। রকেটের মত আরও উপরে উঠছে ওগুলো। কয়েকটা আকাশে ফাটল, অন্যগুলো নীচে পড়ে বিস্ফোরিত হলো—ওগুলোর জ্বলন্ত তেল টিলা বেয়ে সৈকতের দিকে ছুটল।

আকাশে চোখ রেখে চমকে গেল রানা, একটা ড্রাম ঠিক ওর দিকে নেমে আসছে! লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। ড্রামটা পাঁচ ফুট উপরের ঢালে এসে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল। জ্বলন্ত পেট্রল নীচের দিকে তেড়ে এল। রানার মনে হলো প্রাণপণে নীচের দিকে ছোটে, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে আড়াআড়ি ভাবে ছুটল। তেড়ে আসা পেট্রল ওর পায়ের কাছে মাটি চাটছে! প্রচণ্ড তাপে শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না, ঘাড়ের চুল পুড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল ও পেট্রলের স্রোত পেরিয়ে এসেছে। দম নেয়ার জন্য থামল না, ঝেড়ে দৌড় দিল।

সামনে বার্জের ওপাশে থাকবে ফু-চুং।

জলদস্যুরা ইতিমধ্যে টাগ-বোটের ইঞ্জিন চালু করেছে। চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছে। এখন কেবল কাটতে পারলেই তারা রওনা হয়ে যাবে। গ্যাটলিং গানের এক সেকেণ্ডের গোলা-বর্ষণ স্টিলের টো কেবলগুলো ছিঁড়ে দিল। রানা যা ভেবেছে সৈকতে তা-ই ঘটল।

জলদস্যুরা এতক্ষণ পর্যন্ত রাশানদের আটকে রেখেছে, কিন্তু এবার ঘুরে ছুটল টাগ-বোটের দিকে। কিছু লোক সঙ্গে অস্ত্র রেখেছে, তবে বেশিরভাগ রাইফেল ফেলে শীতল সাগরে নেমে পড়ল, সাঁতার কেটে টাগের দিকে এগোল। মনে হলো লোকগুলো আসলে ইঁদুর, ডুবন্ত জাহাজ থেকে সাগরে লাফ দিয়েছে।

কমাণ্ডোদের নিয়ে টিলার অবস্থান থেকে নেমে এল উর্বশী। পাকিস্তানি জলদস্যুদের কয়েকজন এখনও টের পায়নি পরিস্থিতি বদলে গেছে, তাদের জাহাজ রওনা হচ্ছে। তাদের দু'জন উর্বশীর গ্রেনেডে উড়ে গেল। তৃতীয় লোকটার দিকে রাইফেল তাক করেছে, এমনসময় হঠাৎ চমকে গিয়ে টের পেল ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকা কালো পোশাক পরা রাশান লোকটা আসলে বেঁচে আছে। বাম হাতে উর্বশীর এম-ফোর সরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, ডানহাতে বাঁকা একটা ছোরা—উর্বশীর বুকে ছোরাটা গেঁথে দিতে চাইল। উর্বশী বাম হাতে ফলাটা সরিয়ে দিল, কিন্তু ছোরার ডগা ওর স্তন ছুঁয়ে গেল। রাইফেল পড়ে গেল হাত থেকে।

লোকটার ডান বাহুর নীচের পেশিতে ঘুসি মারল উর্বশী। জানে, ডান বাহু মুহূর্তে অবশ হয়ে যাবে। ততক্ষণে ও হাত নামিয়ে দিয়েছে, ক্রস ড্র করল, কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করেই লোকটার চোখে গুলি করল। লাশটা উল্টে পড়ল।

ফু-চুং বুঝতে পারছে ও কিছুতেই গিলবার্ট ওয়ালজ্যাককে ধরতে পারবে না। শরীর আর চলছে না। মনে হলো শুয়ে পড়ে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, মাথা ঘুরছে। ছুটতে ছুটতে এখন আর ফুসফুস যথেষ্ট অক্সিজেন পাচ্ছে না। তবুও মানসিক জোরে এগিয়ে চলেছে ও। ওয়ালজ্যাক তার বন্দিকে নিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে চলেছে। ওই এমআই-এইট হেলিকপ্টারটা যেন বহু দূরে। নিজের উপর রাগ হলো ফু-চুঙের, পা আর এগোচ্ছে না কেন! দৌড়ের গতি আরও কমে গেছে! মার্ভেল থেকে চল্লিশ এমএম অটোক্যানন বুম্ করে গর্জে উঠল। সৈকতে গোলা ফেলছে না, ওগুলো ওর মাথার উপর দিয়ে গেল। হেলিকপ্টারের চারপাশের এলাকা বিস্ফোরিত হলো। ধুলো কমে যাওয়ার পর দেখা গেল চপারের ককপিট বিধ্বস্ত হয়েছে। চুরমার হয়ে যাওয়া প্লেক্সিগ্লাসের মাঝখান দিয়ে লকলকে আগুন বেরিয়ে আসছে। সামনের দিকে ইলেকট্রনিক্সগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মার্ভেলের দিকে ঘুরে তাকাল ফু-চুং, এক হাত তুলে একটু নাড়াল। তখনই দূরে একজনকে ছুটে আসতে দেখল। মুহূর্তে বুঝে নিল, মানুষটা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না!

হেলিকপ্টারের দিকে আবারও তাকাল ফু-চুং। ওয়ালজ্যাক তার জিম্মিকে গুলি করেছে। হেলিকপ্টার নেই তো লোকটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী! লাশটা পড়বার আগেই ঘুরে দাঁড়াল ওয়ালজ্যাক, টিলা বেয়ে নীচের দিকে ছুটল। সম্ভবত ভেবেছে টাগ-বোটে উঠতে পারলে জলদস্যুদের সঙ্গে কোনও না কোনও চুক্তি করতে পারবে। অথবা ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার।

টিলার উপর থেকে দৌড়ে নেমে আসছে রানা। একবার ওকে দেখল ফু-চুং, রানা নিশ্চয়ই ওর পিছনে আসবে? অপেক্ষা করল না ও, ঘুরেই ছুটল নীচের দিকে। শুধু ভারসাম্য বজায় রাখছে, মাধ্যাকর্ষণের টানে ছুটতে ছুটতে নেমে চলেছে। সৈকত বিশ গজ দূরে থাকতে থেমে দাঁড়াল ফু-চুং, একে-ফোরটিসেভেন তুলে নিল কাঁধে। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে, সাইটের মধ্য দিয়ে আবছা ভাবে টার্গেট দেখতে পেল। ট্রিগার টিপল। কুঁদোটা কাঁধে ধাক্কা দিল, বেরল মাত্র একটা বুলেট। ওয়ালজ্যাক আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়াল, দেখল আক্রমণকারী লোকটা রাইফেল পরীক্ষা করছে—আর দাঁড়াল না সে, সৈকতের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল।

ফু-চুং কী ভাবে যেন রাইফেলের ব্যানানা ম্যাগাজিন রিসিভার থেকে নড়িয়ে ফেলেছে। এক টোকায় ওটা ঠিক জায়গায় ভরে দিল। রাইফেল কক করেই গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিপের সমস্ত বুলেট ফুরিয়ে গেল।

গিলবার্ট ওয়ালজ্যাকের ডান হাঁটুর নীচে রক্ত ছিটকে উঠল। ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল সে। উঠতে দশ সেকেণ্ড লেগে গেল। ততক্ষণে তার কাছে পৌঁছে গেছে ফু-

চুং—গায়ের জোরে লাথি মারল ও ওয়ালজ্যাকের চোয়ালে। পিচ্ছিল পাথরে ভারসাম্য হারিয়ে দু'জনই পড়ে গেল। বিশালদেহী ওয়ালজ্যাক আহত হয়েছে, কিন্তু দমে যায়নি; বছরের পর বছর ধরে খনির কাজ করেছে সে, ব্যথা সহ্য করতে জানে।

'মেইট, তোমার শাস্তি পেতে হবে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। ফু-চুংকে হামলা করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'আয় শালা!' বলল ফু-চুং, 'দে দেখি শাস্তি!'

বলেই রাইফেলটা তুলে লোকটার মাথার পাশে নামিয়ে আনল ও। ওয়ালজ্যাক দ্রুত মাথা সরিয়ে নিল। কুঁদো বাতাস কাটল, দুর্বল হাত ফসকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল রাইফেল। ফু-চুং অবশ্য থমকে দাঁড়িয়ে নেই, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটার হাঁটুর নীচে কিক করল।

গিলবার্ট ভ্রূ পর্যন্ত কুঁচকাল না, দু'হাতে ফু-চুংকে জড়িয়ে ধরল—গরিলাদের মত বুকে পিষে মেরে ফেলবে। ওয়ালজ্যাকের নাকে কপাল নামিয়ে আনল ফু-চুং। থ্যাচ্ করে হাড় ফেটে গেল, কিন্তু খনির ম্যানেজার ফু-চুংকে দ্বিগুণ জোরে চাপ দিয়ে ধরল। কপাল দিয়ে আবারও নাকে মারল ফু-চুং। এবার লোকটা ব্যথায় চাপা গর্জন ছাড়ল। বজ্র আঁটুনি একটু হলেও ফস্কে গেল। ফু-চুং সুযোগ পেয়ে ডানহাত বের করে নিল। খপ্ করে লোকটার বাম কান পাকড়ে ধরল, গায়ের জোরে টান দিল। ওয়ালজ্যাক পিছিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু তার আগেই পা বাড়িয়ে ল্যাং মেরেছে ফু-চুং, একইসঙ্গে বাম হাতে ধাক্কা দিল বুকে। পড়ে যাচ্ছে লোকটা, কিন্তু পড়বার আগে ফু-চুঙের শার্টের বুক খামচে ধরল।

বুকের উপরে ফু-চুংকে নিয়ে পড়লে ওয়ালজ্যাকের ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা হলো না। যেন গদির মধ্যে নেমেছে সে। ফু-চুঙের মনে হলো ও ওয়াটার-বেডে ঝাঁপ দিয়েছে। পরমুহূর্তে টের পেল ওরা বড়সড় একটা পুকুরে পড়েছে—ওটা পারদের!

ওয়ালজ্যাক বুঝে উঠবার আগেই লোকটার পেটে এক হাঁটু গেঁথে দিল ফু-চুং। একইসঙ্গে দু'হাতে ধরল মাথার চুল, মাথাটা পারদের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। ওয়ালজ্যাক ব্যথায় শ্বাস টানল, তরল বিষাক্ত ধাতু এক মুখ ভরে গিলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেল, কিন্তু চুল ছাড়ল না ফু-চুং, মাথাটা আরও চুবিয়ে ধরল। গায়ের জোর খাটিয়ে মাথা তুলল ওয়ালজ্যাক। মুখ থেকে রুপালি তরল গলগল করে বেরিয়ে এল। মাথাটা তৃতীয়বারের মত তলিয়ে দিল ফু-চুং। ছটফট করছে ওয়ালজ্যাক। এক মিনিটও হয়নি, দেহটা স্থির হয়ে গেল। লোকটার উপর থেকে সরে এল ফু-চুং, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল লাশ। খোলা মুখ ও নাকের ফুটো থেকে চকচকে পারদ বেরিয়ে এল—ওগুলো যেন অতি খুদে কোনও পুকুর!

'আমি ওভাবে মরতে চাই না,' পাড়ের কাছে এসে থামল রানা। 'তোর অবস্থা কী?'

'মনে হচ্ছিল একাই লড়াই করে মরব,' হাসল ফু-চুং। 'তোরা আর আসবি না কোনদিন।'

দু'হাতে ওকে টেনে তুলল রানা। 'তুই একাই হিরো হবি?' লাশটা দেখাল ও,

'ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন?'

'না। সাদা চামড়ার দক্ষিণ আফ্রিকান ম্যানেজার। গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক। লোকটা খনি মজুরদের জন্যে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছিল। বহু মানুষ খুন করেছে।'

'বলতে পারিস সরোকিন এখন কোথায়?'

মাথা নাড়ল ফু-চুং। 'না। তবে ওকে সৈকতের সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপে মনে হয় দেখেছি ওকে। গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক ওর পাইলটকে জিম্মি করেছিল, কিন্তু হেলিকপ্টারে ওঠার আগেই ওটা তোরা ধ্বংস করে দিলি। পরমুহূর্তে ওয়ালজ্যাক ওকে গুলি করে মেরেছে।'

'আমাদের দুর্ভাগ্য!' একমুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'আসল ফেন্সকে পাব কী করে?'

'ফেন্স? সেটা কী?'

'চোরাই মালের ক্রেতা। নিয়ম অনুযায়ী সোনার অ্যাসে হয়ে গেলে কোনও অফিশিয়াল মিন্ট থেকে স্ট্যাম্প করিয়ে নিতে হয়, নইলে সোনার কোনও মূল্য নেই। এ বেআইনী জিনিস আইনের এপারের কেউ ছোঁবে না। সরোকিন এমন একজনকে জানে যে এসব সামলে নেবে, সোনাগুলো বাজারে ছেড়ে দেবে। সে হতে পারে কোনও বড় জালিয়াত বা ব্যাঙ্কার। এমন একজন, যার সঙ্গে বহু পলিটিশিয়ানের দহরম-মহরম রয়েছে। ওই লোকটাকেই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ফু-চুং। 'আমাদের এমন কোনও লিঙ্ক নেই।'

মৃদু হাসল রানা। 'চিন্তা করিস না। আমরা ঠিকই শুয়োরের বাচ্চাকে খুঁজে বের করব।'

রেডিয়োতে উর্বশীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'সৈকত পরিষ্কার হয়ে গেছে, রানা। রাশানরা যারা বেঁচে আছে, আত্মসমর্পণ করেছে। ওরা এখন আমাদের সাহায্য নিয়ে দুর্যোগ থেকে বাঁচতে চায়।'

'বেশ। এবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব,' বলল রানা। চারপাশ দেখল, হঠাৎ লড়াই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেন হাজারো মানুষ মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে। বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে তারা। সাগরের দিকে তাকাল রানা। টাগ-বোট উপসাগরে বেরিয়ে গেছে, দ্রুত ছুটে চলেছে। চোখ ফিরাল আগ্নেয়গিরির দিকে—অবস্থা ভয়ানক, যেকোনও মুহূর্তে গল-গল করে বেরিয়ে আসবে জ্বলন্ত লাভা। গরমে ঘামছে ওরা। 'সবাইকে নিয়ে এই দোজখ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বলল রানা।

রানা উর্বশীকে ব্যবস্থা নিতে বলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কথা ছড়িয়ে পড়ল, শ্রমিকরা সবাই সৈকতে আটকে থাকা অপেক্ষাকৃত নতুন জাহাজে উঠবে। হুড়োহুড়ি হতো, কিন্তু কমাণ্ডোরা শ্রমিকদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ওই জাহাজে মাত্র একটা লম্বা মই, যে-কারণে সবার ডেকে পৌঁছুতে এক দেড় ঘণ্টা লাগবে।

ট্রলারগুলো যে পিয়ারে এসে ভিড়ত, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে রানা। অ্যাসল্ট

বোট নিয়ে সেখানে থামল জুডি। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যেদিকে যাব সেদিকেই যাবে নাকি, নাবিক?'

হালকা লাফ দিয়ে ডেকে নামল রানা। এক পা এগিয়ে এল জুডি, মুখটা উঁচু করল, যেন আশা করছে রানা ওকে চুমু দেবে। মুখ নামিয়ে আনল রানা, কিন্তু কিছু করবার আগেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ কাঁপিয়ে দিল সবার অন্তরাত্মা। কোথা থেকে যেন এক ফুটি একটা ঢেউ এল, নেচে উঠল অ্যাসল্ট বোট।

'তুমি দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছ, রানা,' ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বলল জুডি। দেখো, কেমন কাঁপছে সাগরের পানি।

চুমু দেয়ার ইচ্ছেটা উবে গেছে রানার, সৈকতের দিকে তাকাল। ওদিকে উর্বশীকে দেখতে পেল, ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে মনে হাসল রানা, মেয়েদের হিংসে বড় বেশি! বাঁধন যতই আলগা হোক, দখল ছাড়তে রাজি নয়।

'চলো, মার্ভেলে ফিরি,' বলল রানা।

সবাই বুঝতে পারছে যে-কোনও মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবে। হাতে সময় নেই মোটেই।

থ্রটল ঠেলে দিল জুডি, মার্ভেলের দিকে ছুটল অ্যাসল্ট বোট।

রানার নির্দেশে ইতিমধ্যে মার্ভেলকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে, স্টার্ন এখন সৈকতে আটকে থাকা জাহাজটার দিকে। নাবিকরা টো কেবলগুলো ফ্যানটেইলের তলা দিয়ে রিসেসড্ হ্যাচ থেকে বের করে দিয়েছে। কেবলের সঙ্গে মোটা দড়ি বেঁধে দুটো জেট স্কি ওগুলোকে তীরে পৌঁছে দিয়েছে। যেসব শ্রমিকের খাটবার ক্ষমতা আছে, তারা নেমে পড়েছে এবার, রশি টেনে কেবলগুলো ক্রুজ লাইনারে তুলে বেঁধে ফেলবে ক্রুজ শিপের সঙ্গে।

'সোহেল, সব মিলে কী অবস্থা এখন?' নেটওয়ার্কে জানতে চাইল রানা।

'শ্রমিকরা ক্রুজ লাইনারে কেবল নিয়ে যাচ্ছে,' বলল সোহেল। 'ওটার নাম দ্য কুইন অভ শিবা। কমাণ্ডোদের নিয়ে ওখানে তদারকি করছে তোর উর্বশী। বলেছে জাহাজের বোলার্ডগুলো ব্যাঙের ছাতার মত দেখতে হলেও আসলে ওগুলো জঙের স্তূপ। আমাদের কেব্ল্ ওই জাহাজের নোঙরের ক্যাপস্ট্যানের সঙ্গে আটকে দেয়া হচ্ছে। ক্যাপস্ট্যান টান নিতে পারবে।'

'ঠিক আছে। আমি আসছি। মার্ভেলের সবাইকে বল্ কেবল আটকানো হলে যেন ফিরে আসে।'

'মনে হচ্ছে ফারাকে ঘরে আটকে রাখতে হবে। মানুষগুলোকে মেডিকেল সাহায্য দেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।'

'প্রয়োজন হলে আটকে রাখ্,' বলল রানা। 'আগ্নেয়গিরি সময় না দিলে মানুষগুলো মরবে। তাড়া খেলে আমাদের সরে যেতে হবে।'

'লড়াই থামার পর রাশান কোস্ট-গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি,' বলল সোহেল। 'কিন্তু আগ্নেয়গিরি এত ইলেট্রিক ইন্টারফেয়ারেন্স সৃষ্টি করছে যে যোগাযোগ করা যায়নি। আমরা শুধু শর্ট-রেঞ্জে নিজেরা আলাপ করতে পারছি।'

'তারমানে যা করার আমাদেরই করতে হবে।'

'হুঁ।'

'তুই অপারেন্স সেন্টারে থাক, আমি ফ্লাইং ব্রিজে উঠব। আমার সঙ্গে জুডি আছে। কাউকে পাঠাবি ওর জন্য পোশাক নিয়ে আসতে?'

'তোর জন্যও পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

জাহাজে উঠে কাদা ভরা বুট নিয়ে ব্রিজের দিকে চলল রানা। চ্যাগ্রো পাপাগোপালার শখের হলওয়ের কার্পেট দাগে ভরে উঠেছে, জিনিসটার বারোটা বেজে গেছে। ওরা ফ্লাইং ব্রিজে পৌঁছে স্টুয়ার্ডকে পেল, রূপালি মেস ট্রলির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো বাণ্ডিল দিল সে, একটা জুডির জন্য, অন্যটা রানার। কাপড় নিয়ে রেডিয়ো শ্যাকে ঢুকে পড়ল জুডি। স্টুয়ার্ড বেরিয়ে গেলে পোশাক পাল্টে নিল রানা।

জুডি ফিরতে স্টুয়ার্ডকে আবার ডাকল রানা। ঘরে ঢুকে ট্রলির রুপালি কাভার তুলল সে। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে গরম সুস্বাদু খাবারের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। স্টুয়ার্ড ঘোষণা করল: 'শ্রেডেড জার্কড বিফ বারিটোস, সঙ্গে সামান্য কফি।'

মুখ ভরা ঝালঝাল খাবার নিয়ে স্টুয়ার্ডকে ধন্যবাদ দিল জুডি। মনে মনে বলল রানা, 'বেঁচে থাকো, বাপ।'

সি অভ ওখোটস্ক-এর ঝড়টা এদিকে আসছে, সাগর-বাতাস আবারও খেপে উঠছে। উইণ্ডস্ক্রিনে এসে বৃষ্টির ছাঁট লাগল। বজ্রঝড় গুড়গুড় করে উঠল আকাশে। রানা ও জুডির খাওয়া শেষ হলে স্টুয়ার্ড ট্রলির তলা থেকে দুটো রেইন কোট ও দু'জোড়া রাবার বুট বের করে দিল। 'সার, জানতাম আপনাদের এগুলো লাগবে।'

ট্রলি নিয়ে চলে গেল সে। রেইন কোট ও বুট পরে নিল ওরা। বসতে না বসতে ওয়াকিটকিতে সোহেল বলল, 'কেব্‌ল্ ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উর্বশী জানিয়েছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জাহাজ আটকে দেয়া যাবে।'

'ঝড় আসছে, সব কাজ কঠিন করে তুলবে,' বলল রানা। ফ্লাইং ব্রিজে দমকা বাতাস আসছে। সঙ্গে বৃষ্টি তো আছেই। আগ্নেয় ছাই বৃষ্টির সঙ্গে মিশে কাদা হয়ে ঝরছে। মার্ভেলের স্টার্নের দিকে তাকাল রানা। কেবলগুলো ওখান থেকে চলে গেছে ক্রুজ লাইনারের ফেয়ারলিড্‌স্-এ। সবই ঠিক আছে, তবে মার্ভেল এখন আর দ্য কুইন অভ শিবার সঙ্গে সরাসরি লাইনে নেই। গগলকে ইন্টারকমে জানিয়ে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গগল পোর্টের বো থ্রাস্টার দিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে গেল জাহাজ।

অ্যাসল্ট বোট ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে চলে গেল। মার্ভেলের ক্রুদের নিয়ে আসবে। কিছুক্ষণ পর ওটা সৈকতে ভিড়ল। বাইরে বেরিয়ে এসে ওদিকে তাকাল রানা।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল জুডি। 'তোমার কি মনে হয় জাহাজটা বালি থেকে বের করা যাবে?'

'মার্ভেলের ইঞ্জিনগুলো সুপারক্যারিয়ারের হর্স-পাওয়ারের সমান,' বলল রানা। 'আমরা ক্রুজ লাইনারটাকে টেনে সাগরে নামাতে চাইব। দেখা যাক কী হয়।'

'বাধ্য হলে মানুষগুলোকে ফেলে সরে যাবে?'

জবাব দিল না রানা, তবে উত্তরের দরকারও পড়ল না। আগে রানা যা-ই বলে থাকুক, ওর চোখ জুডিকে সব বলে দিল। দরকার হলে রানা মার্ভেলকে ধ্বংসের মুখে ফেলবে, দলের সবাইকে নিয়ে বিপদের মুখোমুখি হবে, কিন্তু অত্যাচারিত মানুষগুলোকে মৃত্যুর মুখে ফেলে সরে যাবে না।

কয়েক মিনিট পর সৈকত থেকে অ্যাসল্ট বোট মার্ভেলের দিকে রওনা হলো। ওটাতে মার্ভেলের বাকি কয়েকজন আসছে। অ্যাসল্ট বোট টো কেবল পেরিয়ে জাহাজের কাছে চলে এল, কিছুক্ষণ পর গ্যারাজে বোট তুলে দিল জুডি। ওয়াকি-টকিতে রানা বলল, 'ঠিক আছে, গগল, কেবল-এ সামান্য টান দাও।'

নড়ে উঠল মার্ভেল, সাগরে ডুবে থাকা কেবলগুলো পানি ছিটিয়ে উপরে উঠল। কেবলগুলো আরও টানটান হলো।

'না, রানা,' বলল গগল। 'বটম স্পিড জিরো। কেবল এখন পুরোপুরি টাইট হয়েছে।'

'থার্টি পার্সেণ্ট শক্তি ডায়াল করো, ধরে রাখো ওখানেই।'

মার্ভেলের ইঞ্জিন তীক্ষ্ণ আওয়াজ করল। কেবলের টান ও ইঞ্জিনের শক্তি মার্ভেলকে পানিতে দাবিয়ে দিল। ঢেউগুলো ছিঁড়ে গেল, বো টপকাল।

'মুভমেণ্ট পাচ্ছি আমি,' জানাল গগল। 'মার্ভেল প্রতি মিনিটে পাঁচ ফুট এগোচ্ছে।'

'ওটা কিছু নয়,' বলল রানা। 'কেবল এখনও টানটান হচ্ছে।' রানা কলেজের ছুটিতে একবার এক টাগ-বোটে কাজ করেছে, তখন দেখেছে কেবল টান খেলে মনে হয় বোঝা নিয়ে রওনা হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। 'গগল, দু'এক মিনিট পর বুঝবে আসলে আমরা পিছলে সরছি। সেরকমটা হলে পঞ্চাশ পার্সেণ্ট ডায়াল কোরো।'

ক্রুজ লাইনারের গায়ে ঢেউ লাগছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে রানা। জাহাজটা এগিয়ে আসছে, নাকি টান খেয়েও বসে আছে! ওটার বো-র নীচে পানি ঢুকছে, কিন্তু সামনের অংশ একটু ভেসে ওঠা মানেই স্টার্ন আসলে সৈকতে আরও দেবে যাবে।

'ফিফটি পার্সেণ্ট,' কয়েক মুহূর্ত পর গগল জানাল। 'কোনও মুভমেণ্ট নেই।'

'আশিতে ওঠো।'

'আমি তা রিকম্যাণ্ড করি না,' সাবধান করল উর্বশী। 'আমরা এরইমধ্যে অনেক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি।'

থিওরিটিক্যালি ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিনের আউট-পুটের কোনও লাস্ট লিমিট নেই। কিন্তু সিস্টেমে বড় একটা দুর্বলতা আছে: হাই-স্পিড পাম্পগুলো যে ম্যাগনেটগুলো ঠাণ্ডা করে, সেগুলোতে তরল হিলিয়াম আছে—ওগুলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হলে ইমপেলরগুলোর উপরে খারাপ প্রভাব ফেলে। কামচাটকার আবহাওয়ায় এসে ইঞ্জিনগুলো এখন কেমন আচরণ করবে, কেউ জানে না।

বাংলাদেশ নেভির দু'জন ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনগুলোর দায়িত্বে আছেন, একটু গর্বই প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে, 'আমরা দুনিয়ার সেরা ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে

এসেছি। আশিতে ওঠো, গগল।'

মার্ভেলের স্টার্ন আরও বসে গেল, বো আকাশে উঠছে। জাহাজের পিছনে সাগর টগবগ করছে। প্রতি মিনিটে ইঞ্জিনগুলোর টানেল থেকে কয়েক শ' টন পানি জেট ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'না, কিছুই হচ্ছে না,' আফসোস করে বলল গগল। 'মার্ভেল সম্ভবত ডুবেই যাবে! সৈকত থেকে ক্রুজ লাইনারকে নামাতে পারছি না আমরা।'

গগলের হতাশা পাত্তা দিল না রানা। 'স্টার-বোর্ডে লক করো।'

নির্দেশটা মেনে নিল গগল, শিকল দিয়ে কুকুর টেনে রাখলে যেমন আর একদিকে দৌড়াতে যায়, মার্ভেল এখন ওরকম করছে। টো-এর টান আরও কয়েক টন বাড়ল।

রানা নিজেও জানে না চেঁচিয়ে কথা বলছে, 'পোর্ট লক করো!'

মার্ভেল বাঁ দিকে বাঁক নিল, কেবলে চাপ আরও বাড়ল। প্রচণ্ড টানে কেবলগুলো থরথর করে কাঁপছে। ক্রুজ শিপের তলায় যেসব পাথর আছে, ওখানে নড়াচড়া হচ্ছে। জাহাজের হাল নড়ে উঠল। ধাতব তীক্ষ্ণ আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু হলেও নড়ছে দ্য কুইন অভ শিবা!

'আয়, আয় সোনা!' বিড়বিড় করছে রানা। 'গগল, কোনও মুভমেণ্ট?'

জুডি ওর পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত এমনভাবে মুঠো করে রেখছে যে আঙুলের ডগাগুলো রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

উত্তর দেয়ার আগে মার্ভেলকে স্টার-বোর্ডে সরিয়ে নিল গগল। 'না। মুভমেণ্ট নেই। বটম স্পিড এখনও জিরো।'

উর্বশীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'রানা, চিফ ইঞ্জিনিয়ার রিপোর্ট করেছেন, ইঞ্জিনগুলোর টেম্পারেচার অনেক বেড়ে গেছে। কুল্যাণ্ট পাম্পগুলো যে-কোনও সময় চালু হবে। আমাদের থামা দরকার। যে-ক'জন মানুষ মার্ভেলে তোলা যায়, তাদেরকে তো আমরা তুলে নিতে পারি?'

ক্রুজ শিপের দিকে তাকাল রানা। বলা হয়েছিল মানুষগুলো যেন ডেকে না বের হয়। টো কেবল ছিঁড়লে ছিটকে উঠবে, সামনে পড়লে যে-কোনও মানুষ টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু দ্য কুইন অভ শিবার বো-তে ভীত, ফ্যাকাসে মুখে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। হিম বৃষ্টিতে ভিজছে। মোটামোটি হিসাবে ওখানে তিন হাজার মানুষ আছে। তার তিন ভাগের এক ভাগ লোককে মার্ভেলে তোলা যাবে। 'আপাতত ইঞ্জিন আইড্‌ল্ করো, গগল,' বলল রানা।

ওর কথা শেষ হতে না হতে ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস এখন কিছু টানছে না, ঢেউয়ের সঙ্গে উঠছে-নামছে।

হতাশ চোখে রানার দিকে তাকাল জুডি, চোখে একটু রাগও যেন—এত সহজে হার মেনে নিল রানা? কিন্তু মানুষটার কথা এখনও শেষ হয়নি।

'কেবলগুলোর টেনশান সরিয়ে নাও, আরও একশো গজ কেবল ছাড়ো। মার্ভেলকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নাও। তৈরি থাকো, কিছুক্ষণ পর একইসঙ্গে দুটো নোঙর নামাব আমরা।'

'রানা, তুমি কী মনে করো...' চুপ হয়ে গেল উর্বশী।

'আমাদের নোঙরের উইঞ্চগুলো পাওয়ার্ড, ইঞ্জিনগুলো চারশো হর্সপাওয়ার ওজন নেবে,' বলল রানা। 'পুরো শক্তি কাজে লাগাব আমরা এবার।'

অপারেশন্স সেন্টারে উর্বশী কম্পিউটারের কিগুলো টিপল, কেবলের ড্রাম দুটোর ক্লাচ সরিয়ে নিল। ড্রামগুলো কেবল ছাড়ছে, এদিকে ধীরে ধীরে গভীর পানির দিকে এগিয়ে চলেছে গগল। একশো গজ এগিয়ে নোঙর ছেড়ে দিল উর্বশী। দ্রুত নেমে গেল ওগুলো, পানির গভীরতা ওখানে মাত্র আশি ফুট।

'সাবধানে একটু পেছাও, গগল,' বলল রানা। 'নোঙর আটকে যাক।'

ভারী তিনকোনা নোঙরগুলো সাগরের পাথুরে জমির উপর দিয়ে গভীর দাগ কেটে পিছিয়ে আসছে, বড় বোল্ডারে টক্কর খাচ্ছে, তারপর বেড রকে বসে গেল। একটা কম্পিউটার অটোমেটিকালি নোঙরের শিকলগুলোর টেনশান নির্ধারণ করল। এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে, যেন নোঙর না সরে।

'আমরা তৈরি,' জানিয়ে দিল গগল। কণ্ঠে কোনও উৎসাহ নেই।

'কেবলের টেনশান বাড়াও, তারপর ইঞ্জিনগুলোকে তিরিশ পার্সেন্ট ক্ষমতা দাও।' ফ্লাইং ব্রিজ থেকে একটা বিনকিউলার নিয়ে এসে চোখে তুলল রানা। দ্য কুইন অভ শিবা'র রেইলিঙের দিকে ভুলেও তাকাল। একের পর এক ঢেউ জাহাজের বো-এর গায়ে আছড়ে পড়ছে। ভেসেলটা উঠছে-নামছে, স্টার্নটা বালিতটে আরও গেঁথে বসছে।

'থার্টি পার্সেন্ট,' জানিয়ে দিল গগল। 'তলার কোনও মুভমেন্ট নেই, শুধু কেবল টানটান হচ্ছে।'

'ফিফটি পার্সেন্টে ওঠো,' ক্রুজ লাইনারের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'নোঙরে কোনও পরিবর্তন?'

'উইঞ্চগুলোর রিকভারি একদম জিরো,' জানাল উর্বশী। 'ইঞ্জিনগুলো অনেক গরম হয়ে গেছে, ডায়ালের চারভাগের তিনভাগ উঠে এসেছে। লাল লাইনের তিরিশ ডিগ্রি বাকি, তারপর ইঞ্জিনগুলো অটোমেটিক্যালি শাটডাউন করবে।'

টো কেবলে ভয়ঙ্কর চাপ পড়ছে, মার্ভেলের প্রচণ্ড শক্তি বিশ হাজার টনি জাহাজটাকে সৈকত থেকে টেনে নামাতে চাইছে। কেবলগুলোর টানে দ্য কুইন অভ শিবার বো'টা নড়তে শুরু করেছে। হড়হড় করে পানি তলায় ঢুকছে। ফুটবলের আকারের পাথরগুলো এদিক-সেদিকে গিয়ে পড়ছে।

'কী ঘটছে?' জানতে চাইল রানা।

'উইঞ্চগুলো কিছুই টানছে না,' বলল উর্বশী, কণ্ঠে হতাশা।

'আমাদের তলার কোনও মুভমেন্ট নেই,' বলল গগল।

'গগল, মার্ভেলকে আশি পার্সেন্ট শক্তি দাও।'

'রানা!' আপত্তির সুরে বলল উর্বশী।

'যা বলছি করো তোমরা, সমস্ত ইঞ্জিনের সেফটি সরিয়ে দাও,' রানার কণ্ঠে রাগ প্রকাশ পেল। 'দরকার হলে রেড লাইন পেরিয়ে যাক! আমরা মানুষগুলোকে ফেলে যাব না।'

নির্দেশ পালন করল উর্বশী, কয়েক টোকায় কম্পিউটারকে জানিয়ে দিল এখন থেকে আর উত্তাপ নিয়ে ভাবতে হবে না, বিশাল ক্রাইও পাম্পগুলো উত্তপ্ত হয়ে

উঠুক। স্ক্রিনের দিকে তাকাল উর্বশী, টেম্পারেচার বাড়ছে, কলামগুলো লাল হয়ে উঠছে—তারপর সেফটি লিমিট পেরিয়ে গেল। আস্তে করে ও কম্পিউটারের মনিটর বন্ধ করে দিল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি দুঃখিত, মার্ভেল।'

পুরো জাহাজ থরথর করে কাঁপছে, মনে হচ্ছে প্রতিটি বল্টু ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

'আয় ডাইনী, আয় তুই!' চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেছে রানার। নিজেকে পাগল মনে হচ্ছে ওর। বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'আয়! আয় ডাইনী!'

জবাবেই যেন উপসাগর থেকে গভীর একটা আওয়াজ এল, মনে হলো এক সাথে একশো বাজ পড়ল—বিকট শব্দ তো হলোই, চারপাশ থরথর করে কাঁপিয়ে দিল। প্রচণ্ড ভয় পেল সবাই। পর্বতের মাথা কালো মেঘের মত ছাইয়ে ঢেকে গেল। জমিন এমন ভাবে কাঁপতে লাগল যে মনে হলো সৈকত আসলে তরল কিছু দিয়ে তৈরি। সবাই অন্তর দিয়ে বুঝতে পারল, সময় হয়ে গেছে, এবার মরতে হবে। অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে গেছে! মাউন্ট সেইন্ট হেলেনের মত এই পর্বতের চূড়াটাও এবার উড়ে যাবে—অতি তপ্ত ছাই ছিটকে উঠবে, উত্তপ্ত লাভা ও গ্যাস বিশাল একটা অ্যাভালাঞ্চ ঘটাবে, পথে যা পাবে গিলতে গিলতে ছুটে আসবে। বিজ্ঞানীরা এই ভয়টাই পেয়েছেন। পৃথিবীতে ভয়াবহ যে কটা প্রাকৃতিক শক্তি আছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। এবার এখানে তা-ই ঘটবে। জীবন নিয়ে বিরাট একটা জুয়া খেলেছে রানা, এবার ও সব হারাবে। এখন আর ফিরে গিয়ে বিপর্যস্ত মানুষগুলোকে উদ্ধার করা যাবে না। ওরা নিজেরাও তো মরবে এবার। রানার দু'চোখ চকচক করে উঠল, মনে হলো জ্বলছে চোখদুটো। দাঁতে দাঁত চেপে পর্বত আর সৈকতের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

'রানা, কেবলগুলো এবার আমাদের কেটে দিতে হবে,' বলল উর্বশী।

কোনও জবাব দিল না রানা।

'রানা, আমাদের সরে যেতে হবে,' জোর দিয়ে বলল উর্বশী। 'আগ্নেয়গিরি থেকে কয়েক মাইল দূরত্ব দরকার, নইলে সবাই মারা যাব আমরা।'

এক-ফোঁটা মিথ্যা বলছে না উর্বশী। পাইরোক্ল্যাস্টিক ফ্লো সাগরে নেমে আসবে—টক্সিক গ্যাস, লাভা ও ছাইয়ের মেঘ চারপাশের সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়ে সাগরের অনেকটা জায়গা দখল করবে। কিন্তু রানা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'মুভমেন্ট!' গগলের চিৎকার শুনতে পেল ও। 'পোর্টের উইঞ্চ সামনে বাড়ছে! প্রতি মিনিটে পাঁচ গজ!'

'মনে হয় নোঙর পিছলে গেছে,' কাঁপা গলায় বলল উর্বশী। 'ওটা সাগর তলা থেকে ছেঁচড়ে এগোচ্ছে।'

সূর্যটা হঠাৎ করেই যেন হারিয়ে গেছে, মুহূর্তে অন্ধকার নেমে এসেছে। পর্বত বা সৈকত দেখতে পেল না রানা। চোখের সামনে সব আঁধার হয়ে গেছে। চোখে বিনকিউলার তুলে দেখল রানা। ঝরঝর করে নেমে আসা ছাইয়ের মাঝখানে দ্য কুইন অভ শিবাকে আবছা ভাবে দেখতে পেল। জাহাজটা নড়েছে কি না নিশ্চিত হতে পারল না। হয়তো উর্বশীর কথাই ঠিক, নোঙর পিছলে গেছে।

অনন্তকাল থেকে যেন সবাই চুপ করে আছে, কেউ কোনও কথা বলছে না।

গগল স্পিড ইণ্ডিকেটরগুলো দেখছে, ওগুলো যেন সবসময় ওরকম স্থিরই ছিল।

তারপর অগ্ন্যুৎপাতের আওয়াজের উপর দিয়ে দ্য কুইন অভ শিবার কর্কশ চিৎকার শোনা গেল, মনে হলো যেন কোনও মানুষ আর্তচিৎকার করছে। দু'কেবলের ভয়ঙ্কর আকর্ষণ ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে, নাকি প্রবল ঝড় ওটাতে শেষ করছে?

'আসছে ও,' চিৎকার ছাড়ল গগল। স্পিড ইণ্ডিকেটরগুলোর কাঁটা একটু হলেও নড়ছে।

কম্পিউটারের স্ক্রিন আবারও খুলল উর্বশী। 'দুটো উইঞ্চই সামনে বাড়ছে!'

'প্রতি মিনিটে বটমের স্পিড দশ গজ,' জানাল গগল। 'পনেরো। বিশ!'

ক্রুজ লাইনার মাত্র ভাসতে শুরু করেছে। কেবলগুলো ওটাকে টেনে নামিয়ে নিচ্ছে। গতি বাড়ছে। দু'হাতে রানার বামহাত আঁকড়ে ধরে আছে জুডি। দ্য কুইন অভ শিবা সাগরে নেমে আসছে! জাহাজের তলা থেকে ভয়ঙ্কর কর্কশ শব্দ হলো। পাথরে হড়কে নামছে সাগরে। অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ঢেউ সৈকতের দিকে ছুটে গেছে। প্রথম ঢেউটা সৈকতে ধাক্কা দিল। জাহাজের স্টার্নের নীচে এখন পানি—ধাক্কা খেয়ে নৌযানটা পুরোপুরি ভেসে উঠেছে। কেবলের টান খেয়ে গভীর পানিতে নেমে এল।

'মুক্ত হয়ে গেছে!' অপারেশন্স সেন্টারকে জানিয়ে দিল রানা।

জবাবে ক্রুদের চিৎকার শুনতে পেল। নিজের ইচ্ছাপূরণ করল গগল, মার্ভেলের ভেঁপুর শব্দ পাওয়া গেল। ওটা বোঁওওও-বাঁওওওও করে আওয়াজ করছে।

'এবার এখান থেকে পালাতে হবে,' তাড়া দিল রানা। ওর পিছু নিয়ে ব্রিজে ফিরে এল জুডি। লিফটে উঠে অপারেশন্স সেন্টারে নেমে এল ওরা। ওদের দেখে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। সোহেল, অনিল, গগল নিজেদের সিট থেকে নেমে এসেছে, রানাকে জড়িয়ে ধরল ওরা।

'বস, আপনার পা ধরে একটু সালাম না করলে তো হয় না!' চলে এসেছে প্রকাণ্ডদেহী আতাসি, ঢুব করে সালাম করল ও।

লজ্জায় লাল হয়ে তাড়া দিল রানা, 'তাড়াতাড়ি যার যার সিটে যাও! জাহাজটা নেমেছে, এবার ইঞ্জিনের শক্তি পঞ্চাশ পার্সেন্টে রাখো।'

যে-যার সিটে গিয়ে বসতেই অনিল অ্যাফ্টের ক্যামেরা ফোকাস করল। মেইন স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা। দ্য কুইন অভ শিবা লক্ষ্মী মেয়ের মত মার্ভেলের পিছু পিছু আসছে। গগল গতি কমিয়েছে, পিছনের জাহাজের ওয়াটারলাইন দেখা গেল। ওটা ঢেউ কেটে এগিয়ে চলেছে।

'হায় ঈশ্বর!' হাঁ করে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকল জুডি।

পর্বত-চূড়া হঠাৎ করেই বাষ্প হয়ে গেছে। কালো ছাইয়ের বিরাট একটা দেয়াল যেন নেমে আসছে! ওটা কালো কোনও ঢেউও বলা যায়—পাক খেতে খেতে নেমে আসছে। মনে হলো জিনিসটা যেন আসলে জীবন্ত। সব গিলে নিতে আসছে। শত বছর ধরে পর্বতে জন্মানো বিশাল সব গাছ যেন আসলে ম্যাচের কাঠি, উপড়ে গিয়ে লাভার নীচে চাপা পড়ছে। এক সেকেণ্ড পর অগ্ন্যুপাতের

আওয়াজটা মার্ভেলে এসে পৌঁছুল। বিকট আওয়াজে সবার মনে হলো কানের পর্দা ফেটে গেছে।

দ্য কুইন অভ শিবা'র ডেকে যারা ছিল, দৌড়ে গিয়ে সুপারস্ট্রাকচারে আশ্রয় নিল। দু' সেকেণ্ড পর ছাইয়ের স্রোত সৈকত পেরল, সাগরে পড়ল। তপ্ত ছাই পানিতে পড়ে বাষ্প হলো, ফোঁস-ফোঁস ভয়াবহ আওয়াজ হলো। ছাইয়ের স্রোত সাগরের উপর দিয়ে ছুটল। সৈকতে গেঁথে থাকা ক্রুজ শিপগুলো ঢাকা পড়ে গেল ছাইয়ের নীচে। একটা জাহাজ পুরোপুরি তলিয়ে গেল। প্রসেসিং প্ল্যাণ্ট সহ বার্জটা উল্টে পড়ল প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে।

'ওটা আসছে!' কে যেন বলল। দরকার ছিল না। রানা দেখল, ছাইয়ের মেঘ এসে দ্য কুইন অভ শিবাকে ঢেকে দিল, ওটা আর ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে না।

ছাইয়ের ঝড় মার্ভেলকে যেন হাতুড়ি দিয়ে আঘাত দিল। ছাই ও পিউমিসের হারিকেন বয়ে গেল। জানালার কাঁচগুলো মুহূর্তে ভেঙে চুরচুর হলো। পোর্টে উঁচু হয়ে গেল মার্ভেল, স্টার-বোর্ডের রেইলিং তলিয়ে গেল সাগরে। জাহাজটা এসবের পরেও এক নাগাড়ে এগিয়ে চলেছে, যেন জেদ ধরেছে হারবে না। প্রথম দিকের ঝাপটা কমতেই সোজা হলো মার্ভেল, ছুটে চলল। দু'মিনিট পর ছাইয়ের মেঘের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যা নামছে সাগরে, ডিমের কুসুমের মত সূর্যটা দিগন্তে ঝুলছে।

দৃশ্যটা দেখে শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল সবাই। মুহূর্তগুলো খুব ধীরে পেরিয়ে চলেছে, তারপর ছাইয়ের পর্দার ওপাশ থেকে দ্য কুইন অভ শিবার বো বেরিয়ে এল। জাহাজটা যেন কোনও ছাইমাখা ভূত, কিন্তু সেটা দেখেই সবার মন প্রশান্তিতে ভরে গেল, মনে হলো এত সুন্দর জাহাজ আগে বুঝি কখনও দেখেনি। সুপারস্ট্রাকচারের ছোট্ট একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল সবার। অনিল দ্রুত জুম করল। আপার ডেকের একটা দরজা হঠাৎ খুলে গেছে। একটা ছোট্ট মূর্তি বেরিয়ে এল, চারপাশ দেখল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে কাদের যেন হাতের ইশারায় ডাকল। একে একে বারো-চোদ্দোজন বেরিয়ে এল। লোকগুলো যেন পাগল হয়ে গেছে, লাথি দিয়ে ডেকের ছাই উড়িয়ে দিচ্ছে—বাঁচার আনন্দে নাচছে সবাই।

একটা ট্রলি নিয়ে অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকল স্টুয়ার্ড, কান পর্যন্ত হাসছে। ট্রলির উপরে বসে আছে ডিশ ভরা নাস্তা। একে একে সবার সামনে থামল সে। সবার স্বীকার করতে হলো, ওদের বাবুর্চি প্রত্যেকের পছন্দ খেয়ালে রাখে।

রানার পাশে বসেছে জুডি, সামুসায় কামড় দিয়ে বলল, 'ডাইনীটা আসলে কে?'

'হ্যাঁ?'

'ফ্লাইং ব্রিজে তুমি "আয় ডাইনী" বলেছিলে। কাকে বলেছিলে? মার্ভেলকে, নাকি দ্য কুইন অভ শিবাকে?'

'ওদের নয়।'

'তা হলে?'

'প্রকৃতি মাতাকে।' হাসল রানা। 'বইয়ে পড়েছি, অগ্ন্যুৎপাতের আগে মেজর আর্থকোয়েক হয়। সে-সময় মাটি-পানিতে ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানীরা

বলেন লিকুইফ্যাকশন। বড় ভূমিকম্প আসলে মাটিকে চোরাবালি করে দেয়। দীর্ঘদিন আটকে থাকায় দ্য কুইন অভ শিবার নীচে যে সাকশান তৈরি হয়েছিল, ভূমিকম্পে মাটি নড়ে ওঠায় ওটা বেরিয়ে যায়, নইলে একা মার্ভেলের ক্ষমতায় জাহাজ টেনে নামানো যেত না।'

'আমরা মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ঘুরে এসেছি, তা-ই না?'

'ঝুঁকি যেমন বড়, পুরস্কারও তেমনি বড় হয়, তা-ই না?'

'রানা,' নিজের স্টেশন থেকে ডাকল উর্বশী। 'ছ'মাইল সামনে রেইডার কন্ট্যাক্ট। সাত নট গতিতে এগিয়ে চলেছে।'

'টাগ-বোট,' মন্তব্য করল সোহেল। 'ওই যায় আমাদের পুরস্কার। পিছনে পুরস্কার, সামনে পুরস্কার... বাহ্!'

'যায় না,' বলল গগল।

ক্রুজ লাইনার টেনে এগিয়ে গেলেও মার্ভেল মাত্র পনেরো মিনিটে টাগ-বোট ধরতে পারবে। পিছু ধাওয়া করল গগল।

ফু-চুং স্টেশন থেকে সরে গেল, ডেকে যাবে। ওখানে ওর সঙ্গে থাকবে কমাণ্ডোরা।

রানা গগলকে জানিয়ে দিল মার্ভেল যেন টাগ-বোটকে পোর্টে রাখে। ওখানে কম সংখ্যক জলদস্যুই থাকবে। সঙ্গীদের ফেলে পালিয়ে এসেছে এরা। সাঁতার কেটে জাহাজে উঠতে গিয়ে ডুবে মরেছে প্রচুর গার্ড।

বারো মিনিট পর টাগ-বোটের পাশে পৌঁছে গেল মার্ভেল। ওটার ডেকে প্রায় কেউ নেই। দু'জন জলদস্যু মার্ভেলকে দেখে দৌড়ে গিয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠল। কিন্তু এরা একে-ফোরটিসেভেন কাঁধে তুলবার আগেই অনিল ফিফটি ক্যালিবারের মেশিনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করল। লোকগুলো অবশ্য তার আগেই লুকিয়ে পড়েছে। আর দেখা গেল না।

'কাশেম, জলিল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' রেডিয়োতে ডাকল রানা।

ট্যাকটিকাল চ্যানেলে জলিল জানাল, 'মাসুদ ভাই, আমরা তো ভেবেছিলাম আপনারা আমাদের ভুলেই গেছেন।'

'এখনই বেরিয়ে এসো না,' বলল রানা। 'আমি টাগের স্টার্নে দুটো কণ্টেইনার দেখছি, তোমরা কোনটার উপরে আছ?'

'পিছনেরটা।'

'আর লিফটিং অ্যাসেম্বলিটা?'

'তৈরি হয়ে বসে আছে, মাসুদ ভাই।'

'আমরা এক মিনিটের মধ্যে পাশে চলে আসব,' বলল রানা। এবার অনিলের উদ্দেশে বলল, 'টাগের রেইডার উড়িয়ে দে।'

চল্লিশ এমএম বোফোর্সের অটোক্যানন তাক করল অনিল, টাগের ফ্যানটেইলে ছয় রাউণ্ড গোলা বর্ষণ করল। সঙ্গে সঙ্গে নৌযানের গতি কমতে শুরু করল। স্টার্নের নীচের অংশে গোলা ঢুকেছে, ওখান থেকে তেল ছড়িয়ে পড়ল সাগরে।

মার্ভেলকে টাগের পাশে নিয়ে গেল গগল, তবে সাবধান থাকল, দরকার হলে

মুহূর্তে সরে যাবে। দুটো নৌযান এখন পাশাপাশি হয়েছে, গতি আরও কমে গেল। দুটোর দূরত্ব বড়জোর এক ফুট। রেইডার ও বো থ্রাস্টার দিয়ে টাগের পাশে থাকছে গগল। ক্যামেরা থেকে চোখ সরাল না অনিল। প্রয়োজন পড়লেই কাভার ফায়ার দেবে। তবে এখনও জলদস্যুদের দেখা নেই।

মার্ভেলের দু'জন ডেক-হ্যাণ্ড মেইন ডেরিকের বুমটা টাগের উপরে নিয়ে গেল, কেবলসহ হুকটা চলে গেল কন্টেইনারের এক ফুট উপরে। এবার কাশেম ও জলিল তারপুলিনের তলা থেকে বেরিয়ে এল, হুকটা আটকে দিল বিমের সঙ্গে। বিম এবার কন্টেইনারের ওজন নেবে। হাতের ইশারা করল কাশেম, সঙ্গে সঙ্গে ডেক ছাড়ল ক্রেট।

মুদাস্‌সর আলী খানের দ্বিতীয় পুত্র এতক্ষণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাবার মালামাল সযত্নে রেখেছে। আব্বাজান বলেছে তুই লড়াই করবি না, দরকার হলে আমাদের লোক মরুক। কিছুক্ষণ আগে টাগ-বোটের ক্রুদের সঙ্গে যখন তার বাবার লোকদের গোলাগুলি হলো, এবং পরে গ্যাটলিং গানের আক্রমণ এল, তখন সে বুদ্ধি করে একটা কেবিনে লুকিয়ে ছিল—কিন্তু এখন সে দেখল সোনার কন্টেইনার ওর জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে! আসকার আলী খানের টনক নড়ল, ওদের জিনিস তো ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে! ব্রিজ থেকে দৌড়ে নেমে এল সে, ভয়ঙ্কর বিশ্রী সব গালি দিতে দিতে পিস্তল হাতে তেড়ে এল অ্যাফট ডেকে।

লোকটাকে মাত্র এক মুহূর্ত দেখল অনিল, মেশিনগান তাক করতে পারল না।

আসকার আলী খান এক হাতে কন্টেইনারের ছাদ ধরে ফেলল, ওটার সঙ্গে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রেট ছাড়ল না। ঢেউয়ের দোলায় ডেকটা নিচু হয়ে গেল। এবার সে বাধ্য হয়ে পিস্তল ফেলে দিয়ে দুইহাতে কন্টেইনারের ছাদ ধরল।

উইঞ্চম্যান কেবল টেনে নিচ্ছে, কন্টেইনারটা টাগের রেইলিং পার করাবে। বুম সরিয়ে মার্ভেলের ডেকের দিকে নিতেই হঠাৎ জোর একটা ঢেউ এল। গগল দুই জাহাজের সংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু ডেকহ্যাণ্ডরা কন্টেইনারের দুলুনি ঠেকাতে পারল না—ওটা সোজা গিয়ে টাগের ব্রিজে লাগল। এর ফলে নরম একটা ভেজা আওয়াজ হলো। কন্টেইনার মার্ভেলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল আসকার আলী খান নামে যে লোকটা ছিল, সে এখন টাগের ব্রিজের সঙ্গে মিশে থাকা লাল মাংসের কিমা!

উইঞ্চম্যান ষাট টনের কন্টেইনার সহজেই মার্ভেলের ডেকে নামিয়ে আনল।

কাশেম ও জলিল সরাসরি অপারেশন্স সেন্টারে চলে এল। কাশেমের হাতে একটা সোনার বার। হাত তুলে দেখাল সবাইকে।

সোহেল সবার উদ্দেশে বলল, 'ওরা কন্টেইনার না খুললে আমরা জানতাম না ভিতরে কী আছে।'

চকচকে সোনালী বারটা সবাই দেখছে। রানা বলল, 'এবার আমরা রওনা হব।'

এগারো

ফ্রেডারিখ বাউয়ারের ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এখন বুঝতে পারছে রানা, আসলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান ওকে আগামী পনেরো দিন ছুটি দিয়েছেন, তারপর অফিসে ফিরতে হবে। সোহেলের কপাল অত ভাল নয়, সাত দিন পর অফিসে যোগ দিতে হবে ওকে।

আজ বিকেলের ফ্লাইটেই অনিল, গগল, উর্বশী, ফু-চুং, আতাসী—ওরা সবাই রওনা হয়ে গেছে লণ্ডনের পথে। সেখান থেকে ফিরে যাবে দেশে। কয়েকটা দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছে ডা. ফারা সোহেলকে দক্ষিণ হল্যাণ্ডে, নিজের দেশে। মার্ভেলের সমস্ত ক্রু স্বদেশে ফিরেছে, শুধু যায়নি একজন—সে অবশ্য ক্রু নয়।

হোটেল কক্ষের নীল দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, ফিরে গেছে কয়েক দিন আগের ঘটনায়।

ওরা যখন ক্রুজ লাইনারটা সৈকত থেকে সাগরে নামিয়ে আনল, তখন কিছু তীক্ষ্ণ পাথর জাহাজের খোল কেটে দিয়েছিল। ওরা জাহাজটা টো করে উত্তর-পুব কামচাটকা উপকূলে গিয়ে ভেড়ে। জায়গাটা ছিল মাত্র বিশ মাইল দূরে, ওখানে ওরা একটা অগভীর ইনলেট-এ জাহাজটা ডুবতে দিয়েছে। মানুষগুলো সৈকতে অপেক্ষা করেছে। মার্ভেল থেকে বাড়তি খাবার ও ওষুধ নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ডক্টর ফারা ওর গ্রুপ নিয়ে ওখানে নেমে গিয়েছিল। চিকিৎসার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে রানা। তারপর মার্ভেল আবারও দক্ষিণে রওনা হয়েছে।

অত্যাচারিত মানুষগুলো যে-সৈকতকে মৃত্যু-সৈকত বলত, তার দেড়শো মাইল দক্ষিণে দ্বিতীয় টাগ-বোট ও দ্য চুহিকে খুঁজে পেয়েছে মার্ভেল। ঝড়ের মধ্যে জাহাজগুলো বেশি দূরে যেতে পারেনি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সতর্ক না করেই মার্ভেল দ্য চুহির পেটে একটা টর্পেডো গেঁথে দিয়েছে। টাগের স্টার্নপোস্ট রেইডার উড়ে গেছে চল্লিশ এমএম কামানের গোলায়।

এরপর রানা রাশান কোস্ট-গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ছয়টি স্যাটালাইট ঘুরিয়ে রেডিয়ো রিলে করায় ওদের অবস্থান হারিয়ে গেছে। ও জানিয়ে দিয়েছিল কয়েকটা জাহাজ সি অভ ওখোটস্ক-এ বিপদে পড়েছে। সঙ্গে নতুন বসতির জিপিএস কোঅর্ডিনেট দিয়েছে। অনেক দেশের মানুষ ওখানে আটকা পড়েছে শুনেও অপারেটর পাত্তা দিচ্ছিল না, কিন্তু পরে যখন শুনল একটা টাগ-বোট বেআইনীয় ভাবে রাশার খনি থেকে সোনা তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, রাশানরা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পরদিন দুনিয়া জানল হাজারো মানুষ কীভাবে উদ্ধার পেয়েছে, আরেকটু

হলে সবাই কী ভাবে মারা পড়ত। বিজ্ঞানীরা জানাল গত এক দশকে এশিয়ায় এরকম বিশাল অগ্ন্যুৎপাত ঘটেনি। সেদিনই মার্ভেল ধুঁকতে ধুঁকতে ভ্লাদিভোস্টক বন্দরে ভিড়ল। দিনের প্রথম কাজ হিসেবে রানা রাশান মার্সেনারিদের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল। এরপর রানা বিসিআই-এর চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করল, যা ঘটেছে বিস্তারিত জানাল তাঁকে। বুড়োর মুখে কোনও প্রশংসা ছিল না, তবে মনে হলো খুশি হয়েছেন।

পরে রানা ফোনে চ্যাণ্ডো পাপাগোপালার সঙ্গে কথা বলেছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসকে ড্রাই-ডকে তোলা হয়েছে। পরদিন ওটার আসল ক্রুরা চলে এল।

এরপর আর সবার সঙ্গে পেদ্রোপাভলোভস্ক ফিরেছে রানা, একটা হোটেলে উঠেছে। এর চারদিন পর আবারও রাহাত খান ফোন করলেন। রানাকে জানালেন, একদল রেসকিউ কর্মী মৃত্যু-সৈকতে গিয়েছে, সেখানে এক লোককে উদ্ধার করেছে তারা। অগ্ন্যুৎপাতের সময় লোকটা একটা ক্রুজ শিপে লুকিয়ে ছিল। ঘটনাটা যখন ঘটল তখন সে ফুড লকারে নিজেকে আটকে রেখেছিল। গোটা জাহাজ পাঁচ ফুট তপ্ত ছাইয়ের নীচে পড়েছিল। লোকটার নাম ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন, এক ভলকানোলজিস্ট। এদিকে তাকে অনেকেই চেনে। লোকটা এখন পেদ্রোপাভলোভস্ক-এর একটা হোটেলে উঠেছে। কথাগুলো জানানোর পর আর কোনও মন্তব্য করেননি রাহাত খান, ফোন রেখে দিয়েছেন।

রানা নিজে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনকে ধরতে পারত, কিন্তু ভেবে দেখেছে, খবরটা ফু-চুঙের জানা দরকার। কথাটা ও পাড়তেই ফু-চুং রওনা হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে সোহেলও।

ওরা দু'জন সন্ধ্যার পর ফিরেছে, এক লোকের নাম-ধাম শুনে এসেছে। লোকটার নাম ফ্রেডারিখ বাউয়ার। এক ব্যাঙ্কার। সে-ই সরোকিনের সোনাগুলো ফেন্স করত।

ফু-চুং ও সোহেল ওর ঘরে এসে বসবার পর রানা জানতে চেয়েছে, 'কী ভাবে কী করলি তোরা?'

'খুব সাধারণ ভাবে,' বলেছে ফু-চুং। 'প্রথমে আমরা দরজা খুলে ওর ঘরে ঢুকলাম, জানালাম আমি ওর দাস-ক্যাম্পের বিনা বেতনের একজন ক্রীতদাস। আত্মা চমকে গেল ব্যাটার। কিডন্যাপ করে এয়ারপোর্টে নিয়ে গেলাম। বললাম, ওর ব্যাপারে আমরা প্রায় সবই জানি; যা জানি না সেটুকু বললে ওকে আমরা খুন করব না।'

'তারপর?'

'বুঝে গেল, কোয়াপরেট না করলে সত্যিই প্রাণটা যাবে।'

'তখন?'

'আরেকটা কথা এখানে বলে নিই,' বলল ফু-চুং। 'রাশানরা ক্রুজ লাইনার থেকে যে তিন হাজার লোক উদ্ধার করেছে, তাদের নিয়ে বিপদে পড়ে গেছে। অত বাড়ি পাবে কোথায়? শেষে তারা এয়ারপোর্টের একটা হ্যাঙারে এক হাজার

লোক রেখেছে। সরোকিন যখন আমাদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল, তখন ওকে নিয়ে হ্যাঙারে গেলাম। কিছু লোক জড় হতেই জানিয়ে দিলাম তাদের জীবনে যা ঘটেছে, সেসব আসলে ওই সরোকিনের কারণে হয়েছে। কয়েকজন চিনতেও পারল ওকে। তারপর যা হয় আর কী, নিয়তি বড়ই নিষ্ঠুর।'

সোহেলের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল রানা। 'আর তারপর?'

'ফু-চুং যা বলেছে, তা-ই হলো। আমরা তো কথা দিয়েছি তাকে খুন করব না। করিওনি! তারই বন্দিদের হাতে তাকে তুলে দিয়েছি। আমরা পঞ্চাশ ফুট এগোনোর আগেই সরোকিনের চিৎকার থেমে গেছে। এই আর কী?'

পরদিন সুইটযারল্যাণ্ডের পথে রওনা হয়ে গেল ওরা। সঙ্গে ছিল কয়েকটা এয়ারফ্রেইট কন্টেইনার। ওগুলো নিয়ে ফ্রেডারিখ বাউয়ারের সঙ্গে মিটিং শেষে সন্তুষ্ট হলো ওরা।

প্রথমে ফ্রেডারিখ বাউয়ার ভয় পেয়েছিল, খুন হয়ে যাবে বুঝি। যেত, কিন্তু রানা বাঁচিয়ে দিল ওকে। স্থির হলো, ষাট টন সোনা কিনে নেবে বাউয়ার, সে-টাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একটা ট্রাস্ট করা হবে। এ ছাড়া যত মানুষ মারা গেছে তাদের পরিবার-পরিজনদের প্রতিটা মৃত্যুর জন্য দশ লাখ ডলার করে ক্ষতিপূরণ দেবে তার ব্যাঙ্ক। যারা বেঁচে আছে তারা প্রত্যেকে পাঁচ লাখ ডলার করে পাবে। তারপর বাউয়ার নিজের ব্যাঙ্ক বেচে দেবে, জীবনে আর কখনও ব্যাঙ্ক-ব্যবসা করবে না, কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবে।

রানার প্রতিটি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে বাউয়ার। জানে, ওর সব অপকর্ম যদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে যায়, সম্মান তো যাবেই, যাবজ্জীবন জেল খাটতে হবে তাকে। কথা ঠিক-ঠাক মত রক্ষা করা হচ্ছে কি না, সেটার তদারকি করবে স্থানীয় রানা এজেন্সি। একটু এদিক-ওদিক হলেই ফাঁস করে দেওয়া হবে সব। তারপর নিজ হাতে খুন করবে ওকে লিউ ফু-চুং।

রানার সঙ্গী-সাথীরা মেনে নিল: হারামজাদা ব্যাঙ্কার যদি এসব কথা রাখে তা হলে তার খুলির মধ্যে এখুনি একটা বুলেট ঢুকিয়ে না দিলেও চলে।

লোকটার অফিস থেকে বেরিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাল ওরা সবাই, তারপর বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল যে-যার পথে।

ইন্টারকম বাজতেই টিপয় থেকে রিসিভার তুলে নিল রানা।

'আমি তৈরি,' বলল জুডি। 'তুমি আসবে, নাকি আমি?' একই হোটেলের চোদ্দো তলায় পাশাপাশি দুটো কামরায় উঠেছে ওরা। গত রাতে জুডি এসেছিল রানার কামরায় গল্প করতে, আজ রানার পালা।

দু'দিন পর ওরা বেড়াতে যাচ্ছে স্পেনের বার্সেলোনায়। তার দু'দিন পর যাবে ফ্রান্সের মার্সেই। সেখান থেকে...

কারণ, জুডিও ছুটি নিয়েছে দুই সপ্তাহের জন্য। ওর জানতে হবে, বিশাল হৃদয়ের এই অসমসাহসী, দেশপ্রেমিক যুবকটি কোন্ ধাতুতে গড়া।

'আমিই আসছি,' রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

দরজা খুলে যেতেই প্রথমে চমৎকার সুবাস এলো রানার নাকে, তারপর দুটো

হাত জড়িয়ে ধরে টেনে নিল ওকে কবোষ্ণ বুকে। আশ্চর্য এক দোলা অনুভব করল রানা বুকের ভিতর।

জুরিখের সেরা রেস্তোরাঁয় ডিনার করবে ওরা। তারপর ফিরে আসবে জুডির ঘরে। সারা রাত গল্প করবে ওরা। ভালবাসবে।

লবি থেকে বেরিয়ে গেল ওরা হাসতে হাসতে।

***

মাসুদ রানা

দুইখণ্ড একত্রে

স্বর্ণ-বিপর্যয়

কাজী আনোয়ার হোসেন

মিনিস্ট্রি অভ লেবার অ্যাণ্ড ম্যান পাওয়ার থেকে জানানো হলো, বিদেশে গিয়ে সাড়ে চার হাজার বাঙালি হারিয়ে গেছে। খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে খুন হয়ে গেছে কয়েকজন তদন্ত-অফিসার। শুধু বাংলাদেশই নয়, ভারত-বার্মা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যাণ্ড-মালয়েশিয়া-লাওস-কম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম-ফিলিপাইন, এমনকী খোদ চিন থেকেও হারিয়ে গেছে প্রচুর লোক বিদেশে ভাগ্য গড়তে গিয়ে। যারা এ-কাজ করছে, তাদের বিরাট নেটওঅর্ক রয়েছে। ওদের মোকাবিলা করতে হলে ক্ষতিগ্রস্ত সবকটি দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কয়েকটি রাষ্ট্রের সুপার-স্পাইদের নিয়ে একটা টিম গঠন করা হলো—নেতৃত্বে থাকল মাসুদ রানা। কাজে নামল রানা-সোহেল, ফু-চুং-অনিল-উর্বশী-আতাসী ও আরও কয়েকজন। শুরু হলো ওদের রুদ্ধশ্বাস অবিশ্বাস্য কাহিনি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০